শ্রীঃ

সাধু, সাবধান !

শ্রীশ্রীমা শ্রীমতী সরোজিনী দেবীর উপদেশামৃত

প্রথম খণ্ড
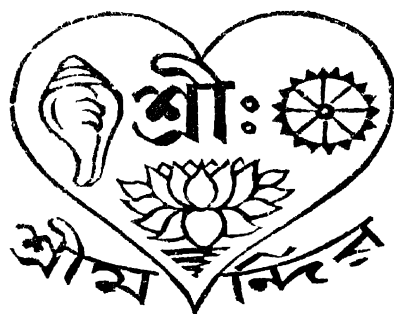
ওঁ বড়-মা প্রকাশনী

শ্রীমন্দির

২১/৩, মূর এভিনিউ, কলিকাতা-৭০০০৪০

প্রকাশিকা :
শ্রীমতী দেবীকা বন্দ্যোপাধ্যায়
৪৯এ, চণ্ডীঘোষ রোড,
কলিকাতা-৭০০০৪০

সংকলক ও সম্পাদক :
যাদব চন্দ্র সোমদ্দার ভক্তিশাস্ত্রী

প্রাপ্তিস্থান :

১. মহেশ লাইব্রেরী,
২/১, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

২. সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার,
৩৮, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

৩. প্রকাশিকা :
৪৯এ, চণ্ডীঘোষ রোড, কলিকাতা-৪০

৪. শ্রীমন্দির : ২১/৩, মুর এভিনিউ, কলিকাতা-৪০

প্রচ্ছদপট এঁকেছেন : সমীর বণিক

ছেপেছেন :
শ্রীমতী অলকা চট্টোপাধ্যায়
সারদা প্রিণ্টিং এণ্ড বাইণ্ডিং ওয়ার্কস,
২২, পঞ্চাননতলা রোড,
কলিকাতা-৪১

বিধাতা পরম দাতা
আর দাতা তিনি,
বিষয়-পুটিকা ভরে
প্রেম দানে যিনি।

—সম্পাদক

প্রীতি উপহার

....

....

....

## বিষয় সূচী	পৃষ্ঠাঙ্ক

সাধু

সাধ্নোতি সাধয়তি—ইতি সাধু।

যিনি নিজে সাধনপরায়ণ এবং যিনি অপরকে সাধন করান নিজ কৃপাবলে তিনিই সাধু।

শ্রীশ্রীগণেশ বন্দনা

হে জ্ঞানদেব ! গজবদন-গজদন্তে !
হে বিজ্ঞান-বিগ্রহ ! দেহ জ্ঞান কৃপান্তে ॥
ব্রহ্মজ্ঞান বিরাজিছে তব বক্রতুণ্ডে।
ওঁ কার-আকৃতি-খ্যাত এ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে ॥
সংস্বরূপ সত্তাতে চতুর্ভুজাকৃতি।
চিৎঘন দ্যুতি এবে তব অঙ্গজ্যোতি ॥
আনন্দঘন রূপ তাই মোদকপ্রিয়।
নিত্য সিদ্ধিদাতাহেতু অগ্রে বন্দনীয় ॥
জপি 'ওঁ বড়-দাদু' মন্ত্র যাদব স্মরে।
দেহি তব জ্ঞান-পদ এ অজ্ঞান-শিরে ॥

—যাদব চন্দ্র সোমদ্দার

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।
ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া
দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি॥

—কঠ উপনিষদ ১।৩।১৪

সান্বয় অনুবাদ—উত্তিষ্ঠত (হে জীবগণ, ওঠ), জাগ্রত (জাগো); বরান্ প্রাপ্য (বরণীয় ব্যক্তিগণকে প্রাপ্ত হয়ে), নিবোধত (আত্মার সম্যক্ জ্ঞান লাভ কর); ক্ষুরস্য নিশিতা ধারা (ক্ষুরের তীক্ষ্ণ অগ্রভাগ), [যথা] দুরত্যয়া (যেরূপ দুরতিক্রমণীয়), [তথা] তৎ পথঃ (তদ্রূপ সেই পথকে), কবয়ঃ (সদসৎ বিবেকবান ব্যক্তিগণ), দুর্গং বদন্তি (দুর্গম বলেন)।

সরলার্থ—হে জীবগণ, তোমরা ওঠ অর্থাৎ আত্মজ্ঞানাভিমুখ হও, তোমরা মোহনিদ্রা হতে জাগ্রত হও, ব্রহ্মজ্ঞ আচার্যগণের নিকট গমন করে আত্মার সম্যক্ জ্ঞান লাভ কর। তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিগণ বলেন যে ক্ষুরের তীক্ষ্ণ অগ্রভাগ যেমন দুরতিক্রমণীয় আত্মজ্ঞান লাভের পথও সেইরূপ দুর্গম।

উৎসর্গ

প্রীতি-উৎসর্গ-পত্র লিখি তার তরে।
কাছে না যেতেই যে সব নিয়েছে কেড়ে॥

যার স্পর্শে মোর কাম প্রেম হয়ে বাড়ে।
যার স্পর্শে অসাধুও সাধুরূপ ধরে॥

সদাঘিরে আছে তবু সদা যারে খুঁজি।
না পেতেই মনে হয় পেয়েছি গো বুঝি॥

সে কি রাধা, সে কি শ্যাম, নাহি জানিলাম।
এ মালা পরাতে তায় মনে ভাবিলাম॥

বনকুসুমে, কি পলাশে, কি পদ্মে গাঁথা!
এ মাল্য পরিতে গলে পাবে কি সে ব্যথা!!

লবে কি না লবে তুলে এ মাল্য আমার।
অথবা ফেলিবে ছুড়ে দেখি কদাকার॥

এ সব ভাবিনি কভু করিনি বিচার।
শুধু জানি, সেহ বিনে কেহ নাহি আর॥

আমার মাঝারে সেহ, তার মাঝে আমি।
তার পায়ে গ্রন্থ রেখে সভয়ে প্রণমি॥

—দীন কিংকর তব

শ্রীমন্মহাপ্রভোর্মুখাব্জবিগলিতং শ্রীশ্রীশিক্ষাষ্টকম্

চেতোদর্পণ মার্জনং ভব-মহাদাবাগ্নি-নির্বাপণং
শ্রেয়ঃকৈরব-চন্দ্রিকা-বিতরণং বিদ্যাবধূ-জীবনং ।
আনন্দাম্বুধি-বর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্বাত্ম-স্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্তনং ॥১

নাম্নামকারি বহুধা নিজ-সর্বশক্তিস্তত্রার্পিতা নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ ।
এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্! মমাপি দুর্দৈবমীদৃশমিহাজনি নানুরাগঃ ॥২

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা ।
অমানিনা মানদেন কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ ॥৩

ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং কবিতাং বা জগদীশ ! কাময়ে ।
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি ॥৪

অয়ি নন্দতনুজ ! কিংকরং পতিতং মাং বিষমে ভবাম্বুধৌ ।
কৃপয়া তব পাদপংকজ স্থিত ধূলী-সদৃশং বিচিন্তয় ॥৫

নয়নং গলদশ্রু-ধারয়া বদনং গদগদ-রুদ্ধয়া গিরা ।
পুলকৈর্নিচিতং বপুঃ কদা তব নাম-গ্রহণে ভবিষ্যতি ॥৬

যুগায়িতং নিমেষেণ চক্ষুষা প্রাবৃষায়িতং ।
শূন্যায়িতং জগৎ সবং গোবিন্দ-বিরহেণ মে ॥

আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্টু মামদর্শনান্মর্ম্মহতাং করোতু বা ।
যথা তথা বা বিদধাতু লম্পটো মৎ-প্রাণনাথস্তু স এব নাপরঃ ॥৮

প্রকাশিকার কথা

শ্রীশ্রীগোপাল চাঁদের কি ইচ্ছা বুঝি না, কিভাবে যেন সম্পূর্ণ অপ্রস্তুত অবস্থায় এই প্রকাশনা কাজে জড়িয়ে পড়লাম। প্রথমে এ কাজ যত সহজ ভেবেছিলাম, এখন দেখছি ঠিক তা নয়। আজ নিজের প্রশ্নবাণে নিজেই জর্জরিত। যে বস্তু আমার ভাল লাগে তা অপরের ভাললাগার মান অনুযায়ী পরিবেশন করা খুব সহজ নয়। কিছুদিন পূর্বে এই লেখকের "শ্রীগুরু তত্ত্ব বন্দনা" বইখানা পড়ে তার মূল বক্তব্যের প্রতি প্রথমে আকৃষ্ট হই। ক্রমে শাস্ত্রাদি আলোচনার ভিতর দিয়ে লেখকের চিন্তাধারার সঙ্গে পরিচিত হই, ঘনিষ্ঠ হই। তার চিন্তায় নতুনের গন্ধ পাই। তার ভাবনা মনে সাড়া জাগায়। আমার ভাল লাগে।

এই ভাললাগা প্রসঙ্গে একটু বলি। ভগবৎরসের লোভে শ্রীধাম দ্বারকা থেকে কামাখ্যা, অমরনাথ থেকে কন্যাকুমারিকা—ভারতের বহু তীর্থে মঠমন্দিরে বহুবার ঘুরেছি। সাধুসঙ্গমরূপ তীর্থরাজ ত্রিবেণীসঙ্গমে কুম্ভমেলায়ও কয়েকবার যোগ দিয়েছি। বহু সাধুসন্তদের দর্শন পেয়েছি। সম্ভবমত তাঁদের কাছ থেকে নতুন কিছু জানতে চেষ্টা করেছি। অকপটে বলছি—আমি সর্বত্রই নিরাশ হয়েছি। তাঁদের শক্তি-বিভূতির খেলায় আমার মন ভরে নি। বরং ব্যথা পেয়েছি। মনে হয়েছে—"এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে" একটি মহামানবেরও সাক্ষাৎ পাওয়া আজ সুদুর্লভ।

দেখেশুনে আমি যেটুকু বুঝেছি তা হল—সংসারবাদীরা যেমনটি সংস্কারভুক্ত সমাজের দাস, অধ্যাত্মবাদীরাও তেমনি তাঁদের সৃষ্ট সমাজের দাসেরই নামান্তর মাত্র। আপন আপন গণ্ডির ভিতরে তাঁরা আবদ্ধ অবরুদ্ধ। ভগবৎ মহিমা প্রচারের চেয়ে তাঁরা আপন শক্তি প্রচারে বেশী উৎসুক, আপন প্রভাব প্রতিপত্তি

বিস্তারে ব্যস্ত। ভগবৎরসে ডুবে নিজেকে হারিয়ে ফেলতে যেন কেউই চান না। অমৃতে গলে গিয়ে আমাদের ঘৃত শুষ্ক কাষ্ঠকে সরস করতে দেখা যাচ্ছে না। "শ্রীশ্রীউজ্জ্বলনীলমণি" গ্রন্থপ্রসঙ্গে শ্রদ্ধেয় এক বৈষ্ণব মহারাজ তো স্পষ্টই বলে দিলেন—ওসব তত্ত্বে তুমি ঢুকতে পারবে না, ইত্যাদি। দেখাযাচ্ছে, কোন না কোন প্রকার সংকীর্ণতার ঝোলা প্রায় সব মতাদর্শীর কাঁধেই ঝুলছে।

বৈদিক নিষ্ঠা প্রজ্ঞা উদারতা কোথা থেকে পাওয়া যাবে ? স্পষ্টই বুঝতে পারছি, শাস্ত্রের পথ ধরে আজ আর আমরা চলছি না। শাস্ত্রকেই যেন আমাদেব নিজ নিজ মত অনুযায়ী পথ ধরে চলাতে চাইছি। বিভিন্ন সম্প্রদায়েব প্রবক্তাগণ নিজ নিজ সম্প্রদায়ের দিকে চেয়ে একই শাস্ত্রের বিভিন্ন ব্যাখ্যা কবেছেন, এ তো সকলের জানা। এই না না মুনির না না মতে হাবুডুবু খেয়ে হিন্দু বা বৈদিক ধর্মের আজ নাভিশ্বাস ! কারো নিন্দাবাদ করছি না, শুধু আমার ব্যথা-ক্ষোভ ব্যক্ত করছি। বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম ধর্মের বর্তমান অবস্থার কথা বলছি।

'সাধু, সাবধান !' পুস্তকের পাণ্ডুলিপি পড়ে আশাতীত আনন্দ পেয়েছি, অন্তরে আশ্বস্ত হয়েছি। ঐ আনন্দের আতিশয্যেই এর প্রকাশে প্রবৃত্ত হয়েছি, যদিও এ কাজের উপযুক্ত শক্তিসামর্থ্য আমার নেই। এ পুস্তকের ভাষায় বা অলংকরণে হয়ত অভাব আছে, কিন্তু এর বক্তব্যের দৃঢ়তা নিরপেক্ষতা এবং ভাবের মূর্ছনা হৃদয়তন্ত্রীতে আঘাত করে। খুবই হৃদয়গ্রাহী এর বৈদিক ব্যাখ্যার নির্দেশ যা আজকের দিনে নিঃশেষিত বলা চলে। বেদ-চর্চ্চার অপরিহার্যতা এবং ব্যক্তি ও সমাজের সর্ববিধ সুখধারা যে গঙ্গা-গোমুখীর মতই বেদমুখ হতে নিঃসৃত—এ তত্ত্ব সপরিসর আলোচনা করে লেখক যেভাবে মানবজীবনকে বেদের সঙ্গে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে দিয়েছে, তা যে কোন তত্ত্বদর্শীকেই আকৃষ্ট করবে।

আমরা অনেকেই যেমন কোন তত্ত্বের মূলে না পৌঁছতেই শুধু সম্প্রদায়-সংগঠন গড়ে ধর্মাচার্যের পিঁড়ি পেতে চাই ; অপরকে হেয়-অচ্ছুৎ প্রতিপন্ন করে আপন তক্তের ভক্ত বাড়াতে বাড়াবাড়ি করি. এসব থেকে দূরে থাকবার জন্যই লেখকের শ্রীগুরু শ্রীশ্রীমা তদীয় শিষ্যসন্তানদের বার বার সাবধান করে দিয়েছেন। মাতা-ঠাকুরাণীর সেই উপদেশাবলীই এ পুস্তকের প্রধান উপজীব্য। বাহুল্য ছেড়ে যাঁরা কিছু জানতে চান তাঁরা এই ক্ষুদ্র কলেবরে বিরাটকে দর্শন করতে পারবেন, আশা করি। এখানে আছে অনবদ্য শিবতত্ত্ব যা পড়তে পড়তে পাষাণহৃদয়েও দাগ কাটে. সনাতন ধর্মের স্বরূপ বৈশিষ্ট্য ফুটে ওঠে। গুরুতত্ত্ব-শক্তিতত্ত্ব আলো-চনায় যে আলোকপাত করা হয়েছে তা মরমী ভক্তের কাছে দিগ্‌দর্শনস্বরূপ। শ্রীশ্রীমা'র উপদেশামৃত সাধককে অমৃতলোকে পৌঁছে দেবার শক্তিতে ভরপূর।

অনভিজ্ঞতা এবং অনবধানতাবশতঃ প্রকাশনাকার্যে যা কিছু ভুলত্রুটি ঘটেছে বিদগ্ধ পাঠককে সেসব উপেক্ষা করতে অনুরোধ করব। আমরা যারা তথাকথিত আধুনিকতার প্লাবনে ভেসে চলছি এবং যারা গোঁড়ামিতে ভুগছি তাদের কাছে এ পুস্তক সুখপাঠ্য না হবারই কথা, বরঞ্চ কোথাও বিতর্কের সৃষ্টি হতে পারে। অনৈক্যের জন্য ভারত চিরদিনই বিশ্ববিখ্যাত। এখানে ধর্মচিন্তায়ই বোধহয় সর্বাপেক্ষা অধিক অনৈক্য। এই সব অনৈক্যের কমতি-বাড়তির সঙ্গে সঙ্গেই যে আমাদের সুখশান্তির মিটার ওঠা-নামা করে—অন্ততঃ এইটুকু স্বীকার করলেই বেদচর্চার 'প্রয়ো-জনীয়তা বুঝা যাবে। সেদিক থেকেও এ পুস্তক খুবই সময়োপ-যোগী হয়েছে।

শৈশবে অসুখ করলে ঔষধ খেতে চাইতাম না। তিক্ত ঔষধ হলে তো জবরদস্তি করেও তা গেলানো অসম্ভব ছিল। এখন বড় হয়ে দেখি, আমরা যারা ভবরোগে ভুগছি তাদের শাস্ত্ররূপ

ঔষধ সেবনে সম্পূর্ণ অনীহা। অধিকাংশেই আপন রুচি অনুযায়ী শাস্ত্রার্থ করি, যেন কড়া ঔষধে একটু সরবৎ মিশিয়ে সুপেয় করি। এখানেও কুইনাইন ট্যাবলেটে চিনির প্রলেপ মাখাতে লেখক চেষ্টার কসুর করে নি। জানি না, আপনাদের রসনায় কতটা মিঠে-কড়া লাগবে!

মাতাঠাকুরাণীর উপদেশাবলীর সবটুকুই এখানে প্রকাশ করা সম্ভব হল না। পাঠকবর্গের সহযোগিতা পেলে বাকী অংশ প্রকাশের ইচ্ছা আছে।

ইতি—

শ্রীশ্রীজন্মাষ্টমী তিথি
১৫ ভাদ্র, ১৩৫৮ সাল।

[illegible] বন্দ্যোপাধ্যায়

ধ্যানমূলং গুরোর্মূর্তিঃ পূজামূলং গুরোঃ পদম্।
মন্ত্রমূলং গুরোর্বাক্যং মোক্ষমূলং গুরোঃ কৃপা॥

শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মে সমাশ্রিত হই বাং ১৩৪৭ সালের দোল-পূর্ণিমার শুভলগ্নে। সেদিন থেকে তদীয় লীলাসংবরণতিথি—রাধাষ্টমী, ১৩৭৭ সাল, পর্যন্ত শ্রীগুরুর শ্রীমুখে যে সব ভগবৎকথা শ্রবণ করেছি এবং উপদেশ-নির্দেশাদি লাভ করেছি, তার কিছু কিছু আমি লিখে রেখেছিলাম। শ্রীগুরু শ্রীশ্রীমা'র অন্তর্ধানের পর তাঁর শ্রীহস্তলিখিত দিনপঞ্জী হতেও এ বিষয়ে কিছু তথ্য সংগ্রহ করেছি। কারণ, এই সব বস্তু যথাসম্ভব সংক্ষিপ্তাকারে প্রকাশের একটা দুষ্টলোভ বহুদিন থেকেই আমায় পেয়ে বসেছিল। কিন্তু আপন অক্ষমতাহেতু কেবলই পিছু হটেছি। বার বার মনে হয়েছে, দর্শন-অনুভূতির কথা কেবল তত্ত্বদর্শী স্বয়ংই সঠিকভাবে প্রকাশ করতে সমর্থ। একজন তত্ত্বদর্শীর ভাব ঠিক ঠিক ভাবে প্রকাশ করা যখন অপর এক তত্ত্বদর্শীর পক্ষেও সুকঠিন, তখন শ্রীশ্রীমা'র ভাব প্রকাশ করতে চাওয়া আমার মত অর্বাচীনের পক্ষে শুধু ধৃষ্টতাই নয়, তার চেয়েও অধিক গর্হ্য। ভয়ের আর একটি কারণ—শ্রীমুখে শুনে অপরিপক্ক মনে আপন অক্ষম ভাষায় যেভাবে তার রূপ দিয়েছি তাতে তাঁর বক্তব্যের মূলসূত্র অক্ষুন্ন আছে কি না, এবং বহু বিস্তৃত আলোচনাকে সংক্ষিপ্ত করায় তাঁর মূল ভাব অবিকৃত আছে কি না! এত ভয় এবং ভাবনা সত্ত্বেও মনে হত—গোষ্পদ তার আপন সাধ্যানুসারে আকাশকে প্রকাশ করলে তাতে আকাশের অসীমত্ব ব্যাহত হবার কি আছে! মরমী পাঠক অবশ্যই জানেন—

মূর্খো বদতি বিষ্ণায় ধীরো বদতি বিষ্ণবে।
দ্বয়োরেব সমং পুণ্যং ভাবগ্রাহী জনার্দ্দনঃ॥

মূর্খে বলে বিষ্ণায়, বিষ্ণবে বলে ধীর। দুই বাক্য পরিগ্রহ করে কৃষ্ণবীর॥

এসব ভাবনা নিয়ে মানসক্ষেত্রে লোভের সঙ্গে ভয়ের যখন অবিরাম দ্বৈরথ-দ্বন্দ্ব চলছে তখনই গুরুকৃপায় রাধাস্বরূপিনী শ্রীমতী দেবীকা দেবীর সঙ্গে পরিচয় ঘটে। নিজের জিহ্বায় কোন কিছু সরস লাগলে তা যেন অপরের রসনাদ্বারা আস্বাদিত না হওয়া পর্যন্ত রসোত্তীর্ণ হয় না! ভাল সাজসজ্জা করলে তা বুঝি অপরকে না দেখান পর্যন্ত আত্মসুখ পূর্ণ হয় না! সুখ বোধহয় সর্বদাই সাথী চায়। সুখ একা ভোগ করতে গেলে তা বুঝি বিস্বাদ লাগে! নইলে আনন্দঘন শ্যামের আপন অঙ্গ হতে প্রেমঘন রাধাকলেবর প্রকাশের প্রয়োজন ছিল কি!

যাই হোক, যেমন সবত্র ঘটে, এখানেও লোভেরই জয় হল। তবে আমার ভাবনার গুরুভার কাটিয়ে দিলেন গুরুরূপা শ্রীমতী স্বয়ং এর প্রকাশনার দায়িত্ব নিয়ে। আমি আশ্বস্ত হলাম এই প্রবাদবাক্যে—

সজ্জনা গুণমিচ্ছন্তি, দোষমিচ্ছন্তি বর্বরাঃ।
মক্ষিকা ব্রণমিচ্ছন্তি, মধুচেচ্ছন্তি ষট্‌পদাঃ॥

অর্থাৎ—সাধু বিচারয়ে গুণ, দোষ দেখে অসাধ।
মাছি চুষয়ে ব্রণ, ভ্রমর খোঁজে মধু॥

আমার অক্ষমতা বা ধৃষ্টতার এ কোন কৈফিয়ৎ নয়, অথবা আমার অপূর্ণতা বা অজ্ঞতাকে ঢাকবার চেষ্টাও নয়। আমি আচার্য শংকরের—"ক্ষণমপি সজ্জনসঙ্গতিরেকা ভবতি ভবার্ণবে তরণে নৌকা"-বচনের কৃপাপ্রার্থী। আমার মত ভজনহীনের একমাত্র ভরসা সজ্জন-কৃপা। সাধনায় যা অসম্ভব মহতের কৃপায় তা খুবই সহজ। "এমনি হরির অহেতু মহিমা, প্রেমের এমনি যাদু। কয়লা-হৃদয় গলি হীরা হয়, তস্করও হয় সাধু॥" মহতের কৃপাই হরির অহেতু-করুণা। একমাত্র তাঁরাই পারেন আমার পাষাণহৃদয়ে ফুল ফোটাতে। আমি মহতের কৃপাপ্রার্থী। এ ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা শুধু তাঁদের সংস্পর্শে আসবার একটি অছিলা মাত্র। মহতের কথা-মালা দিয়েই মহাজনকে বরণ করতে চাই। আনন্দকাননের অজস্র সং-বাদ-কুসুম শ্রীশ্রীমা ছড়িয়ে ছিলেন স্বীয় প্রকটকালে। আমার অপটু

হাতে তা কুড়াতে গিয়ে এক দিকে যেমন তার সৌন্দর্য-সুষমার হানি ঘটিয়েছি, অপরদিকে সছিদ্র ধৃতি-পাত্রে রেখেদিতে সেই দুর্লভ সঞ্চয়ের যথেচ্ছ অপচয়ও করেছি। অবশিষ্ট কুসুমে অনিপুন হস্তে মাল্য-রচনাকালে যদি আমার সংস্কারবশতঃ কোন মালিন্য একে স্পর্শ করে থাকেও, তবে অদোষদর্শী সজ্জনের শুভদৃষ্টিপ্রভাবে অবশ্যই সে মালিন্য মাধুর্যে রূপায়িত হবে—এই ভরসা। যাঁদের অকৃপণ দয়াদানে অপূর্ণও পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়, সেই 'গুণমিচ্ছন্তি সজ্জনা'র ইচ্ছাই পূর্ণ হোক! আমার মুখের "মরা মরা" শব্দ তাঁদের কৃপায় 'রাম' নামের সুধা বর্ষণ করুক।

শ্রীগুরু শ্রীশ্রীমা'র এই সমস্ত বাক্য বা উপদেশাবলী মুখ্যত আমার মত তাঁর অপর শিষ্যসন্তানদের এবং অন্যান্য ভক্ত শ্রোতাদের আত্মোন্নতির উদ্দেশে কথিত। তাই এ সবের ভিতর একটা গুরু-শিষ্য গন্ধ আছে। গুণগ্রাহী পাঠকের কাছে অনুরোধ—কৃপা করে যদি "মন্নাথ শ্রীজগন্নাথো, মদ্‌গুরুঃ শ্রীজগদ্‌গুরুঃ" মন্ত্রের ভাব অবলম্বনে তিনি অগ্রসর হন তবে আর এই গুরু-শিষ্য গন্ধ পীড়াদায়ক বলে মনে হবে না। ভাষায় বা ভাবপ্রকাশে যে ত্রুটি-বিচ্যুতি রয়ে গেল তার সমস্ত দায়দায়িত্ব আমার নিজস্ব। আপাত-দৃষ্টিতে কোথাও কোথাও পুনরুক্তি মনে হতে পারে, কিন্তু তত্ত্ববিচারে সে দোষ খণ্ডিত হবে, আশা করি।

বেদ-বেদান্ত শাস্ত্রপুরাণাদি যুগযুগান্ত ধরে রসভূপের রস-সমুদ্র মন্থন করে বিভিন্ন রসতত্ত্ব উদ্‌ঘাটন করত কালে কালে তা রস-পিয়াসীদের পরিবেশন করে আসছেন। এতে রসপ্রকরণের ঘাটতি না ঘটে বরং নব নব রসের নবাতিনব আস্বাদন লাভ হয়েছে। রসপিয়াসীরাও ক্লান্ত না হয়ে আরো লালায়িত হয়েছেন। একই দুগ্ধামৃত হতে বিভিন্ন কারিকর বিভিন্ন স্বাদের রসমণ্ডা প্রস্তুত করবেন বই কি! তবু আরো যে কত অনাস্বাদিত রস অবশিষ্ট আছে তার পরিমাপ কে করতে পারে! এ রস নিত্য নূতন। এর নবীনতা অফুরন্ত। অফুরন্ত বলেই এর নাম অমৃত। মদীয় শ্রীগুরুবর সেই চিরনবায়মান মাধুর্যরসের বিদগ্ধা আস্বাদিকা। তাঁর আস্বাদন-চমৎকারিতা সুরসিক সমাজে পরিবেশন করাই এ অকিঞ্চনের অভিপ্রায়। এ প্রচেষ্টায় কতটুকু সফল হয়েছি তার বিচারক সুধী পাঠকবর্গ। ইহা পাঠে যদি একজন রসিকেরও রসভাণ্ডে

এতটুকু তাণ্ডবাভাস প্রকাশে তবে তা আমার প্রতি মহতের কৃপা বলেই জানব।

আলাদা করে 'নৈবেদ্য' প্রকাশের ভাবনা জন্ম নিয়েছে শ্রীগুরুর কথামৃতে, লালিত হয়েছে শাস্ত্রকৃপায় এবং বৰ্দ্ধিত হয়েছে মহতের কৃপানুকূল্যে। এতে যদি কোন প্রকার ভ্রান্তি থেকে থাকে তা কেবল আমারই অজ্ঞানতাবশতঃ। আচার-নিষ্ঠা-ভক্তি-প্রীতি-প্রেমরূপ পঞ্চামৃত যুক্ত হলেই সে নৈবেদ্য দেবভোগ্য হয়। দেবতার প্রসাদ হয়। অভাজনের সাজানো এ নৈবেদ্য পঞ্চামৃতবিহীন। রসিক পাঠক আপন রসামৃতে সে অভাব পূরণ করে নিবেন, এই প্রার্থনা।

এই গ্রন্থের নামকরণ এসেছে স্বয়ং শ্রীশ্রীমা'র বাক্য থেকে। তিনি আমাদের পদে পদে হুঁশিয়ারি দিয়ে বলতেন, যেমন ধোপদুরস্ত কাপড়জামা পরে পথ চলতে একটু বেশী সাবধান না হলে সামান্যতম ময়লা লেগে ফরসা কাপড়ের বাহার নষ্ট হয়, তেমনি ভজনপথেও সাবধান না হয়ে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ত্রুটিবিচ্যুতিকে অবজ্ঞা অবহেলা করলে সেগুলিই একদিন প্রাণঘাতী রূপ নেয়। যে সব দোষত্রুটি উপেক্ষা করলে সাংসারিক লোকের কোনই ক্ষতিবৃদ্ধি নেই, সেই সব তুচ্ছাতিতুচ্ছ ব্যাপার সাধনার মূলোচ্ছেদ ঘটাতে পারে। তাই অসাধুর চেয়ে সাধুকেই বেশী সতর্ক সাবধান থাকতে হয়। তাঁর এ সাবধান-বাক্য কেবল সাধুর সাধুতা রক্ষার জন্যই।

পরিশেষে আমার অন্তরের শ্রদ্ধা নিবেদন করি প্রকাশিকাকে, যাঁর একান্ত আগ্রহ প্রচেষ্টায় বহুদিনের সঞ্চিত ভাবনা ও লেখা-গুলি আলোর মুখ দেখতে পেল। লেখা বাছাই করা, তা আরো সংক্ষিপ্ত করা, প্রুফ দেখা প্রভৃতি কাজে তাঁর অযাচিত সহায়তা না পেলে এ কার্য আমাদ্বারা কখনই সম্পূর্ণ হত না। আমি তাঁর কাছে ঋণী। যে সব গুরুভাই গুরুবোনেরা এই কাজে সাহায্য সহায়তা করেছেন, কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে তাঁহাদের বিব্রত করতে চাই না। নিবেদন ইতি—

শ্রীশ্রীরাধাষ্টমীতিথি

গুরুকৃপাপ্রার্থী—

যাদব চন্দ্র সোমদ্দার

ওঁ গণেশায় নমঃ

নৈ বে দ্য

তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ ॥

—গীতা ৪।৩৪

জগদ্‌গুরু ভগবান শ্রীকৃষ্ণ প্রিয়তম শিষ্য অর্জুনকে ব্রহ্মজ্ঞান লাভের উপায় বলছেন— যে বিধিদ্বারা এই ব্রহ্মজ্ঞান প্রাপ্ত হওয়া যায় তা বলছি, অবগত হও। প্রণিপাত (দীর্ঘ প্রণাম), সশ্রদ্ধ (বিনীত) জিজ্ঞাসা ও সেবা (গুরু সেবা) দ্বারা প্রসন্ন হয়ে তত্ত্বদর্শী জ্ঞানী তোমাকে ব্রহ্মজ্ঞান উপদেশ করবেন।

বেদভিত্তিক আর্যসংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র ছিল গুরুকুল। জীবনে পরিপূর্ণ স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য, পূর্ণতম বিকাশের জন্য, নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ লাভের জন্য যত প্রকার সাধ্যসাধনার ধ্যানধারণার প্রয়োজন তার গবেষণাগার ছিল তদানিন্তন বিভিন্ন গুরুকুলে। গুরুর আশ্রমে। বংশানুক্রম গুরুর অধ্যক্ষতায় বহুকাল ধরে নানা ভাবে এ গবেষণা-সাধনা কঠোর নিষ্ঠার সঙ্গে চলছিল নব নব জ্ঞান-বিজ্ঞান লাভের জন্য। চাষাবাদ প্রভৃতি জীবন ধারণের অতি প্রয়োজনীয় বিষয় থেকে শুরু করে শিল্প কলা ভেষজবিদ্যা শস্ত্রবিদ্যা শাস্ত্রপ্রণয়ন ঈশ্বরতত্ত্বানুসন্ধান প্রভৃতি সর্বক্ষেত্রেই মুনি ঋষিগণ উন্নত হতে উন্নত-তর তত্ত্বের সন্ধানে জীবন পাত করেছেন। তাঁদের ঐ জ্ঞানচর্চার বহুকাললব্ধ ফলাফল বেদ-উপনিষদে বিধৃত। বিবিধ জ্ঞানের গুণবিচারে স্বীকৃত হল—ঈশ্বরানুভূতি-ই মানবসংস্কৃতির শেষ কথা,

যা মানবকে নিরবচ্ছিন্ন আনন্দের অধিকারী করে, যাতে জীব পূর্ণ-কাম হয় তাই শ্রেয়। তাই পরম কাম্য।

মুনিঋষিদের অক্লান্ত সাধনায় চরম সুখের পরম মার্গ আবিস্কৃত হল। কিন্তু তার ইতি অনুক্ত রয়ে গেল। এ পথের শুরু জানা গেল। শেষ পাওয়া গেল না। মানব মণীষা এক অগাধ সুধা-সমুদ্রের সন্ধান পেল। যার বিন্দুমাত্র বারি পানেই সর্ব ক্ষুধা অপগত হয়ে সর্ব ইন্দ্রিয়ে এমন আলস মাদকতা আনে যে, সে সমুদ্রের ব্যাপকতা জানার সামর্থ্য কোন ইন্দ্রিয়ের কোন কালেই হয় না। জীব তখন প্রেমে গলে গিয়ে আনন্দ-সাগরের এক রেণু জল হয়ে যায়। স্বাতন্ত্র্য হারিয়ে অনন্তে ডুবে যায়। অণুতত্ত্ব ভূমাতত্ত্বে উন্নীত হয়। সাগরের এক বিন্দু জল তুলে তাকে সমুদ্রে কত জল জিজ্ঞেস করলে কোনই উত্তর মিলবে না। কারণ, আজ সে তার কোন ইন্দ্রিয়কেই নিজের বলে সীমিত করে রাখেনি এসব প্রশ্ন শুনতে বা কোন জবাব দিতে। এখন তার চেতনা অনন্ত চেতনার সঙ্গে একীভূত। অনন্ত হতে সে অবিভাজ্য। এখন তার পরিচয়—

অণোঃ অণীয়ান্ (অণু হতেও অণু), **মহতঃ মহীয়ান্** (বৃহৎ হতেও বৃহৎ)। [কঠ উপনিষৎ ১।২।২০ এবং শ্বেতাশ্বতর উপনিষৎ ৩।২০] এখন তার অবস্থা—**রসং হ্যেবায়ংলব্ধ্বানন্দী ভবতি** (এই জীব রসস্বরূপকে প্রাপ্ত হয়ে আনন্দময় হয়)। [তৈত্তিরীয় উপনিষৎ ২।৭।২]।

বৈদিক ভাবনায় বিশ্বের কোন বিষয়বস্তুই বাদ পড়ে নি। বেদ বিশ্বভাবনাকে সূত্রাকারে শ্লোকে ধরে রেখেছেন। আজ পর্যন্ত মানব মনে এমন কোন নূতন চিন্তা জাগেনি যার সূত্র বেদে অনুপস্থিত। শুধু এতেই বেদের মহত্ত্ব নয়। বৈদিক সূত্রের গভীর-গম্ভীরতা ব্যাপ্তি-ব্যাপকতা সহস্র সহস্র বৎসরের সাধনায়ও পুরাপুরি উদ্‌ঘাটিত হয় নি। বরং প্রসারতা যেন বেড়েই চলছে। বৈদিক মন্ত্রের এক-একটি শব্দে যে সব ভাব বীজাকারে সম্পুটিত রয়েছে

ধ্যানসাধনার বারি সিঞ্চনে তা এক-একটি বিরাট অক্ষয়বটে পরিণত হতে পারে। মহামতি ব্যাসদেব বেদবাণী **"রসো বৈ সঃ"** ধৃত ভাবকে আঠার হাজার-শ্লোকী শ্রীমদভাগবতে রূপায়িত করতে গিয়ে বলেছেন—**"গিরঃ শ্রুতায়াঃ পুষ্পিণ্যা"**—বেদবাক্য বহুল অর্থপূর্ণ (ভাগবত ৪।২।২৫)। ব্যাসবাক্যের ভঙ্গি মনে হয় এইরূপ-যেন আঠার হাজার শ্লোকেও **"রসো বৈ সঃ"** এর পুরা রস নিষ্কাশন করা যায় নি। বেদবাণীর ভাবমাধুর্যের এতই পরিব্যাপ্তি! ব্রহ্ম যেমন অসীম অনন্ত, বেদের ভাবব্যঞ্জনাও তেমনি অফুরন্ত। একারণেই বেদকে ব্রহ্মের বাঙ্ময় রূপ বলা হয়।

ধর্ম ও সংস্কৃতির মূল উৎস বেদের বিশুদ্ধ চর্চানুশীলন প্রভাব-প্রবাহ অব্যাহত রাখতে সেকালে বিদ্যার্থীদের কৈশোরে গুরুগৃহে বাস করে সর্বতোভাবে গুরুনির্ভর হয়ে তাঁর তত্ত্বাবধানে জীবনকে বৈদিক ছন্দে গঠন করাই ছিল আর্যপ্রথা। এই প্রথাকে চতুরাশ্রমের প্রথম ও প্রধান আলম্ব ব্রহ্মচর্যাশ্রম বলা হয়। কতখানি স্বর্গীয় ভাবনা-বৃত্তি নিয়ে তৎকালীন ঋষিগণ এ প্রথা প্রচলন করেছিলেন তার প্রকাশ দেখা যায় তৈত্তিরীয় উপনিষদের ১।৪।৩ মন্ত্রে—

আ মায়ন্তু ব্রহ্মচারিণঃ স্বাহা। বি মায়ন্তু ব্রহ্মচারিণঃ স্বাহা। প্র মায়ন্তু ব্রহ্মচারিণঃ স্বাহা। দমায়ন্তু ব্রহ্মচারিণঃ স্বাহা। শমায়ন্তু ব্রহ্মচারিণঃ স্বাহা॥

অর্থ—(ব্রহ্মবিদ্যা যাতে সর্বত্র প্রচারিত হয় এই উদ্দেশ্যে আচার্য ঋষি ব্রহ্মচারী শিষ্যলাভের জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা জানাচ্ছেন) ব্রহ্মচারীগণ বিদ্যালাভের জন্য সকল দিক হতে আমার নিকট আগমন করুক। ব্রহ্মচারীগণ আমার নিকট বিশেষভাবে বা বিধি-ভাবে আগমন করুক। ব্রহ্মচারীগণ যথাশাস্ত্র আমার নিকট আগমন করুক। ব্রহ্মচারীগণ আমার নিকট দম (ইন্দ্রিয়নিগ্রহ) অভ্যাস করুক। ব্রহ্মচারীগণ আমার নিকট শম (চিত্তের ধৈর্য) অভ্যাস করুক; স্বাহা।

ঋষিগণ অধ্যাপনাকে শুধু একটি শুচীব্রত হিসাবেই গ্রহণ করেন নি। ব্রহ্মজ্ঞান দান ব্রতকে তাঁদের উপাসনার এক অঙ্গ করে নিয়েছিলেন। ব্রহ্মচারীগণের আগমনের নিমিত্ত তাঁরা প্রার্থনা করতেন। হোম-যাগ করতেন। "স্বাহা" এখানে হোমমন্ত্রের শেষ বুঝাচ্ছে। বেদ অধ্যয়ন ও ব্রহ্মবিদ্যা যেন সর্বত্র প্রসার লাভ করে—এ ছিল তাঁদের প্রার্থনা ও সাধনা। প্রাচীনকালে আচার্যগণ নিজস্ব কোন ভোগ বা লাভের কামনা না করেই বিদ্যাদান কবতেন। বিদ্যার্থীদের ভরণ পোষণ করতেন। এ ভাবেই আচার্য ঋষি নিজেকে জ্ঞান সাধনায় বিলিয়ে দিয়ে ব্রহ্মানন্দে ডুবে যেতেন। অন্যান্য জ্ঞানাধিকারী হতে ব্রহ্মজ্ঞানীর এখানেই বৈশিষ্ট্য। ব্রহ্মজ্ঞানী নিজে আনন্দময়, আর সেই আনন্দ সম্পদ সুপাত্রে দান করে তাঁর যেন পরমানন্দ। ব্রহ্মানন্দেব ঐ স্বভাব। এ আনন্দে আপনি ডুবে জগৎ ডোবায়।

উক্ত শ্রুতিমন্ত্রে আরো একটি তত্ত্বের সন্ধান পাই। শিষ্য যখন গুরুর কাছথেকে প্রাত্যহিক পাঠ গ্রহণ করে তখন গুরুর মৌখিক উপদেশের অন্তরালে তাঁর অন্তরস্থ শম দম গুণগুলিও শিষ্যের হৃদয়ে সঞ্চারিত হয়। অন্তরিন্দ্রিয় দমনের কলাকৌশলকে শম এবং বহিরিন্দ্রিয় দমনকে দম বলে। গীতার ৩।২১ শ্লোকে ভগবান বলেছেন— শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যা যা আচরণ করেন অপর সাধারণেও তাই করে। শিষ্যের চিত্তে শুদ্ধ-সত্ত্ব ভাবের উন্মেষ ঘটাতে গুরুকেও ভাবে চিন্তায় কর্মে আচবণে কতটা সাত্ত্বিক হতে হয় সে ইঙ্গিতও ঐ মন্ত্রে সুস্পষ্ট। পাঠ শিক্ষার সঙ্গে নৈতিক শিক্ষা যুক্ত না হলে বিদ্যা জ্ঞানস্তরে উন্নীত হয় না।

শিষ্যলাভের জন্য আচার্যগণ মন্ত্রোচ্চারণ করে যজ্ঞে আহুতি দিতেন। আমরা কিন্তু গুরুলাভের জন্যও এমনটি করি না। এ সব করি না বলে তার ফলাফল শিক্ষাজগতে যে কি ভয়াবহ রূপ নিচ্ছে তা ব্যাখ্যার প্রয়োজন হয় না। বৈদিক গুরু তাঁর

শিষ্যকে কি চোখে দেখতেন তা যেমন বিশেষ ভাবে অনুধাবনের বিষয়, তেমনি বর্তমান কালের গুরুশিষ্য সম্পর্কের সঙ্গেও তা তুলনার বিষয়। আচার্যদের আচরণে তৎকালীন ব্রহ্মচারীদের মর্যাদার স্থানও সূচিত করে। গুরু-শিষ্যের এমন স্বর্গীয় সম্পর্ক পৃথিবীতে আর কোথাও নেই। ভারতীয় কৃষ্টিকৌলীণ্যের আদি-বীজ ঐ স্বর্গীয় সম্পর্ক হতেই একদিন অঙ্কুরিত হয়েছিল। বৈদিক যুগের ব্রহ্মচাবীরা বেদ পাঠের পূর্বে শান্তি পাঠ করে ব্রহ্মের নিকট প্রার্থনা জানাত—

ওঁ সহ নাববতু, সহ নৌ ভুনক্তু,
সহ বীর্যং করবাবহৈ।
তেজস্বি নাবধীতমস্তু, মা বিদ্বিষাবহৈ॥
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ॥

অর্থ—আচার্য ও শিষ্য আমাদের উভয়কে ব্রহ্ম তুল্যভাবে রক্ষা করুন। ব্রহ্ম আমাদের উভয়কে বিদ্যাফল যেন তুল্যভাবে ভোগ করান। আমরা উভয় যেন সমভাবে বিদ্যা লাভের উপযুক্ত বীর্য-সামর্থ্য অর্জন করতে পারি। আমাদের অধ্যয়ন বীর্যশালী হোক। আমরা যেন পরস্পরকে বিদ্বেষ না করি। আমাদের আধ্যাত্মিক আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক—এই ত্রিবিধ বিঘ্নের শান্তি হোক।

এ থেকেও গুরু-শিষ্যের একাত্মতার প্রমাণ মেলে। আমরা এ আদর্শ এ আচরণ হতে ভ্রষ্ট হয়ে অনেক অনেক দূরে সরে গেছি। ব্রহ্মভাবনা বিস্মৃত হয়েছি। ব্রহ্মভাবও আমাদের বিস্মৃত হয়েছে। জীব ব্রহ্মমুখী না হলে যে ব্রহ্মকৃপা অনুকূল হয় না, তার শ্রেষ্ঠ প্রমাণ গীতার ভগবদ্‌বাক্য—

দেবান্ ভাবয়তানেন তে দেবা ভাবয়ন্তু বঃ।
পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ শ্রেয়ঃ পরমবাপ্স্যথ॥ ৩/১১

অর্থ—(শ্রীভগবান বলছেন) এই যজ্ঞ দ্বারা তোমরা ইন্দ্রাদি দেবতাগণকে সম্বর্ধনা কর এবং দেবতাগণও তোমাদিগকে বৃষ্ট্যাদি-

দ্বারা শস্যাদি উৎপাদনপূর্বক অনুগৃহীত করুন। এইরূপে পরস্পরের ভাবনা দ্বারা তোমরা মঙ্গল লাভ করবে।

আমরা কি অমূল্য সম্পদ হারিয়ে কি পেয়েছি তা বিচার করার সময় যদি এখনো এসে থাকে তবু মন্দের ভাল। শান্তি পেতে হলে বৈদিক ভাবনায় ভাবিত হতেই হবে—এ সত্যকে উপেক্ষা করলে আর যাই হোক শান্তিলাভ যে হবে না তা হলফ করে বলা যায়।

আমরা দেখেছি প্রাগুক্ত বৈদিক মন্ত্রের মূল লক্ষ্য বিদ্যার্থীকে গুরুগৃহে আবাহন করা। এখানে প্রশ্ন আসে—কেন সে আপন গৃহে বসে বেদপাঠ করে জ্ঞানলাভ করতে পারে না? কেন তার জন্য তাকে গুরুগৃহে আসতে হচ্ছে? এ বিষয়ে একটু আলোচনা না হলে মন্ত্রের উদ্দেশ্য স্পষ্ট হবে না। প্রথমতঃ শাস্ত্র পাঠে ব্রহ্মের পরোক্ষজ্ঞান লাভ হতে পারে। কিন্তু ব্রহ্মের অপরোক্ষজ্ঞান (প্রত্যক্ষ বা সাক্ষাৎজ্ঞান) লাভ করতে হলে ব্রহ্মবিদ গুরুর সান্নিধ্য অপরিহার্য। এই আলোচনার ভিতর একটু পরেই আমরা দেখব—যেমন ব্রহ্মচর্য বিনা ব্রহ্মজ্ঞান নয়, তেমনি ব্রহ্মজ্ঞের সাক্ষাৎ সেবা ছাড়াও ব্রহ্মচর্য নয়। ব্রহ্মচারীর ব্রহ্মচর্য ব্রত পরিপূর্ণ ভাবে সামগ্রিক ভাবে পালন করতেই গুরুগৃহে যাওয়া। দ্বিতীয়তঃ এই অপরোক্ষজ্ঞান নিজ গৃহে বসে লাভ হবে না। ব্রহ্মবিদ্ গুরুও যদি ব্রহ্মচারীর গৃহে উপস্থিত থেকে তাকে ব্রহ্মউপদেশ করেন তবুও তা বিদ্যার্থীর পক্ষে পূর্ণফল-দায়ক হবে না। কারণ, ব্রহ্ম উপলব্ধির বিষয়। অনুমানের বিষয় নয়। আর সেই উপলব্ধি করতে যে প্রকার মানসিক প্রস্তুতির আবশ্যক, যেমন—সমগ্র মনদ্বারা মনন করা, সমগ্র দৃষ্টিদ্বারা দর্শন করা, সমগ্র শ্রবণেন্দ্রিয় দ্বারা শ্রবণ করা, সমগ্র বিজ্ঞানদ্বারা উপলব্ধি করা, এর চেয়েও অধিক একাগ্র হয়ে ব্রহ্মভূত হওয়া, তার জন্য উপযুক্ত পরিবেশ ব্রহ্মচারী নিজ গৃহে কখনই পায় না। এখানে স্বজন-প্রীতির মধ্যে মন-বাক্-শ্রোত্র ও বিজ্ঞানের ওপর একা-

ধিপত্য আনতে বাধা পায়। উপনিষদের ভাষায় ঐ রূপ একা-
ধিপত্য প্রাপ্তিকে "স্বারাজ্য" বলে। উপাসক যখন ব্যক্তিগত
ক্ষুদ্র জীবদেহে আবদ্ধ না থেকে বিশ্বাত্মক হয় অর্থাৎ সমগ্র বিশ্বের
আত্মারূপে আপনাকে উপলব্ধি করে এবং বাক্-মন-কর্ণ-বিজ্ঞান
প্রভৃতির অধিপতি হয় তখনই স্বারাজ্য লাভ হয়। এই স্বারাজ্যের
পর ব্রহ্মসহ একত্ব লাভ হয়। এই প্রকার উপলব্ধি-অনুভূতি পেতে
যে নির্মল পরিবেশের আবশ্যক তার জন্যই গুরুগৃহে গমন। তা
ছাড়া শ্রুতি বলেছেন—

যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ
প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ ॥ শ্বেতাশ্বতর উপনিষৎ ৬।২৩

অর্থ—যার পরমেশ্বরে অকৃত্রিম ভক্তি আছে এবং তদনুরূপ ভক্তি
গুরুতেও আছে, উপনিষদ-কথিত তত্ত্ব-বিদ্যা সেইরূপ মহাত্মার
নিকটই প্রকাশিত হয়।

কিশোর ব্রহ্মচারীর পক্ষে পিতা-মাতা বা অন্যান্য স্বজনদের
সমক্ষে গুরুর প্রতি ঐরূপ অনন্যা বা অকৃত্রিম ভক্তি আনা মোটেই
স্বাভাবিক নয়। যতই সাত্বিক বৃত্তির বালক হোক না কেন তার
মনের একটি অংশ উপস্থিত স্বজনদের প্রতি অনুরক্ত থাকবেই।
সুতরাং গৃহে গুরুর প্রতি পরিপূর্ণ ভক্তি সম্ভব নয় বলেও গুরুগৃহে
গমন আবশ্যক হয়।

উপনয়ন সংস্কারের পর বালক ব্রহ্মচারী আখ্যা প্রাপ্ত হয়।
অর্থাৎ সে তখন ব্রহ্মচর্যাশ্রমে প্রবেশ করে এবং বেদ অধ্যয়নের
অধিকার লাভ করে। উপনয়ন শব্দের অর্থ হচ্ছে অধ্যাপনার্থ
বালককে আচার্য সমীপে আনয়ন। উপনয়ন অনুষ্ঠানে কুলগুরুর
নিকট বেদমাতা গায়ত্রী মন্ত্রে দীক্ষালাভ করার প্রাক্ মুহূর্তে বিধি
অনুযায়ী আচার্য বালকের গলদেশে একটি ত্রিদণ্ডী যজ্ঞোপবীত
প্রদান করেন। যজ্ঞসূত্র ধারণ না করে যেমন গায়ত্রী মন্ত্র গ্রহণ

করা চলে না তেমনি বেদ অধ্যয়ন করাও চলে না। সুতরাং যজ্ঞসূত্রকে বেদ অধ্যয়নের ছাড়পত্র বলা চলে। উপনয়নের পূর্বে অবশ্য শ্রাদ্ধের মন্ত্র উচ্চারণ করতে শাস্ত্রের অনুমতি আছে। এ সম্পর্কে মনুসংহিতার উক্তি—

নাভিব্যাহারয়েদ্ ব্রহ্ম স্বধানিনয়নাদৃতে।
শূদ্রেণ হি সমস্তাবদ্ যাবদ্ বেদে ন জায়তে॥ ২।১৭২

অর্থাৎ উপনয়নের পূর্বে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য বালকদের পক্ষে শ্রাদ্ধের মন্ত্র ব্যতীত অন্য কোন বেদমন্ত্র উচ্চারণ করতে নেই। যত দিন না ব্রহ্মজন্ম (উপনয়ন) হয় তত দিন দ্বিজ বালক শূদ্রের সমান থাকে।

শাস্ত্রানুসারে উপনয়নের সময়কাল গর্ভাষ্টমে (গর্ভের আরম্ভ সময় হতে বর্ষ গণনা করে অষ্টম বর্ষে) ব্রাহ্মণের উপনয়ন দেওয়া কর্তব্য। এই সময়কাল জন্মের ৬ বৎসর ৩ মাস পর হতে ৭ বৎসর ৩ মাস পর্যন্ত। ক্ষত্রিয়ের গর্ভৈকাদশে—জন্মের ৯ বৎসর ৩ মাস পর হতে ১০ বৎসর ৩ মাস ভিতর উপনয়ন কর্তব্য। বৈশ্যের গর্ভ-দ্বাদশে-জন্মের ১০ বৎসর ৩ মাস পর হতে ১১ বৎসর ৩ মাস মধ্যে উপনয়ন সংস্কার হওয়া কর্তব্য। বিধানে আছে—ব্রাহ্মণের উপবীত কার্পাস সূত্রে, ক্ষত্রিয়ের শণ-সূত্রে এবং বৈশ্যের উপবীত মেষলোম সূত্রে হবে। —মনুসংহিতা ২।৩৬, ২।৪৪

যজ্ঞসূত্র ধারণ তথা উপনয়নের অধিকার শাস্ত্র শূদ্র বর্ণকে দেননি। ফলে বেদ অধ্যয়নের অধিকার শূদ্রের নেই। কিন্তু বেদে কোথাও বলা নেই যে বেদবিদ্যা বিশেষ শ্রেণীর একক্তিয়ার ভুক্ত। এর কারণ মনে হয়, আদি বৈদিকযুগে সকলেই যখন ব্রাহ্মণ ছিলেন তখন নিষেধের কোন প্রশ্নই ওঠে নি। নিষেধের প্রশ্ন পরে এসেছে। এর প্রমাণস্বরূপ দেখা যায়, মহাভারতের শান্তিপর্বে ভৃগুমুনি ভরদ্বাজ ঋষিকে বলছেন—

ন বিশেষোঽস্তি বর্ণানাং সর্বং ব্রাহ্মমিদং জগৎ।
ব্রহ্মণা পূর্বসৃষ্টং হি কর্মভির্বর্ণতাং গতম্॥ ১৮৮/১০

অর্থাৎ প্রথমে বর্ণসকলের মধ্যে কোন পার্থক্য ছিল না। ব্রহ্মা হতে উৎপন্ন হওয়ায় এই সম্পূর্ণ জগৎ-ই ব্রাহ্মণ ছিল। পরে নানাবিধ কর্মসকলের দ্বারা তাদের মধ্যে বর্ণভেদ উদভূত হয়। কি কারণে বা কি গুণে পরে ব্রাহ্মণ বর্ণ থেকে শূদ্র বর্ণের উদভব হল এবং ধর্মকর্মে শূদ্রের কতটুকু অধিকার তাও জানা যায় মহাভারতের শান্তি পর্বের ১৮৮ অধ্যায় থেকে—

হিংসানৃতপ্রিয়া লুব্ধাঃ সর্বকর্মোপজীবিনঃ।
কৃষ্ণাঃ শৌচপরিভ্রষ্টাস্তে দ্বিজাঃ শূদ্রতাং গতাঃ ॥১৩
ইত্যেতৈঃ কর্মভির্ব্যস্তাঃ দ্বিজাঃ বর্ণান্তরং গতাঃ।
ধর্মো যজ্ঞক্রিয়া তেষাং নিত্যং ন প্রতিষিধ্যতে ॥১৪
ইত্যেতে চতুরো বর্ণা যেষাং ব্রাহ্মী সরস্বতী।
বিহিতা ব্রহ্মণা পূর্বং লোভাৎ ত্বজ্ঞানতাং গতাঃ ॥১৫

অর্থ—যারা শৌচ (বাহ্য শৌচ—জলমৃত্তিকাদি দ্বারা এবং অন্তঃশৌচ—সৎচিন্তাজনিত নির্মল চিত্ত প্রসাদ) ও সদাচার হতে ভ্রষ্ট হয়ে হিংসা এবং অসত্যকে নিজেদের প্রিয়রূপে গ্রহণ করেছে, লোভবশতঃ যারা ব্যাধের ন্যায় সর্বত্র নিন্দনীয় কর্ম করত জীবিকা চালাতে থাকে এবং এজন্য যাদের শরীরের বর্ণ কৃষ্ণ হয়েছে সেই ব্রাহ্মণগণ শূদ্রভাব প্রাপ্ত হয়েছে। ১৩। এই সব কর্মের জন্য ব্রাহ্মণত্বহীন হয়ে পৃথক হয়ে গিয়ে সেই সব ব্রাহ্মণ পৃথক পৃথক বর্ণ হয়ে গিয়েছে। কিন্তু এদের পক্ষে নিত্য ধর্মানুষ্ঠান ও যজ্ঞ কর্মের কোন নিষেধ করা হয় নি। ১৪। এ ভাবে চারি প্রকার বর্ণ হল। এদের জন্য ব্রহ্মা পূর্বে ব্রাহ্মী সরস্বতী (বেদবাণী) প্রকাশিতা করেছিলেন। কিন্তু লোভবিশেষের জন্য শূদ্র অজ্ঞানভাব প্রাপ্ত হয়েছে—বেদ অধ্যয়নে অনধিকারী হয়েছে। ১৫

বৈদিকবিধি প্রণয়নের যুগে শূদ্র জন্মগত কারণে শূদ্র হত না। তার প্রমাণ ছান্দোগ্য উপনিষদে পাওয়া যায়। রৈক্ক ঋষি জানশ্রুতি রাজাকে (বৈদিক যুগের রাজা অবশ্যই ক্ষত্রিয় বর্ণ হবে) ব্রহ্মবিদ্যা বিষয়ক উপদেশকরণের পূর্বে 'শূদ্র' শব্দে সম্বোধন করেছিলেন। উপনিষদের এই তথ্যটি শূদ্রের ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকার সমর্থন করছে বলে মনে হবে। কারণ, শূদ্রের যজ্ঞে অধিকার নেই এ কথা শ্রুতিতে যেমন স্পষ্ট করে বলা আছে, তার ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকার নেই এ কথা কোথাও বলা নেই। অবশ্য মহাভারতে শূদ্রের যজ্ঞ নিষেধ বলে কিছু লেখা নেই। রাজা জানশ্রুতি জাতিতে শূদ্র ছিলেন বলে তাকে শূদ্র শব্দে সম্বোধন করা হয় নি। একদা হংসরূপী ঋষিগণ রাজাকে অনাদর করে কথা বলেছিলেন। তা শুনে রাজার শুক্ বা শোক হয়েছিল বলে তাকে শূদ্র বলা হয়েছিল। শূদ্র শব্দের যৌগিক অর্থ—শুচা দ্রবতি (শুচ্+র) ইতি শূদ্র। যে শোকে দ্রবীভূত হয় সে-ই শূদ্র। সুতরাং 'শূদ্র' আখ্যা যে জন্মগত কারণে দেওয়া হত না তা এখানে সুস্পষ্ট। তা ছাড়া শূদ্রবর্ণে জন্মগ্রহণ করেও যারা সদ্‌গুণশালী ছিল তারা সর্বকালেই সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে এবং শাস্ত্র তা মেনেও নিয়েছেন। যেমন মহাভারতের শান্তি পর্বে আছে—

শূদ্রে চৈতদ্ভবেল্লক্ষ্যং দ্বিজে তচ্চ ন বিদ্যতে।
ন বৈ শূদ্রো ভবেচ্ছূদ্রো ব্রাহ্মণো ন চ ব্রাহ্মণঃ॥

১৮৯/৮

অর্থ—পূর্বোক্ত সত্যাদি সদ্‌গুণ যদি শূদ্রে দেখা যায় এবং ব্রাহ্মণে উহা না থাকে তবে সেই শূদ্র শূদ্র নহে, সেই ব্রাহ্মণও ব্রাহ্মণ নহে।

এর সমর্থন বেদের ভাষ্যস্বরূপ শ্রীমদ্ভাগবতেও দেখা যায়।

যস্য যল্লক্ষণং প্রোক্তং পুংসো বর্ণাভিব্যঞ্জকম্।
যদন্যত্রাপি দৃশ্যেত তত্তেনৈব বিনির্দ্দিশেৎ॥ ৭।১১।৩৫

অর্থ—যে পুরুষের বর্ণজ্ঞাপক যে লক্ষণ বলা হল যদি তদন্য বর্ণেও সেই লক্ষণ দেখতে পাও তবে সেই ব্যক্তিকেও সেই লক্ষণ নিমিত্ত সেই বর্ণ বলে নির্দেশ করবে। অর্থাৎ যদি শমদমাদি সদ্‌গুণ ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য বর্ণেও দেখা যায় তবে সেই লক্ষণ দ্বারাই তাকে ব্রাহ্মণ বলে নির্দেশ করবে। তার জাত-জন্ম অনুসারে নয়।

ভক্তিশাস্ত্রের **"চণ্ডালোঽপি দ্বিজশ্রেষ্ঠঃ হরিভক্তি-পরায়ণঃ"** বাক্যেরও একই মর্ম। পৌরাণিক সংবাদ অতি পুরাতন বলে ছেড়ে দিলেও এখনো নূতনের স্বাদে ভরপুর গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সংবাদে দেখা যাবে মহাপ্রভুর পার্ষদ ও অনুগামীদের ভিতর বহু মহাজন-মহাত্মা অন্য বর্ণ-সম্ভূত হয়েও, এমনকি অহিন্দু হয়েও, ব্রাহ্মণের অধিক পূজার্হ হয়েছেন। গুণগরিমায় ভজন-মহিমায় তাঁরা শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণদেরও প্রণম্য। কর্মগুণে যে জন্মগত বাধা কেটে যায় তার উদাত্ত বাণী বেরিয়েছিল মহাবীর কর্ণের কণ্ঠ হতে—

সূতো বা সূতপুত্রো বা যো বা কো বা ভবাম্যহম্।
দৈবায়ত্তং কুলে জন্ম মদায়ত্তং হি পৌরুষম্॥

অর্থ- আমি সূত হই বা সূতপুত্র হই, বা আমি যে কেউবা হই, উঁচু বা নীচু কুলে জন্ম দৈবঘটন। কিন্তু পৌরুষ-পুরুষকার আমার আয়ত্ত।

বিচার্য বিষয় হচ্ছে কর্ম। কুলের বিচার না করে কর্মের বিচার করবে। যেমন-"মুচি হয়ে শুচি হয় যদি কৃষ্ণ ভজে। আর শুচি হয়ে মুচি হয় যদি কৃষ্ণ ত্যজে।" অব্রাহ্মণ হয়েও রাজর্ষি জনক, পাঞ্চালরাজ প্রবাহণ, পাণ্ডবপিতামহ ভীষ্ম, পুরাণবক্তা সূত, বিদেহ রাজ্যের বণিক তুলাধার প্রভৃতি মহাত্মাগণ মুনিঋষিদেরও তত্ত্বোপদেশ দিতেন এবং সকলের শ্রদ্ধাপূজার পাত্র ছিলেন। শূদ্রযোনি-সম্ভূত মহামতি বিদুর এবং মিথিলার ধর্মব্যাধ প্রভৃতি বেদ অধ্যয়ন-হীন মহাত্মাগণেরও ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়ে ছিল। কর্মই ফলদাতা, জাত-জন্ম নয়।

নারী-সমাজকে বেদপাঠের অধিকার দেওয়া হয় নি। কিন্তু শাস্ত্রে দেখা যায় ঋগ্‌বেদের যুগে ঋষি অগস্ত্যের পত্নী লোপমুদ্রা, ঋষি অত্রির কন্যা বিশ্ববারা ও অপালা, ঋষি কক্ষিবৎকন্যা ঘোষা, ঋষি সাবিত্রী সূর্যা, অম্ভৃণ ঋষির কন্যা বাক্‌ এবং ঋষি ইন্দ্রানী প্রভৃতি সাত-সাতজন মহিলা বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। তা ছাড়া লীলা, গার্গী, মৈত্রী প্রভৃতি ব্রহ্মবিদুষীরা তো আছেনই। সেকালে মহিলারা যে বেদের ব্যাখ্যা করতেন তা সংস্কৃতের 'আচার্যা' শব্দ থেকেই প্রমাণিত হয়। এ সব তথ্যে প্রমাণিত হয়-বেদ পাঠের অধিকার সেকালে সকলেরই ছিল। পরে সমাজে ভ্রষ্টাচার অনুপ্রবেশ করায় বৈদিক শিক্ষা-আচার—আচরণের বিশুদ্ধতা রক্ষার জন্য নিষেধের বেড়াজাল দেওয়া হয়েছে। আসলে ব্রহ্মজ্ঞান লাভের অধিকার সকলের জন্মগত অধিকার। গীতার ৯।৩২ শ্লোকে ভগবান বলেছেন—হে পার্থ! স্ত্রীলোক, বৈশ্য, শূদ্র অথবা যারা পাপযোনিসম্ভূত অন্ত্যজ জাতি তারাও আমার আশ্রয় নিলে নিশ্চয় পরম গতি প্রাপ্ত হয়। সুতরাং ভগবানের আশ্রয় নিতে তথা আশ্রয় নিয়ে বেদপাঠ করতে সকলের সমান অধিকার। ব্রাহ্মণত্ব আসে কর্মের দ্বারে, জন্মের দ্বারে নয়। ক্ষত্রিয়রাজ বিশ্বামিত্র আপন সাধনগুণে মহর্ষি বিশ্বামিত্র হয়ে শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণের স্বীকৃতি লাভ করেছিলেন ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠের কাছথেকে। এখনকার যুগে কিন্তু আমরা গুণের স্বীকৃতি দিতেও পরাঙ্মুখ। এতে সমাজের ক্ষতি বৈ লাভ হচ্ছে কি!

বেদ অধ্যয়নার্থ ব্রহ্মচারী কি রকম গুরু গ্রহণ করবে শ্রুতিতে সে নির্দেশও আছে। "শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠং গুরুম্‌ এব অভিগচ্ছেৎ"—কেবল বেদজ্ঞ এবং ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুর সমীপেই যাবে (মুণ্ডক উপনিষৎ ১।২।১২)। গোস্বামী তুলসীদাসজীর ভাষায়—সদ্‌গুরু পাওয়ে ভেদ বাতাওয়ে, জ্ঞান করে উপদেশ। সদ্‌গুরু অর্থে সৎস্বরূপ পরম ব্রহ্মের সঙ্গে সদাযুক্ত যিনি তিনিই সদ্‌গুরু। পরমার্থ

ছাড়া অন্য পার্থিব বিষয়ে যিনি শিক্ষা দেন তিনি গুরু। যদিও শাস্ত্র গুরু শব্দে অধ্যাত্ম বিদ্যার গুরুকেই নির্দেশ করেছেন তথাপি সদ্‌গুরু বলাতে গুরুর ব্রহ্মবিদ্যা সিদ্ধ হয়েছে। সেকালেও যে সব বেদজ্ঞ আচার্য ব্রহ্মনিষ্ঠ ছিলেন না এবং গুরুগ্রহণে সদা সাবধান থাকতে হয় তার ইঙ্গিত উক্ত বেদমন্ত্র থেকেই পাওয়া যায়। প্রত্যক্ষ প্রমাণস্বরূপ ভক্তবর প্রহ্লাদের দুই আচার্য ষণ্ড এবং অমর্কের কথা উল্লেখ করা যায়। সে কারণেই উপনিষদের ঐ সাবধান-বাণী। এই সাবধান-বাণীর প্রয়োজনীয়তা বর্তমান কালে আরো বেশী নয় কি!

ব্রহ্মচর্যাশ্রমের গুরুত্বের প্রধান কারণ, এখানেই ব্রহ্মচারী ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করবে। ব্রহ্মদর্শী হবে। এখানে একসঙ্গে পরোক্ষ ব্রহ্মজ্ঞানের জন্য বেদপাঠ, অপরোক্ষ ব্রহ্মজ্ঞানের জন্য ব্রহ্মবিদ্ গুরুর উপদেশ গ্রহণ, তার অনুশীলন এবং লব্ধজ্ঞান ধারনার্থ সুমেধা সঞ্চয়ের জন্য সংযম শিক্ষা। আর্যঋষিদের একটি নিগূঢ় বাস্তব সিদ্ধান্ত হল—ব্রহ্মচর্য বিনা ব্রহ্মজ্ঞান নয়। পূর্বে উল্লিখিত "**দমায়ন্তু ব্রহ্মচারিণঃ স্বাহা**" মন্ত্রেই সে সিদ্ধান্তের কথা প্রকাশ করা হয়েছে। যেহেতু ব্রহ্মজ্ঞান লাভ বা ব্রহ্মদর্শন কেবল ব্রহ্মচর্যাশ্রমেরই মূল উদ্দেশ্য নয়, পরন্তু উহা মানবজীবনেরও মূল এবং একমাত্র লক্ষ্য, সে কারণেই ব্রহ্মচর্যাশ্রমের শ্রেষ্ঠত্ব। কি উপায়ে ব্রহ্মচারী ব্রহ্মদর্শন করবে তা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছেন সত্যদ্রষ্টা ঋষি—

সত্যেন লভ্যস্তপসা হ্যেষ আত্মা
সম্যগ্‌জ্ঞানেন ব্রহ্মচর্যেণ নিত্যম্।
অন্তঃশরীরে জ্যোতির্ময়ো হি শুভ্রো
যং পশ্যন্তি যতয়ঃ ক্ষীণদোষাঃ।।

—মুণ্ডক উপনিষৎ ৩।১।৫

অর্থ—যাঁকে নির্মলচিত্ত প্রযত্নশীল ব্যক্তিগণ দর্শন করেন, হৃদয়াকাশে

প্রকাশমান শুদ্ধ জ্যোতির্ময় সেই আত্মাকে সত্যনিষ্ঠা, তপস্যা, সম্যক্ জ্ঞান এবং নিয়ত ব্রহ্মচর্য দ্বারাই লাভ করতে হবে।

এই শ্রুতিবচনে ব্রহ্মজ্ঞান লাভের যে সুনিশ্চিত উপায়ের কথা বলা হয়েছে তার চারটি অঙ্গ— সত্য, তপস্যা, সম্যক্‌জ্ঞান ও সদা ব্রহ্মচর্য। এই চারটিকে অঙ্গ না বলে উপাঙ্গ বললেই বরং মন্ত্রের অন্তর্নিহিত ভাবটি পরিস্ফুট হয় বেশী। কারণ, এই চারটি উপাঙ্গের মিলিত পরিপূর্ণ সাধনা দ্বারাই ব্রহ্মদর্শনরূপ ব্রহ্মাঙ্গ সুসম্পন্ন হয়। এই চারটি বস্তুর কোনটিকে বাদ দেবার তো কোন কথাই আসে না, একটির সাধনে এতটুকু ঘাটতি ঘটলেই বিলকুল চেষ্টা বিফল। চারটি অঙ্গের পরিচয়ঃ

(১) **সত্যেন** (সত্যদ্বারা)—অস্ ধাতু শতৃ প্রত্যয়ে 'সৎ' পদটি সিদ্ধ হয়। যা নিত্য বর্তমান তাই 'সৎ'। "সতে হিতং যৎ"—এই হিতার্থ তদ্ধিত-প্রত্যয়ে 'সত্য' পদটি উৎপন্ন হয়েছে। এর অর্থ-- যথার্থ (যে বস্তু যেমন তার তাই স্বরূপ)। যা চির সৎ যা চির নিত্য—ভূত বর্তমান ভবিষ্যৎ তিন কালেই যা সৎ—এ অর্থে 'সত্য' শব্দটি বেদান্ত শাস্ত্রে ব্রহ্মের পর্যায়।

সত্য অর্থ সত্যের উপলব্ধি। **"সত্যং জ্ঞানম্ অনন্তং ব্রহ্ম"**—ব্রহ্ম সত্যস্বরূপ, জ্ঞানময় এবং অনন্ত (তৈত্তিরীয় উপনিষৎ ২।১।৩)—এই উপলব্ধিসহ সত্যের অনুষ্ঠান। **"সত্যং বদ, সত্যান্ন প্রমদিতব্যম্"**—সত্য বাক্য বলবে, সত্যানুষ্ঠানে অমনোযোগী হবে না (তৈত্তিরীয় উপনিষৎ ১।১১।১) ইত্যাদি আচরণানুষ্ঠান। কি জ্ঞানে কি আচরণে মিথ্যার স্পর্শদোষ থাকলেও ব্রহ্মলাভ হবে না।

শ্রীমদ্ ভাগবতের মঙ্গলাচরণ-মন্ত্র—**ওঁ সত্যং পরং ধীমহি**—আমরা পরম সত্যের ধ্যান করি। এই পরম সত্যই হচ্ছেন ভাগবতের রাসবিহারী কুঞ্জবিহারী কৃষ্ণচন্দ্র। তাঁর ধ্যান করেই

তাঁর লীলাকথা শুরু করা হয়েছে। সত্যই কৃষ্ণ। কৃষ্ণই একমাত্র পরম সত্য।

(২) **তপসা** (তপস্যাদ্বারা)—তপস্যার অর্থ ইন্দ্রিয় সংযম করে একাগ্রচিত্তে পরমাত্মার মনন চিন্তন ধ্যান আরাধনা ইত্যাদি। সাধন-ভজন ক্ষেত্রে 'তপস্যা' একটি সদাব্যবহৃত শব্দ। ভজনের সঙ্গে তপস্যার অঙ্গাঙ্গি সম্বন্ধ। বিভিন্ন সাধনার লক্ষ্য এক না হলেও তপস্যা প্রত্যেকেরই প্রয়োজন। সুতরাং তপস্যা শব্দের গূঢ়ার্থ বুঝতে চেষ্টা করা যেতে পারে। এই আলোচনার মুখ্য বিষয় ব্রহ্মজ্ঞান। উপনিষদ কথিত ব্রহ্মজ্ঞান। এ জ্ঞানের আবিষ্কার কর্ত্রী এবং সংবাদদাত্রী উপনিষদ। আবার তিনিই আলোচ্য মন্ত্রে বলে দিচ্ছেন কি উপায়ে এ জ্ঞান লাভ করা যায়। শুধু তাই নয়, উপায়ের বিচার-বিশ্লেষণও করে দিচ্ছেন উপনিষদ। তপস্যার বিশ্লেষণ করতে গিয়ে মুণ্ডক উপনিষদ বলছেন—

'তপসা চীয়তে ব্রহ্ম' (১/১/৮)

অর্থাৎ, তপস্যাদ্বারা (মননাত্মক জ্ঞানের দ্বারা) ব্রহ্ম উপচিত হন। উপচিত হওয়া মানে উপচে পড়া। যেমন, একটা পাত্রে অল্পপরিমাণ জল আছে। বিনা কারণে সে জল পাত্র উপচে বাইরে পড়ে যাবার নয়। যদি ঐ জলপাত্রটিতে আগুনের তাপ দেওয়া যায়, তা হলে তাপাঙ্ক একটা নির্দিষ্ট মাত্রায় পৌঁছলে তাপে জল গরম হয়ে আপন আকার স্ফীত করে পাত্র হতে বাইরে উপচে পড়ে যায়। ঠিক এই ভাবটি উপনিষদ বুঝাতে চাইছেন "তপসা চীয়তে ব্রহ্ম" বাক্য দ্বারা। এখানে তপস্যারূপ আগুনের তাপে ক্ষুদ্র হৃদয়-পাত্রস্থিত ব্রহ্মবারি উপচে পড়ে বাইরে প্রকাশিত হয় বা তপস্যাকারীর অনুভবগম্য হয়—এই ভাব। আমাদের হৃদয়ে অন্তর্যামীরূপে ব্রহ্ম সর্বদা বিরাজ করছেন। আমরা তাঁকে দেখতে পাই না, অনুভব করতে পারি না। কিন্তু তপস্যারূপ আগুন বা তপাগ্নি বা, মননাত্মক জ্ঞানাগ্নি জ্বালালে এবং সেই আগুনের তাপ

একটা নির্দিষ্ট বিন্দুতে পৌছলে (অর্থাৎ তপস্যা করতে করতে তপস্যা একটা পরিপক্ক স্তরে পৌছলে) অন্তর্যামী ব্রহ্ম ঐ তাপে স্ফীত-কলেবর হন। তখন হৃদয়পাত্রে তাঁর দেহ ধরেনা। পাত্রের পরিধি থেকে ব্রহ্মের পরিধি বড় হয়ে যায়। ফলে তিনি হৃদয়গুহা থেকে বাইরে উপচে পড়েন, অর্থাৎ প্রকাশিত হয়ে পড়েন। আমরা তখন তাঁকে অনুভব করতে পারি, আস্বাদন করতে পারি। আত্মদর্শন করতে পারি। "তপসা চীয়তে"র এই অভিপ্রায়। আবার 'বহু হব' বা 'বীজের অঙ্কুরোৎগমন' এ ভাবও হয়।

তপস্যা শব্দের জন্ম তপ শব্দ হতে। তপ শব্দের জন্ম তপ: (তপস্) শব্দ হতে। তপ শব্দের অর্থ হচ্ছে গ্রীষ্ম, গরম, সূর্য, রৌদ্র, তাপ ইত্যাদি। সুতরাং তপস্যা শব্দের ভিতরেই গরম বা তাপ লুকিয়ে আছে। তপস্যার মূল ব্যঞ্জনাই হচ্ছে তাপ দেওয়া। বেদান্ত মতে—তপ: ঈশ্বরের বিভূতিবিশেষ। আগুনে সোনা পোড়ালে যেমন খাদ-ময়লা প্রভৃতি গলে পুড়ে গিয়ে খাঁটি সোনা বেরিয়ে আসে, তেমনি তপাগ্নিতে চিত্তের পাপাদি মলভার গলে পুড়ে গিয়ে চিত্ত শুদ্ধ হয়। চিত্তশুদ্ধি না হলে ব্রহ্মজ্ঞান হতেই পারে না। একারণেই তপস্যার অপরিহার্যতা।

তৈত্তিরীয় উপনিষদ ৩য় অধ্যায়ের ২-৫ মন্ত্রে বলছেন—**তপসা ব্রহ্ম বিজিজ্ঞাসস্ব। তপো ব্রহ্মেতি।** অর্থাৎ—তপস্যা দ্বারা ব্রহ্মকে বিশেষভাবে জানতে ইচ্ছা কর। তপস্যাই ব্রহ্ম। এখানে বিশেষ ভাবে জানতে ইচ্ছা কর মানে ব্রহ্মে প্রতিষ্ঠিত হও। ব্রহ্মজ্ঞানী হও। তপস্যা দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞ হও। এখানেও বলতে চাইছেন তপস্যা ভিন্ন ব্রহ্মজ্ঞান হয় না। 'তপো ব্রহ্মেতি' বাক্যে পরিষ্কারভাবে বলে দিলেন —তপস্যা নিজেই সাক্ষাৎ ব্রহ্ম। গীতার ৭/৯ শ্লোকে ভগবান বললেন—**তপশ্চাস্মি তপস্বিষু**—আমি তপস্বিদিগের তপ: স্বরূপ। তপস্যার এই স্বরূপ জেনে তপস্যায় বসলে তবেই তপস্যার পূর্ণ ফল লাভ হয়। আচার্য শংকর তপস্যার অর্থে

বলছেন—উৎপত্তি বিষয়ক জ্ঞান, এবং উপাসনার অর্থ করছেন—শাস্ত্রোক্ত কোনও বিষয় অবলম্বন করে একজাতীয় চিন্তাপ্রবাহ। অথবা দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া এক বিষয়ে নিবিষ্ট চিন্তাধারা। উপাসনা এবং তপস্যার মুখ্য ফল চিত্তশুদ্ধি।

(৩) **সম্যগ্‌ জ্ঞানেন** (সম্যক্ জ্ঞান দ্বারা)—যদিও সম্যক্ শব্দের অভিধানগত অর্থ—সমূহ বা পূর্ণরূপে, কিন্তু এখানে সম্যক্ জ্ঞানের অর্থ হচ্ছে--সমাহৃত অপরোক্ষ জ্ঞান। অর্থাৎ বিজ্ঞান। প্রশ্ন উপনিষদের ৮/৯ মন্ত্রে আছে—

এষ হি দ্রষ্টা স্প্রষ্টা শ্রোতা ঘ্রাতা রসয়িতা
মন্তা বোদ্ধা কর্তা বিজ্ঞানাত্মা পুরুষঃ।

অর্থ—এই জীবাত্মাই দর্শন কর্তা, স্পর্শন কর্তা, শ্রবণ কর্তা, ঘ্রাণ কর্তা, আস্বাদন কর্তা, মননকারী, নিশ্চয়কারী, কর্মকর্তা, বিজ্ঞানাত্মা পুরুষ। বিজ্ঞানাত্মা শব্দের অর্থ হল বিজ্ঞাতৃ-স্বভাব আত্মা। ইনিই জীবাত্মা। এঁর স্বভাবই হচ্ছে বিজ্ঞাতৃমূলক। অর্থাৎ সব কিছু জানা, আস্বাদন করা, অনুভব করা। আর যিনি পরমাত্মারূপে আমাদের দেহ-পুরে শায়িত আছেন তিনি নির্বিকার নিরপেক্ষ নিরাসক্ত অচঞ্চল আনন্দময় পুরুষ। ইনি নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্তস্বভাব দ্রষ্টা মাত্র। সাধনগুণে সম্যক্-জ্ঞানময় বা বিজ্ঞানময় জীবাত্মা পরমাত্মায় প্রতিষ্ঠিত হন। জাগ্রত অবস্থায় যিনি পরমাত্মাতে উক্তপ্রকার প্রতিষ্ঠালাভ করেন তিনিই ব্রহ্ম উপলব্ধি করেন। কঠ উপনিষদের ১।৩।৯ মন্ত্রে আছে—

বিজ্ঞান সারথির্যস্তু মনঃপ্রগ্রহবান্ নরঃ।
সোঽধ্বনঃ পারমাপ্নোতি তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্॥

অর্থ—সত্যদৃষ্টি সম্পন্ন বুদ্ধি যে পুরুষের দেহরথের সারথি এবং যাঁর বল্গারূপী মন সংযত এবং ইন্দ্রিয়গণকে দমন করতে সমর্থ তিনি সংসার মার্গের অপর পারস্বরূপ বিষ্ণুর পরম পদ প্রাপ্ত হন।

এখানেও ব্রহ্মজ্ঞান লাভের উপায় চারটি অঙ্গকে স্পষ্ট দেখা

যাবে। সত্য-দৃষ্টিতে 'সত্য', দেহরথের সারথিরূপে 'সম্যক্জ্ঞান', বল্গারূপী মন সংযততে 'তপস্যা' এবং ইন্দ্রিয় দমনে 'ব্রহ্মচর্য'।

তৈত্তিরীয় উপনিষদে ৩য় অধ্যায়ে ৫ মন্ত্রে আছে—

বিজ্ঞানং ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ। অর্থ—(ভৃগু মুনি) জানলেন বিজ্ঞানই বা বুদ্ধিই ব্রহ্ম। গীতার ১৮।৫১ শ্লোকে-**'বুদ্ধ্যা বিশুদ্ধয়া যুক্তো'** ইত্যাদি বাক্যে বলা হয়েছে—আত্মাকে ব্রহ্মরূপে নিশ্চয়-পূর্বক সংশয় ও বিপর্যয়-শূন্য বুদ্ধির সহিত।

জ্ঞান সম্পর্কে গীতায় একটি বিশেষ লক্ষণীয় বিষয় আছে। এখানে চতুর্থ অধ্যায়ে বলেছেন জ্ঞান-যোগের তত্ত্ব এবং সপ্তম অধ্যায়ে বলেছেন জ্ঞান-বিজ্ঞান যোগ। এ দুটি যোগের পার্থক্য ধরা পড়লে বিজ্ঞান শব্দটির অর্থ পরিস্কার হবে। জ্ঞান যোগের মূল কথা—বহিরঙ্গ জ্ঞানের দ্বারা সংশয় ছেদন করে নিষ্কাম কর্ম-যোগ দ্বারা কর্মে ব্রহ্মদর্শন করে বিজ্ঞানময় জীবাত্মায় প্রতিষ্ঠিত হওয়া। সপ্তম অধ্যায়ে বলছেন—জ্ঞান-বিজ্ঞান যোগ দ্বারা জীবাত্মাকে পরমাত্মায় প্রতিষ্ঠিত করে পূর্ণ ব্রহ্মানন্দ বা ব্রহ্ম-জ্ঞান লাভ করতে। এখানে পরমাত্মার স্বরূপকে জ্ঞান (ব্রহ্মজ্ঞান) বলা হয়েছে এবং উহার উপলব্ধির উপায়কে বিজ্ঞান বলা হয়েছে। তাই জ্ঞান-বিজ্ঞান যোগ। গুরুমুখ এবং শাস্ত্রমুখ হতে যে তত্ত্ব লাভ হয় তা হল জ্ঞান। ঐ জ্ঞানের যখন উপলব্ধি হয় তখন জীবাত্মা বিজ্ঞাতৃ-স্বভাব প্রাপ্ত হয়। অর্থাৎ ব্রহ্মকে (পরমাত্মাকে) জানবার জন্য ব্রহ্মমুখী হয়। ইহাই বিজ্ঞান। এই বিজ্ঞান-শক্তি গুণে জীবাত্মা ক্রমে ক্রমে জীবভাব পরিত্যাগ করে ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হয়। জীব-ভাব সম্পূর্ণরূপে চলে গেলেই ব্রহ্মস্বভাব। ব্রহ্মজ্ঞান।

(৪) **ব্রহ্মচর্যেণ নিত্যম্** (নিয়ত ব্রহ্মচর্য দ্বারা)—সর্বকালে ব্রহ্মচর্য পালন। অর্থাৎ অবিচ্ছিন্ন ইন্দ্রিয় সংযম। ব্রহ্মচর্য ব্রতের এইটিই মূল ঘুঁটি। এ ঘুঁটি ঠিক ঠিক চালতে না পারলে রসব্রহ্মের খেলায় হার অবশ্যম্ভাবী। **"ব্রহ্মণি যশ্চরতি স ব্রহ্মচারী, তস্য**

ধর্মঃ ব্রহ্মচর্যম্।" যে ব্রহ্মে বিচরণ করে অথবা ব্রহ্মে সদাযুক্ত যে সে-ই ব্রহ্মচারী। তার ধর্মকর্মকে ব্রহ্মচর্য বলে। **"বীর্য-ধারণং ব্রহ্মচর্যম্।"** বীর্য ধারণ করাই ব্রহ্মচারীর ব্রহ্মচর্য।

পাতঞ্জল দর্শন বলেন—

ব্রহ্মচর্য প্রতিষ্ঠায়াং বীর্যলাভঃ ॥ ৩৮ ॥

ব্রহ্মচর্যের প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ বীর্যনিরোধ-সামর্থ্য সুসিদ্ধ হলে বীর্য অর্থাৎ নিরতিশয় সামর্থ্য জন্মে। অণিমাদি প্রভৃতি অষ্ট সিদ্ধিলাভ সহজ হয়।

"কর্মণা মনসা বাচা সর্বাবস্থাসু সর্বদা।
সর্বত্র মৈথুনত্যাগো ব্রহ্মচর্যং প্রচক্ষতে॥"

অর্থ—কর্ম মন বাক্যদ্বারা সকল অবস্থায় মৈথুন ইচ্ছা ত্যাগ করাকে ব্রহ্মচর্য বলে।

মৈথুন আট প্রকার-

"শ্রবণং কীর্তনং কেলিঃ প্রেক্ষণং গুহ্যভাষণম্।
সঙ্কল্পোঽধ্যবসায়শ্চ ক্রিয়ানিষ্পত্তিরেব চ॥
এতন্মৈথুনমষ্টাঙ্গং প্রবদন্তি মনীষিণঃ।
বিপরীতং ব্রহ্মচর্যমনুষ্ঠেয়ং মুমুক্ষুভিঃ॥"

অর্থ—স্ত্রী চরিত্র শ্রবণ করা, তাদের গুণ কীর্তন, তাদের সঙ্গে খেলা, তাদের প্রতি কুদৃষ্টিপাত, গোপনে তাদের সঙ্গে আলাপ, স্ত্রী সম্ভোগের ইচ্ছা, সেই ইচ্ছা পূরণের জন্য চেষ্টা এবং উহা কার্যে পরিণত করা—এই আট প্রকার কার্যকে মনীষীগণ অষ্টাঙ্গ মৈথুন বলেন। এর বিপরীত আচরণদ্বারা মোক্ষাভিলাষীগণ ব্রহ্মচর্য পালন করেন।

আমাদের শরীর সপ্ত ধাতুতে তৈরী, যথা—রস, রক্ত, মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা ও শুক্র। খাদ্যবস্তু আহারের পর ৫ দিনে তা পরিপাক হয়ে প্রথমে রসে পরিণত হয়। রস ৫ দিনে রক্তে, রক্ত ৫ দিনে মাংসে, মাংস ৫ দিনে মেদে, মেদ ৫ দিনে অস্থিতে, অস্থি

৫ দিনে মজ্জায় এবং মজ্জা ৫ দিনে শুক্রে পরিণত হয়। এই শুক্রকেই বীর্য বলে। ভুক্তদ্রব্য ক্রমান্বয়ে পরিপাক হয়ে বীর্যে পরিণত হতে প্রায় ৩৫ দিন সময় লাগে। অর্থাৎ যে ব্যক্তি ৫ সপ্তাহ মধ্যে বীর্যক্ষয় করে না তার অর্ধসের পরিমাণ রক্তে এক বিন্দু বীর্য উৎপন্ন হতে পারে। শিব সংহিতা বলছেন—

"মরণং বিন্দুপাতেন জীবনং বিন্দুধারণাৎ।
তস্মাদতি প্রযত্নেন কুরুতে বিন্দু ধারণম্॥"

অর্থ—বীর্যক্ষয় মৃত্যুর সমান। বীর্য ধারণেই জীবনী শক্তি। সুতরাং অতি যত্নসহকারে বীর্য ধারণ করবে।

বীর্যই জীবের জীবনীশক্তি। প্রাণের অবলম্বন। আনন্দের নিদান। বীর্যই ঘনীভূত আনন্দ। সুতরাং যে কৈশোরকাল হতে বীর্য অটুট অক্ষয় রাখে তার প্রাণ-মন অফুরন্ত আনন্দে উৎসাহে অধ্যবসা-শীলতায় শতদলের ন্যায় শতমুখে বিকশিত হতে থাকে। অটুট অক্ষরিত রূপে বীর্য রক্ষিত হলে তা ঊর্ধ্বগতি প্রাপ্ত হয়ে শরীরের ঐশ্বর্যবিকাশী অষ্টম ধাতু ওজঃ উৎপন্ন করে। ওজো ধাতু মস্তিষ্কে অবস্থান করত মানবকে দেবত্ব প্রদান করে। ওজঃ ধারণকারী ব্যক্তিকে ঊর্ধ্বরেতা বলা হয়। তিনি সর্বদা ব্রহ্মভাবাপন্ন, তাই সর্বদা ব্রহ্মে বিচরণ করেন। তিনিই প্রকৃত ব্রহ্মচারী। বিন্দু-ভগবানকে তিনি দেহে রুদ্ধ করে রেখেছেন। তিনিই পরম ভক্ত যাঁর দেহে বীর্যব্রহ্ম পূর্ণশক্তিতে বিরাজ করছেন। এ সম্পর্কে শিববাক্য আছে,—

যথা —ন তপস্তপ ইত্যাহু ব্রহ্মচর্যং তপোত্তমম্।
ঊর্ধ্বরেতাঃ ভবেৎ যস্তু স দেবো ন তু মানবঃ॥জ্ঞাঃতঃ

অর্থ—সাধারণ তপস্যাকে তপস্যা বলে না। ব্রহ্মচর্যই শ্রেষ্ঠ তপস্যা। যিনি ধৃতবীর্য, ঊর্ধ্বরেতা তিনি মানুষ নন। তিনি দেবতা।

মহাভারতের উদ্যোগ পর্বে ৪৪শ অধ্যায়ের দ্বিতীয় শ্লোকে বলা হয়েছে—**বুদ্ধৌ বিলীনে মনসি প্রচিন্ত্যা বিদ্যা হি সা ব্রহ্মচর্যেণ লভ্যা।**

অর্থ—বুদ্ধিতে মনের লয় হলে সর্ববৃত্তিসমূহের নিরোধকারী যে স্থিতি, উহার নাম ব্রহ্মবিদ্যা। এই বিদ্যা ব্রহ্মচর্য পালনে লাভ হয়ে থাকে।

বীর্য-ই ব্রহ্ম। এ তত্ত্ব বুঝতে আমাদের বিশেষ অসুবিধে নেই। কারণ, একবিন্দু বীর্য হতে একটি জীবের জন্ম হয়। বীজ বা ব্রহ্ম বিনা প্রাণের জন্ম সম্ভব নয়। গীতার ৭।১০ শ্লোকের—'**বীজং মাং সর্বভূতানাং**' এবং ১৪।৪ শ্লোকের '**অহং বীজপ্রদঃ পিতা**' প্রভৃতি ভগবদ্‌বাক্যে বিশ্বসৃষ্টিকারী বীজের কথা যেমন আছে তেমনি এতে ব্যক্তি সৃষ্টিকারী বীজের কথাও আছে। সুতরাং একবিন্দু বীর্যে সৃষ্টির বীজরূপে পূর্ণব্রহ্ম বিরাজমান। এই বিন্দু-ব্রহ্ম যখন কোন শরীরে অটুট অক্ষরিত অবস্থায় থাকে তখন তা ঐশী শক্তি স্বরূপ ওজো ধাতুতে পরিণত হয়। ওজোধাতুর স্বাভাবিক ধর্ম ঊর্ধ্ব-গতি। একারণে ঊর্ধ্বরেতা ব্যক্তির মন-চিন্তা-চিত্ত সর্বদাই ঊর্ধ্বমুখী, ব্রহ্মমুখী রয়। তখন তার সহস্রারের সহস্রদল পদ্ম পূর্ণ বিকশিত হয়। সে তখন আপন মৃগমদ গন্ধে আপনি বিভোর। বীর্যের অবরোহণ শক্তি রুদ্ধ হবার ফলে তার আরোহণ শক্তি, ঊর্ধ্বগামী শক্তি, ব্রহ্মমুখী শক্তি শতগুণে বেড়ে যায়। ব্রহ্মচিন্তা-ব্রহ্মধ্যান তার নিকট তখন সহজ স্বাভাবিক ক্রিয়ার রূপ নেয়। ব্রহ্ম-জ্ঞান লাভের জন্য ব্রহ্মে ধ্যান নিবদ্ধ করতে যে এককেন্দ্রিক মানসিক শক্তির আবশ্যক তা তখন তার করায়ত্ত। গীতায় ধ্যানযোগের উপদেশকালে ৬।১৪ শ্লোকে শ্রীভগবান বলছেন—**ব্রহ্মচারিব্রতে স্থিতঃ**—ব্রহ্মচর্যশীল হয়ে সমাধিস্থ হবে। সমাধির অর্থ পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার ঐক্য। ব্রহ্মচর্য ভিন্ন উহা সম্ভব নয়।

বীর্য যে ভগবানের স্বরূপ অর্থাৎ বীর্যই যে দেহস্থিত কৃষ্ণশক্তি তা শ্রীমদ্‌ভাগবত পরিষ্কার ভাষায় বলেছেন—

ওজঃ সহো বলং প্রাণমমৃতং মৃত্যুমেব চ।
তমজ্ঞায় জনো হেতুমাত্মানং মন্যতে জড়ম্॥ ৬।১২।৭

অর্থ—ওজঃ সাহস বল প্রাণ অমরত্ব এবং মৃত্যু এ সমুদয়ই ভগবানের স্বরূপ। সেই কালরূপী ভগবানকে কারণ বলে না বুঝে লোক জড় দেহকে কারণ বলে মনে করে।

'ব্রহ্মচর্যেণ নিত্যম্' মন্ত্রের মূলতত্ত্ব হচ্ছে—অপরোক্ষ ব্রহ্মজ্ঞান ইন্দ্রিয়াতীত বস্তু। ইন্দ্রিয়াতীত বস্তু বিষয়ে কোন শুদ্ধ ধারণা-বোধ সম্ভব নয় চিদালোক বা প্রজ্ঞালোকিত চেতনা ছাড়া। ঊর্ধ্বরেতা ব্যক্তির মস্তিষ্কে সঞ্চিত অখণ্ড ওজো-প্রভায় তার চিদাকাশ আলোকিত হয়। কেবল সেই আলোর জ্যোতিতেই জ্যোতির্ময়ের স্বরূপ অনুভূত হয়। তাই বীর্য ধারণকেই ব্রহ্মজ্ঞান লাভের একমাত্র চাবিকাঠি বলা হয়। ওজঃ চিন্ময় বস্তু। চিন্ময়ের মাধ্যমে চিন্ময়তত্ত্ব লাভ। এখানে বিশেষভাবে লক্ষণীয় হল—ব্রহ্মদর্শন বা ব্রহ্মানুভূতি নির্ভর করছে বীর্যশক্তি ধারণের উপর। সেই বীর্যশক্তি ধারণ করতে অর্থাৎ দেহের মূল শক্তিকে রক্ষা করতে যেসব ব্রত পালন বা আচার-অনুষ্ঠান, তাই হচ্ছে মূল শক্তি সাধনা বা শক্তি পূজা। শক্তি পূজার মূলবীজ বীর্যশক্তি ধারণের মধ্যেই লুক্কায়িত। ব্রহ্মচর্য রক্ষা করা তথা রেতঃপাত নিরোধ করাই শক্তি-সাধনা। বীর্যই মানব দেহের মূলশক্তি, আদ্যাশক্তি, আদিশক্তি। কারণ, একদিন এই বীর্য-ব্রহ্ম হতেই এ দেহটি তৈরী হয়েছিল। সুতরাং বীর্যই দেহের সৃষ্টিকারী আদি শক্তি। এখন বীর্যশক্তি দেহের অন্যান্য শক্তিগুলিকে পোষণ করছে বলে সে প্রধানা শক্তি বা আদ্যাশক্তি। আমাদের দেহের ভিতরে যে শক্তি দেহের বাইরেও সেই একই শক্তি। ঐ একই অখণ্ড শক্তির মূর্তি গড়েই আমরা পূজা করি। বিশ্বের সর্বত্র এক অখণ্ড শক্তি নানা রূপে কাজ করছেন। এই শক্তিই ব্রহ্মজ্ঞানের মূলাধার। বীর্যশক্তিই দশভুজারূপে দশদিক হতে ঐশ্বর্য আহরণ করেন, আবার দশ প্রহরণ ধরে জীবকে রক্ষা করেন। বীর্যশক্তিই মহালক্ষ্মী-

রূপে নারায়ণকে ভজনা করার জন্য নারায়ণী শক্তি প্রদান করেন। আবার মহাসরস্বতীরূপে কৃষ্ণপ্রেম আস্বাদনের চতুঃষষ্টি কামকলায় পারদর্শী করান। বীর্য শক্তিই যোগমায়ারূপে পরম পুরুষের সহিত মিলন ঘটান। এই শক্তির অপচয় করে জীব নরকে নিমজ্জিত হয়, আবার ধারণ করে ব্রহ্মস্বরূপ হয়। এই শক্তিই পরম গুরু। এঁকে পূর্ণভাবে রক্ষা করার সাধনাই আসল শক্তি সাধনা। অন্য ভাবেও বলা যায়, সব রকম সাধনার মূলে আছে এই শক্তি। দৈহিক শক্তি পূর্ণমাত্রায় না থাকলে দৃঢ় মনোবল জন্মে না। দৃঢ় মনো-বল না হলে কোন সাধনায়ই সিদ্ধিলাভ ঘটে না।

বৈদিক সাধনা তথা বৈষ্ণব সাধনার সঙ্গে শক্তি সাধনা যে অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। বঙ্গদেশে বৈদিক সাধনা বলতে প্রধানতঃ বৈষ্ণব সাধনা বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রদর্শিত মার্গকেই বুঝায়। মহাপ্রভুর আদিষ্ট মত ও পথ সম্পূর্ণরূপে ভাগবতীয়, যার মূল ভিত্তি বেদ। সুতরাং যারা শক্তি সাধনাকে একটু অন্যচোখে দেখতে চান তাঁদের এই বিষয়টি ভেবে দেখতে সশ্রদ্ধ অনুরোধ করব এই প্রশ্ন নিয়ে—সত্যি কি শক্তি ছাড়া শক্তি-মানের ভজনা চলে? না, এঁদের আলাদা করা যায়? "গ্রন্থরূপে ভাগবত কৃষ্ণ অবতার"—বেদের অকৃত্রিম ভাষ্য তথা বৈষ্ণব সাধনার প্রধান উপজীব্য। বৈষ্ণবদের শক্তিসাধনা যে অবশ্য করণীয় তার প্রমাণ ভাগবতের সেই বিখ্যাত আরাধনা-মন্ত্র, যে মন্ত্রোচ্চারণ করে ব্রজবালাগণ মাসভর প্রতি প্রাতে যমুনা পুলিনে নন্দনন্দনকে পতিরূপে পাবার জন্য কাত্যায়নী দেবীর অর্চনারূপ মহাব্রতের অনুষ্ঠান করে ছিলেন—

কাত্যায়নি! মহামায়ে! মহাযোগিন্যধীশ্বরি!
নন্দগোপসুতং দেবি! পতিং মে কুরু তে নমঃ॥

১০।২২।৪

অর্থ—হে দেবি কাত্যায়নি! হে মহামায়ে! হে অঘটন-ঘটন

সমর্থে ! হে অধিশ্বরি ! হে ক্রীড়ারসাভিজ্ঞে ! আপনি নন্দগোপ-সুতকে আমার পতি করে দিন। আপনার চরণে প্রণাম।

এখানে "পতিং মে কুরু" মন্ত্রাংশে এই তত্ত্ব সুস্পষ্ট যে প্রেম-ঘন কৃষ্ণকে প্রাণপতিরূপে পেতে হলে মহাযোগিনী মহামায়ার কৃপা ছাড়া অন্য উপায় নেই। পরমপুরুষের সঙ্গে এরূপ যোগাযোগ সংঘটনের কর্তা বা কর্ত্রী একমাত্র তিনি। শক্তির সহায়তা ছাড়া শক্তিমানকে পাবার অন্য কোন মাধ্যম ভাগবত স্বীকার করেন নি।

এই সিদ্ধ মন্ত্রের একটু ইতিহাস আছে। কৃষ্ণকে পতিরূপে পাবার জন্য প্রবল লালসাবতী গোপকুমারীবৃন্দ একদা কোন নির্জন স্থানে মিলিত হয়ে পরস্পর আপন আপন অন্তরের ব্যথা প্রকাশ করছিলেন ও নয়ন ধারায় স্নাত হচ্ছিলেন। একটু দূরথেকে বৃন্দা দেবী কুমারীদের বিরহ-কাতরতা দেখে কাছে এসে তাদের কথা শুনে আশ্বাস দিয়ে বললেন—আমি যোগমায়ার মন্ত্রসাধনায় সিদ্ধিলাভ করেছি। আমার সিদ্ধবিদ্যা জানা আছে। আমি সেই সিদ্ধমন্ত্র তোমাদের উপদেশ করছি। মাত্র এক মাস ব্রত করলেই তোমাদের কামনা পূরণ হবে। এই বলে বৃন্দা দেবী কুমারীদের কর্ণে সিদ্ধ যোগমায়ামন্ত্র প্রদান করলেন এবং ব্রতের বিধি বলে দিলেন। কৃষ্ণপ্রিয়া বৃন্দা দেবী কৃষ্ণানুরাগিনী কুমারীদের গুরু হলেন এবং কৃষ্ণের সঙ্গে যুক্ত করার একমাত্র কর্ত্রী যে কাত্যায়নী সেই গুহ্য তথ্যটিও মন্ত্রমুখে বলে দিলেন কুমারীদের। গুরু শিষ্যকে পৌঁছে দিবেন যোগমায়ার নিকট। যোগমায়া কৃপাকরে কৃষ্ণের সঙ্গে যুক্ত করে দিবেন সাধককে। ইহাই ভজনের ক্রম-রহস্য। নারীর অন্দর মহলে যেমন নারীর অবাধ প্রবেশাধিকার, প্রকৃতি গুরুর বা স্ত্রী-গুরুরও তেমনি সাধক-শিষ্যকে পরমা প্রকৃতির দরবারে পৌঁছে দিতে একক সামর্থ্য। রসের ভজন শ্রেষ্ঠতম ভজন বলে স্বীকৃত। আর সেই ভজন গোপীঅনুগত হয়ে করতে হয় তাও সর্ব-জন স্বীকৃত। সেই গোপীদের গুরু হলেন একজন নারী। গুরু

তন্ত্রের এটি গুহ্যসূত্র। এই সূত্র সম্পর্কে পরিষ্কার জ্ঞান না থাকলে রসের ভজনে রসসৃষ্টি হয় না। এ বিষয়টি আমাদের প্রকাশিত 'গুরুতত্ত্ব বন্দনা' পুস্তকে বিস্তৃতভাবে আলোচিত হওয়ায় এখানে আর অধিক বলা অনাবশ্যক।

আরো একটি কথা। ভাগবতে যোগমায়ার পরিচয় এখানে কাত্যায়নীরূপে। কারণ, কাত্যায়ন মুনিই সর্বপ্রথম এই দেবীর আরাধনা করেন কৃষ্ণকৃপার জন্য। এজন্য ইনি কাত্যায়নী নামে প্রসিদ্ধা হলেন। কাত্যায়নীতন্ত্রে এঁর সাধন প্রণালী বর্ণিত আছে। বৃন্দা দেবীকেও দেখাযায় সিদ্ধবিদ্যার অধিকারিনীরূপে। এসব থেকে কিন্তু তন্ত্রসাধনার গন্ধ নিশ্চিতরূপে পাওয়া যাচ্ছে। এতে সহজেই প্রমাণিত হচ্ছে যে তন্ত্রসাধনার মূল লক্ষ্য যোগমায়া বা কাত্যায়নীর কৃপায় কৃষ্ণপ্রেম লাভ করা, এবং শুদ্ধ তন্ত্রমত শক্তি-বাদ ছাড়া আর কিছু নয়। সুতরাং শক্তিবাদে এবং ভক্তিবাদে মূলতঃ কোন দ্বন্দ্ব নেই। বরং ভক্তিবাদের ভিত্তি শুদ্ধা শক্তি-বাদ। ভক্তিও যে একটি শক্তি, ভক্তিদেবী যে শক্তিদেবীর বিশুদ্ধ সংস্করণ,এ তত্ত্ব পরিষ্কার না হওয়া পর্যন্ত শক্তিবাদ আর ভক্তিবাদে দ্বন্দ্ব—বিবাদ থেকেই যাবে। এর সমর্থনে আলোচনা করা যেতে পারে ভগবানের শক্তিতত্ত্ব নিয়ে। গীতার ৭।৫ শ্লোক থেকে জানা যায় ভগবানের দুই প্রকার প্রকৃতি বা শক্তি—**পরা** এবং **অপরা**। পরা ভগবানের অব্যক্ত শক্তি বা নির্গুণ—শক্তি এবং অপরা ঈশ্বরের ব্যক্ত বা সগুণ—শক্তি। শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে শ্রুতিবিদ্যাসংবাদে বর্ণিত আছে—

জানাত্যেকা পরা কান্তং সৈব দুর্গা তদাত্মিকা।
যা পরা পরমাশক্তির্মহাবিষ্ণুস্বরূপিণী।।
যস্যা বিজ্ঞানমাত্রেণ পরাণাং পরমাত্মনঃ।
মুহূর্তাদ্দেবদেবস্য প্রাপ্তির্ভবতি নান্যথা।।

অর্থ—মহাবিষ্ণুস্বরূপিণী পরমাশক্তি দুর্গা শ্রীভগবানের স্বরূপাভিন্না

এবং শ্রীভগবানের তত্ত্বাভিজ্ঞা। তাঁর স্বরূপজ্ঞানে পরাৎপর শ্রীভগবানের তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয়। তাঁর কৃপা ব্যতীত শ্রীভগবৎ প্রাপ্তির আর অন্য উপায় নেই।

ভজনতত্ত্ব নিয়ে যাঁরাই একটু নাড়া-ঘাঁটা করেন তাঁরাই জানেন 'নারদ পঞ্চরাত্র' সর্ব সম্প্রদাযের ভিতর শ্রদ্ধার এক উঁচু আসন দখল করে আছেন তাঁর সুগভীর তত্ত্বসিদ্ধান্তের জন্য। সুতরাং উক্ত শ্লোকের প্রামাণিকতা সম্পর্কে কোন প্রশ্নই আসে না। পরমপুরুষকে পেতে হলে যে পরমা প্রকৃতির মাধ্যমেই পেতে হবে এবং পরম পুরুষের ভজনার আগে পরমা প্রকৃতির ভজন করে তাঁকে তুষ্টা করে তাঁর অনুমতি নিতে হবে পরমপতির ভজনার জন্য—ইহা শাস্ত্রেরই নির্দেশ। প্রকৃতি হচ্ছে ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বা স্বভাব। ব্যক্তিকে সঠিকভাবে জানতে হলে আগে তার স্বভাব-চরিত্র অবশ্যই পূর্ণভাবে জানতে হবে। আমাদের সাধন-সিদ্ধিতে বঞ্চিত হবার মুখ্য কারণ, আমরা পরম পুরুষের স্বভাব-প্রকৃতিকে এড়িয়ে আগেই তাঁকে জানতে যাই। প্রকৃতিতত্ত্ব তথা শক্তিতত্ত্ব না বুঝে শক্তিসাধনাকে উপেক্ষা করি।

অবশ্য শক্তি-সাধনার পথে মস্তবড় একটি ফাঁড়া আছে। বোধহয় সেই ফাঁড়ার ভয়ে কোন কোন সম্প্রদায় এপথ মাড়ান না। ফাঁড়াটি হল অষ্টসিদ্ধির দূরতিক্রম্য নাগপাশ। অণিমা লঘিমা মহিমা (বা গরিমা) ব্যাপ্তি প্রাকাম্য বশিত্ব ঈশিত্ব এবং কামাবসায়িত্ব এই আট প্রকার অঘটন সংঘটনকারী দৈবীশক্তি লাভ হয় শক্তিসাধনায়। বহু শক্তিসাধক এই সব শক্তির মোহে এখানেই মশগুল থাকেন। পরমপদের কথা বেমালুম ভুলেযান। অথবা ঐসব শক্তি চতুরতা করে সাধককে এখানেই ভুলিয়ে রাখেন। আগে বাড়তে দেন না। এই সব শক্তি-বিভূতি পরমা প্রকৃতিই দেন সাধককে পরীক্ষা করার জন্য এবং ভুলিয়ে রাখার জন্য যাতে সে যোগমায়ার নিকট কৃষ্ণধন প্রার্থনা না করে। যেমন আমাদের

মায়েরা খেলনা দিয়ে শিশুদের ভুলিয়ে রাখেন তেমনি মহামায়া এই সব বিভূতি দিয়ে সাধককে ভুলিয়ে রাখেন। এই ভয়ে কোন কোন সম্প্রদায় মহামায়াকে এড়িয়ে চলেন। কিন্তু তাতে লোকসানটাই বেশী হয়। কৃষ্ণধন পাওয়া যায় না। কৃষ্ণ পেতে হলে মহামায়ার এই বিভূতি-খেলার ঝুঁকি অবশ্যই নিতে হবে। যে সাধক এই সব অষ্টসিদ্ধাইতে শিশুরমত মজে যায় সে তো কৃষ্ণপ্রেমের সর্বতোভাবে অনুপযুক্ত। এতটুকু পরীক্ষা না করে কি বিশ্বজননী তাঁর তোরঙ্গ খুলে বিরিঞ্চিদুর্লভ নীলমণিটিকে শিশু সন্তানের হাতে তুলে দিতে পারেন! এতটা আশা করাও জ্ঞানাভাবের লক্ষণ। যে জন কৃষ্ণপ্রেমের মূল্য জানে না, সে-ই অষ্টসিদ্ধিতে ভুলে থাকে। তন্ত্রসাধনার মূল লক্ষ্য যে শ্রীগোবিন্দের আরাধনা সে কথা শ্রীভগবান স্বমুখেই বলেছেন তাঁর প্রিয়তম ভক্ত উদ্ধবকে।

বৈদিকস্তান্ত্রিকো মিশ্র ইতি মে ত্রিবিধো মখঃ।
ত্রয়াণামীপ্সিতেনৈব বিধিনা মাং সমর্চ্চয়েৎ॥

ভাগবত ১১।২৭।৭

অর্থ (শ্রীভগবান বললেন) বৈদিক, তান্ত্রিক ও উভয়মিশ্রিত— আমার পূজা এই তিন প্রকার। এই তিনের মধ্যে যার যেরূপ অভীষ্ট সে সেই বিধিদ্বারাই আমার পূজা করবে।

তন্ত্রমত যে বেদবিধি বহির্ভূত নয় তার প্রমাণ ভাগবতে আরো আছে। ভাগবতের বিখ্যাত নবযোগীন্দ্র সংবাদে দেখা যায়—

য আশু হৃদয়গ্রন্থিং নির্জ্জিহীর্ষুঃ পরাত্মনঃ।
বিধিনোপচরেদ্দেবং তন্ত্রোক্তেন চ কেশবম্॥

১১।৩।৪৭

অর্থ—জীবাত্মার শীঘ্র বন্ধনচ্ছেদনে অভিলাষী ব্যক্তি যথাবিধি বেদ ও তন্ত্র বিহিত কর্মদ্বারা পরমদেব কেশবেরপূজা করবে।

দ্বাপরে ভগবান্ শ্যামঃ পীতবাসা নিজায়ুধঃ।
শ্রীবৎসাদিভিরঙ্কৈশ্চ লক্ষণৈরুপলক্ষিতঃ ॥ ১১।৫।২৭
তং তদা পুরুষং মর্ত্ত্যা মহারাজোপলক্ষণম্।
যজন্তি বেদতন্ত্রাভ্যাং পরং জিজ্ঞাসবো নৃপ ॥
১১।৫।২৮

অর্থ—দ্বাপরে ভগবান শ্যামবর্ণ পীতবাসা চক্রধারী এবং শ্রীবৎসাদি চিহ্ন ও অন্যান্য সুলক্ষণে শোভিত হয়ে প্রত্যক্ষ হন। হে নৃপ, তখন তত্ত্বজিজ্ঞাসু মানবগণ ছত্রচামরাদি মহারাজোচিত ঐশ্বর্যযুক্ত সেই পরম পুরুষকে বেদ ও তন্ত্রবিধি দ্বারা পূজা করে থাকেন।

বিশুদ্ধ তন্ত্রসাধনার চরম পরিণতি যে শ্রীশ্রীরাধা গোবিন্দের উপাসনা এবং পরম প্রাপ্তি যে কৃষ্ণপ্রেম তার জ্বলন্ত উদাহরণ হচ্ছে রামী-চণ্ডিদাসের বাশুলীমাতার সাধনা এবং পদ্মাবতী-জয়দেবের পঞ্চমুণ্ডী আসনে সিদ্ধি লাভ। মনে হয় শক্তিসাধনা পথভ্রষ্ট হয়ে বর্তমান তন্ত্রসাধনার রূপ নিয়েছে। কিছু তন্ত্রসাধক তাঁদের আসল উদ্দেশ্যের কথা একদম ভুলে গিয়ে অষ্টসিদ্ধির খেলায় মত্ত আছেন। একারণেই তন্ত্রমত বৈদিকমত হতে ভিন্ন মনে হচ্ছে। আসলে তন্ত্রে-বেদে বা আগমে-নিগমে কোন দ্বন্দ্ব নেই। দ্বন্দ্ব ঘটেছে আমাদের জ্ঞানে-আচরণে। শুদ্ধজ্ঞান এলেই আচরণ শুদ্ধ হবে। তখন আর কোনপ্রকার মতভেদের কথা উঠবে না।

শক্তি-সাধনার প্রয়োজনীয়তার স্বপক্ষে আরো একটি অকাট্য উদাহরণ দেওয়া চলে। অর্জুনের দুর্গাস্তুতি। কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধারম্ভের প্রাক্কালে সর্বশক্তির মূলাধার, **"যতঃ কৃষ্ণস্ততো জয়ঃ"** (মহাভারত ভীষ্মপর্ব ২১।১২) মন্ত্রের অধিদৈবত স্বয়ং কৃষ্ণভগবান অর্জুনের রথের সারথি তথা যুদ্ধক্ষেত্রের ক্ষেত্রপরিচালক হয়েও যুদ্ধজয়ের উদ্দেশ্যে অর্জুনের হিতের নিমিত্ত অর্জুনকে আদ্যাশক্তি

শ্রীদুর্গার ধ্যান করতে আদেশ করলেন। সর্ববিধ জয়ের কর্তা কেন অর্জুনকে যুদ্ধজয়ের জন্য মা দুর্গার নিকট প্রার্থনা জানাতে বললেন তা না বুঝতে পারলে কৃষ্ণতত্ত্ব বুঝতেও অসুবিধে হবে। শক্তিতত্ত্ব না বুঝলে শক্তিমানের তত্ত্ব বুঝা যায় না। কৃষ্ণচন্দ্র স্বয়ং প্রেমতত্ত্ব হয়েও শক্তিতত্ত্ব প্রকাশার্থ এভাবে অর্জুনকে আদেশ দিলেন—

শুচির্ভূত্বা মহাবাহো সংগ্রামাভিমুখেঽস্থিতঃ।
পরাজয়ায় শত্রুণাং দুর্গাস্তোত্রমুদীরয় ॥

মঃ ভাঃ ভীষ্মপর্ব ২৩/২

অর্থ—মহাবাহু অর্জুন, তুমি পবিত্র হয়ে যুদ্ধের অভিমুখে অবস্থান করত শত্রুগণের পরাজয়ের জন্য দুর্গাস্তব পাঠ কর।

শুধু এখানেই নয়, দ্রোণ পর্বের ৭৯শ অধ্যায়ে দেখাযায় অভিমন্যু বধের পর কৃষ্ণ ভগবান অর্জুনকে শিবপূজা করতে বললেন যুদ্ধজয়ের জন্য। কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের ব্যবহারিক অর্থ ধরলে বলতে হয় যে, সংসার সংগ্রামে শত্রুদমনের শক্তিলাভের জন্যই যদি আদ্যাশক্তি আরাধনার আদেশ স্বয়ং পূর্ণতম ব্রহ্মের নিকট হতে আসে, তবে সাধনসমরে শত্রুজয় করতে কতখানি শক্তিনির্ভর হতে হবে তা তত্ত্বদর্শী পাঠকগণ অনুভব করবেন। শক্তি ছাড়া শক্তিমানের ভজনা চলেনা একথা আমরা মুখেই বলি, অনুভবে আনি না।

শাস্ত্রীয় বিধিমতে কৃষ্ণমন্ত্র জপ করার পূর্বে ঋষ্যাদি ন্যাস করার সময়ে কৃষ্ণমন্ত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবতারূপে দুর্গার স্মরণ এবং হৃদয়ে ন্যাস করতে হয়। রাধাকৃষ্ণ-যুগল উপাসনায় আগে রাধানাম পরে কৃষ্ণনাম গ্রহণেরও একই তত্ত্ব। আগে রাধা-শক্তির কৃপালাভ পরে শক্তিমান কৃষ্ণ লাভ। শ্রীরাধা যে পূর্ণতমা শক্তিতত্ত্ব তার প্রমাণ—

(১) শ্রীকৃষ্ণো জগতাং তাতো, জগন্মাতা চ রাধিকা।

নারদীয় পঞ্চরাত্র ২।৬।৭

(২) রাধাদ্যাঃ পূর্ণাঃ শক্তয়ঃ।

যস্যা অংশ লক্ষ্মীদুর্গাদিকা শক্তিঃ ॥

—অথব বেদের-পুরুষবোধিনী শ্রুতি।

(৩) অংশিনী রাধা হৈতে তিন গণের বিস্তার (চৈঃচঃ ১।৪।৬৬)। তিন গণের=তিন শ্রেণী কান্তার=লক্ষ্মীগণের, মহিষীগণের এবং ললিতাদি ব্রজাঙ্গনাগণের আবির্ভাব।

বস্তুতঃ শক্তিই আমাদের প্রথমা এবং প্রধানা গুরু। আমাদের প্রথম শিক্ষা আরম্ভ হয় মাতৃগর্ভে অবস্থানকালে। শুধু সুভদ্রানন্দন অভিমন্যুই মাতৃগর্ভে বসে চক্রব্যূহ ভেদ করার কৌশল জ্ঞাত হয় নি। আমরা সকলেই মাতৃগর্ভে অবস্থানকালে মায়ের আচরণ নিষ্ঠা ধর্মানুরাগ থেকে প্রথম পাঠ গ্রহণ করি। গর্ভধারিণী জননীই জীবের প্রথম গুরু। একারণে অন্তঃসত্ত্বাকালে মায়েদের রামায়ণ মহাভারতাদি ধমশাস্ত্র প্রত্যহ পাঠ বা শ্রবণ করার বিধি। এই মাতৃশক্তিই স্তরভেদে প্রকৃতি-গুরু, মহামায়া-গুরু, যোগমায়া-গুরু, সখীমঞ্জরী-গুরু এবং পরিশেষে রাধা-গুরু। তৎপরে জগৎগুরু সাক্ষাৎ বা কৃষ্ণ লাভ। ইহাই গোপীপ্রেম লাভের গুপ্ত পথ। কি অষ্ট সিদ্ধি কি নবরসে সিদ্ধি, সব সিদ্ধিই প্রকৃতি-গুরুর হাতে। সাধনতত্ত্বের গভীরে পৌছিলে শক্তিতে আর ভক্তিতে কোন দ্বন্দ্ব-ভেদ দেখা যায় না। বরং দেখাযাবে শক্তিতত্ত্ব হতেই রসতত্ত্ব নিঃসৃত হচ্ছে। দেখাযাবে রস বা প্রেমই বিশ্বের সর্বপ্রধান শক্তি যার বশ হন পূর্ণতম ব্রহ্ম কৃষ্ণচন্দ্র। তাইতো তিনি ব্রজবনিতার অঞ্চলবদ্ধ। তাঁকে ছুঁতেহলে প্রকৃতির কৃপা কুড়াতেই হবে।

তবু যদি শক্তি আর ভক্তিতে কিছুমাত্র ভেদ দেখি তা আমাদের অশ্রদ্ধ-অসূয়ক মনের বিকার মাত্র। শাক্তে—বৈষ্ণবে ভেদজ্ঞানরূপ শাস্ত্রবিরোধী আচরণ না করে বরং সাধনশক্তি লাভের প্রার্থনা

নিয়ে শক্তিআরাধনা করলে ভজনে সিদ্ধিলাভের পথ সুগম হবে। শ্রী.শ্রীচণ্ডী মন্ত্রের একাদশ অধ্যায়ে নারায়ণীস্তুতিতে চণ্ডীকে বা কাত্যায়নীকে নারায়ণী বলে সম্বোধন করা হয়েছে। কারণ, তিনি নারায়ণের পূর্ণতমা শক্তি। তিনিই মহালক্ষ্মী। নারায়ণ-তত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত হতে গেলে মহামায়াকে নারায়ণী রূপে ধ্যান করতেই হবে। নারায়ণ-তত্ত্ব অবগত হবার পর কৃষ্ণতত্ত্ব জানাযাবে। তখন এই নারায়ণীই শ্রীরাধা বা কৃষ্ণবল্লভা।

ব্রহ্মচর্যব্রতের সঙ্গে শক্তিপূজার নৈকট্যযোগ সম্পর্কে আলোচনা পূর্ণ হবে না যদি শিবতত্ত্ব বিষয়ে একটু বলা না হয়। শক্তির কথা অসম্পূর্ণ থেকেযাবে যদি তাতে শিবকে যুক্ত করা না হয়। সে হবে শিবহীন যজ্ঞ, মঙ্গলবর্জিত মঙ্গলাচরণ। শিবশংকর আমাদের প্রাণের অতি প্রিয় দেবতা। হিন্দুধর্মে ইনিই একমাত্র দেবতা যিনি সকল মতাবলম্বীর নিকট সমভাবে পূজ্য। তিনি আশুতোষ। অতি শীঘ্র অতি অল্পেই তুষ্ট। কত অসুরকে যে তিনি অল্পসেবায় তুষ্টহয়ে এমন মারাত্মক মারাত্মক বর দিয়েছেন যার তাল সামলাতে ভগবান বিষ্ণুকে পর্যন্ত সুদর্শন চক্র নিয়ে ছুটে আসতে হয়েছে। আমরা জানি হরি-হর একাত্মা। অর্থাৎ যেই হরি সেই হর। গুরু আর গোবিন্দ যেমন অভেদ, হরি এবং হর তেমনি অভেদ তত্ত্ব। আমরা প্রায় সকলেই ভাবি—বুঝি হরিকে আমরা জেনে ফেলেছি। কিন্তু হর-তত্ত্ব না জানলে, শিব যে জগৎগুরু তা বুঝতে না পারলে হরিকে জানা সম্পূর্ণ হবে না। মনে হয়, হরি সম্পর্কে বলা যত সহজ, হর সম্পর্কে বলা তত সহজ নয়। তা ছাড়া এই আলোচনাক্ষেত্র হর সম্পর্কে বিস্তৃত বলার স্থানও নয়। তাই সংক্ষেপে কিছু নিবেদন করছি।

শিব শব্দের বহুবিধ অর্থ। তার মধ্যে উল্লেখ্য—শুভ, সর্বজ্ঞ, সুখ, সুন্দর, রম্য, মুক্তি, বিন্দু, বেদ, অদ্বৈতব্রহ্ম, প্রভৃতি ভজনাঙ্গিক অর্থ। আমরা যে **'সত্যং শিবং সুন্দরম্'** বলি তা

এক অর্থে পরম ব্রহ্মের পরিচায়ক সৎ-চিৎ-আনন্দকেও বুঝায়। অর্থাৎ শিবতত্ত্ব ব্রহ্মতত্ত্বের পরিচায়ক। শিবশংকরের ছবি এখন সকলের চোখেই ভাসছে। সুতরাং তাঁর ছবি নিয়েই শুরু করা যাক্।

(১) তিনি শববৎ শয়ান। বক্ষে নৃত্যরতা দিগম্বরী, যেন প্রলয়ের বুকে প্রসবিনী। শিবসম নিশ্চল নিষ্ক্রিয় নির্গুণ ব্রহ্মহতে উদ্ভূত সগুণব্রহ্মরূপে চঞ্চলা জননী। যেন নির্গুণের ওপর সগুণের লীলা।

(২) তাঁর তুষারশুভ্র দেহবরণ শুদ্ধ সত্ত্বগুণের প্রতীক। শ্রেষ্ঠতম তত্ত্বের প্রতীক।

(৩) নগ্নপদ নগ্নদেহ ভোগ বিলাস বর্জনের প্রতীক। বিষয়া-সক্তিহীনতার পরিচায়ক।

(৪) পরিধানে ব্যাঘ্রচর্ম। ব্যাঘ্র শ্রেষ্ঠত্বের প্রতীক, যেমন—নরব্যাঘ্র। শিবকে বাঘের ছাল পরিয়ে দেবসমাজে তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ দেওয়া হয়েছে। তিনি দেবাদিদেব। মহাদেব। দেব প্রধান।

(৫) ঊর্ধ্বাঙ্গ সর্পবেষ্টিত। সর্প কামের প্রতীক। সাপ শিবের অঙ্গে চলাফেরা করছে। অথচ তাঁকে দংশন করছে না। অর্থাৎ শিব কামকে বশীভূত করেছেন। জয় করেছেন। নির্বিষ করেছেন। সর্পবিভূষণ নিষ্কামের চিহ্ন।

(৬) নীল কণ্ঠ। কণ্ঠ নীল বর্ণ। শ্রীমদ্ভাগবতের ভাষায়—সমুদ্র মন্থনে উগ্রহলাহল নামক বিষ উৎপন্ন হলে লোক-পালগণের সহিত প্রজাসকল ভীত ও অরক্ষিত হয়ে অতি শীঘ্র সদাশিবের শরণ গ্রহণ করলেন। প্রজাসকলের

ঐরূপ বিপদ দর্শনে অত্যন্ত কৃপাপরবশ হয়ে সর্বজীববন্ধু মহেশ্বর প্রিয়া দেবী সতীকে এই কথা বললেন—'প্রাণভয়ে কাতর প্রজাবর্গকে অভয়দান করা আমার কর্তব্য, যেহেতু দীনজনকে পালন করাই সমর্থ ব্যক্তির কার্য। মায়ামুগ্ধ এবং বৈরভাবাপন্ন দীন জীবগণকে সাধুগণ ক্ষণভঙ্গুর নিজ প্রাণ দ্বারা রক্ষা করে থাকেন। যে পুরুষ কৃপা করেন হরি তার প্রতি প্রীত থাকেন। সুতরাং এ বিষ আমি পান কবি। প্রজাগণের মঙ্গল হোক।' তারপর ভূতভাবন মহাদেব জীবেরপ্রতি অনুগ্রহ করে সর্বত্র ব্যাপ্তপ্রায় ঐ হলাহল বিষকে করতলমাত্র পরিমিত করে পান করলেন। বিষ মহাদেবেরপ্রতিও নিজ বীর্য প্রকাশ করল। তাতে শিবের কণ্ঠদেশ নীলবর্ণ হয়ে গেল। কৃপালু শিবের উহাও ভূষণস্বরূপ হল। অন্যের নিমিত্ত কষ্টভোগই অখিলাত্মা বিষ্ণুর শ্রেষ্ঠ আরাধনা (৮ম স্কন্ধের ৭ম অধ্যায়ের ১৮শ শ্লোক হতে ৪৪শ শ্লোকের সারার্থ)। বিশ্বের সমস্ত অমঙ্গলরূপ হলাহলকে যিনি পান করে সর্বজীবের মঙ্গল করেন তিনিই দেবাদিদেব মঙ্গলময় মহাদেব। শ্রেষ্ঠ গুণে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ।

(৭) অর্ধনিমীলিত চক্ষু। চোখের নিম্নভাগ বন্ধ—নিম্নমানের বস্তুরপ্রতি, বিষয় প্রপঞ্চেরপ্রতি দৃষ্টি নেই। মায়া রহিত। চোখের ঊর্ধ্বভাগ খোলা-ঊর্ধ্বদৃষ্টি, লক্ষ্য ঊর্ধ্বে পরম পদে। ধ্যাননেত্র—সদা হরিধ্যানে মগ্ন। হরিময়। ধ্যানে একাত্মতা।

(৮) ত্রিনয়ন। তিনটি চক্ষু। তৃতীয়টি জ্ঞানচক্ষু। প্রজ্ঞানেত্র। ত্রিনয়ন ত্রিকালদর্শীর প্রতীক। ব্রহ্মদর্শী। সর্বজ্ঞ।

(৯) ভালে অর্ধ চন্দ্র। কপালে একফালি চাঁদ। চন্দ্র বীর্য

বা শুক্রের প্রতীক, যেমন—'দুগ্ধেতে চন্দ্রবৃদ্ধি ঘৃতে বৃদ্ধি বল।' কপালের উর্ধ্বদেশে মস্তিষ্ক সংলগ্ন চন্দ্রের অবস্থিতি। কারণ, তিনি উর্ধ্বরেতাঃ। রেতঃ বা বীর্য উর্ধ্বগামী হয়ে মস্তিষ্কে সঞ্চিত হয়ে ওজঃধাতুতে পরিণত হয়ে জ্যোতি বিকিরণ করছে। পূর্ণচন্দ্রই ওজঃধাতুর উপযুক্ত প্রতীক। কিন্তু এখানে অর্ধচন্দ্র কামকলা প্রকাশার্থে। অর্ধচন্দ্র অর্থাৎ চন্দ্রকলা বা কামকলা। শিব কামকলা বিশারদ। কলা-বিশারদ বা সর্ববিদ্যা-সর্বকলায় সুপণ্ডিত। তিনি বীর্যপতনহীন কামক্রীড়াতে সুদক্ষ, তাই অর্ধচন্দ্র-ভূষণ। শিব আয়ুর্বেদের গুরু, তাই তিনি বৈদ্যনাথ। তিনি ধনু-র্বেদের গুরু, তাই তাঁর নাম ধন্বী বা শূলী বা পিনাকী। তিনি সঙ্গীতকলা তথা রাগ-রাগিণীর গুরু। অখিল কলা-গুরু তিনি। প্রজাপতিগণ তাঁকে জগৎগুরু বলে অর্চনা করেছেন। (ভাগবত ৮। ।২২)

(১০) শিরে জটাভার। ঐহিক পারত্রিক সবরকম জটিলতাকে একজোট করে জটা পাকিয়ে শিরে ধারণ করে নির্বিকার চিত্তে হরিধ্যানে মগ্ন। ভক্তের সমস্ত জটিলতা জগৎগুরু শিরে তুলে নিয়েছেন। হাজারো জটিলতায় শিব অবিচল অচঞ্চল। শিবনামে মনের সব জট খুলে যায়। কি সংসার-পথে কি সাধনপথে সর্বত্রই কিছু না কিছু জট-ঝামেলা থাকবেই। সেগুলোকে মাথার ভিতরে না নিয়ে বাইরে বাড়তে দাওয়া।

(১১) জটার মধ্যে গঙ্গা দেবী। গঙ্গার জন্ম শ্রীহরির শ্রীপাদ-প্রক্ষালন জল হতে (ভাগবত ১১।৬।১৯)। তাই শ্রীহরির মত গঙ্গার এত পাবনী শক্তি। সুতরাং তাঁর স্থান শিরে। গঙ্গাদেবীর মর্ত্যে অবতরণকালে ভগীরথের প্রার্থনায় গঙ্গার প্রচণ্ড বেগ সর্বলোকহিতকারী ভগবান শংকর আপন শিরে

ধারণ করেছিলেন। পাবনী শক্তি ধারণের ক্ষমতা একমাত্র ঊর্ধ্বরেতা শিবেরই আছে। বাল্মীকি রামায়ণ বলেন—একদা শিববীর্য অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হলে অগ্নি তা সহ্য করতে না পেরে গঙ্গাতে নিক্ষেপ করেন। তা থেকে গঙ্গাগর্ভে দেব-সেনাপতি কার্তিকেয় জন্মলাভ করেন। এ কারণে কার্তি-কের এক নাম গঙ্গাজ। সেই সূত্রে গঙ্গাদেবী শিবের ঘরণী। সতিন সতীর ভয়ে গঙ্গাদেবী শিবের জটামধ্যে লুকিয়ে থাকেন। (মহাভারত ও ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে কার্তিকের জন্মকথা ভিন্নরূপে আছে।) আরো একটু গভীরে গেলে দেখাযাবে গঙ্গার পাবনী শক্তি ওজঃ শক্তিরই ব্যঞ্জনা মাত্র। গঙ্গাজলে আমরা শুদ্ধ হই, পবিত্র হই। গীতার ৪।৩৮শ শ্লোকে ভগবান বলেছেন—**ন হি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে।** ইহ-লোকে জ্ঞানের ন্যায় পবিত্র আর কিছু নেই। যিনি নিজে পবিত্র তিনিই কেবল অপরকে পবিত্র করতে পারেন। সুতরাং জ্ঞানই আমাদের সবচেয়ে বেশী পবিত্র করতে পারে। ওজোশক্তিপ্রসূত ঐ ব্রহ্মজ্ঞান স্বতঃই অন্তঃকরণে উদিত হয়। ভাগবতের ১১।১৬।৩২শ শ্লোকে ভগবান বলেছেন—**ওজঃসহো বলবতাং**-আমি বলবানের ওজ ও সহ। শিব ঊর্ধ্বরেতা তাই ওজঃ শক্তির ধারক, ব্রহ্মজ্ঞানী, শুদ্ধতম এবং পবিত্রতম। এই শুদ্ধতম তত্ত্বের প্রতীক হল শিরে গঙ্গা। শিব গঙ্গাধর, ওজঃ শক্তির ধারক।*

(১২) দক্ষিণ হস্তে ত্রিশূল। শূল অর্থ বেদনা বা দুঃখ। জীবের দুঃখ তিন প্রকার—আধ্যাত্মিক (আত্মসংক্রান্ত), আধিদৈবিক (দৈবজাত) এবং আধিভৌতিক (জীবজন্তু হতে উৎপন্ন)। এই তিন প্রকার যন্ত্রনা হতে জীবকে তিনি রক্ষা করেন। অথবা ঐ তিন প্রকার দুঃখকে তিনি আপন ব্রহ্মতেজরূপ

ত্রিশূল দ্বারা বিনাশ করেন। ত্রিগুণাত্মিকা শক্তির প্রতীক এই ত্রিশূল। তিনি ত্রিতাপহন্তা।

ত্রিশূলের এক-একটি ফলাকে দণ্ড ধরলে তিনি ত্রিদণ্ডী। বাগ্‌দণ্ড মনোদণ্ড কায়দণ্ড—এই ত্রিদণ্ডধারী সন্ন্যাসী।

মৌনং বাচো দণ্ডঃ। অনীহা (কাম্যকর্মত্যাগো) কায়ঃ দণ্ডঃ। অনিলায়ামঃ (প্রাণায়ামঃ) চেতসঃ দণ্ডঃ।

ভাগবত ১১।১৮।১৭ শ্লোকার্থ

কায়-মন-বাক্যকে বিবেক-বৈরাগ্যদণ্ড দ্বারা সম্পূর্ণরূপে সংযত করে সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী। 'স' অর্থে জীবাত্মা। জীবাত্মাকে পরমাত্মায় লয় করলেই 'স'এর নাশ হয়। 'স' নাশ হলেই সন্ন্যাসী। শিব দেবাদিদেব মহাদেব এবং ঈশ্বরেরও ঈশ্বর মহেশ্বর বা বিশ্বেশ্বর হয়েও সর্বত্যাগী শ্মশানবাসী সন্ন্যাসী। আত্মভোলা। সদাই জীবভাবের ঊর্ধ্বে। পরমাত্মারূপী হরির প্রেমে জীবভাব-আত্মভাব আত্মসম্মান ডুবে গেছে।

ভারতীয় সাধনতত্ত্বে সন্ন্যাসব্রতের স্থান সর্বোচ্চে। তার প্রমাণ আছে ভাগবতের ১১।১৬।২৬শ শ্লোকে যেখানে শ্রীভগবান বলেছেন—**'ধর্ম্মাণামস্মি সন্ন্যাসঃ'**—ধর্মসমূহ মধ্যে আমি সন্ন্যাস। এ কারণেই এদেশের সাধুসমাজে সর্বকালেই সন্ন্যাসীদের দোর্দণ্ড প্রতাপ। আমাদের দেশে সকল ধর্মসম্প্রদায়ের ভিতরই যেমন সন্ন্যাস অবলম্বীরা আছেন, আবার ভারতের বাইরে অন্যান্য ধর্মমতাবলম্বীদের মধ্যেও সন্ন্যাসব্রত আছে। এই সন্ন্যাসব্রতের মূল প্রবক্তা যে শিবশংকর ভোলানাথ তা আজ আমরা অনেকেই ভুলতে বসেছি। শিবতত্ত্বে অবগাহন না করেই সন্ন্যাসী সেজে বসে আছি। দেখা যাবে অধিকাংশ সন্ন্যাসীরাই যেন সবকিছু ত্যাগ করেও সম্মাননাকে ত্যাগ করতে পারেন নি। তাঁরা ভুলে যাচ্ছেন বিষ্ণুপুরাণের হুঁশিয়ারী—

সম্মাননা পরাং হানিং যোগর্দ্ধেঃ কুরুতে যতঃ।
জনেনাবমতো যোগী যোগসিদ্ধিঞ্চ বিন্দতি ॥

২।১৩।৪২

অর্থ—সম্মাননাই যোগসম্পত্তির বিঘ্ন করে থাকে। এই কারণে যোগীগণ লোককর্তৃক অবমানিত হয়েই যোগসিদ্ধি লাভ করতে পারেন।

এ বিষয়ে আর একটি কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয়। ভক্তশ্রেষ্ঠ উদ্ধব কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হয়ে শ্রীভগবান সনাতন ধর্ম বলতে গিয়ে বললেন—

গৃহং বনং বা প্রবিশেৎ প্রব্রজেদ্বা দ্বিজোত্তমঃ।
আশ্রমাদাশ্রমং গচ্ছেন্নান্যথা মৎপরশ্চরেৎ ॥

ভাগবত ১১।১৭।৩৮

অর্থ—ব্রহ্মচর্য পালনের পর গার্হস্থ্যাশ্রমে প্রবেশ করবে, অথবা বানপ্রস্থ অবলম্বন করবে ; আর মৎপরায়ণ দ্বিজোত্তম সন্ন্যাস গ্রহণ করবে। এই যে আশ্রমগ্রহণ ইহা পরপর পর্যায়ক্রমে করতে হবে। ইহার অন্যথা করবে না।

এই শ্লোকে 'দ্বিজোত্তমঃ' এবং 'আশ্রমাদাশ্রমং' বাক্য দুটি বিশেষভাবে অনুধাবনের বিষয়। শাস্ত্রে দ্বিজ বলতে যাদের উপ-নয়নের অধিকার আছে সেই ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যকেই সাধারণতঃ বুঝায়। কিন্তু এই শ্লোকের টীকায় শ্রীধর স্বামীপাদ বলেছেন—' ** শুদ্ধান্তঃকরণঃ স চ দ্বিজোত্তমো ব্রাহ্মণশ্চেৎ প্রব্রজেদিত্যর্থঃ। দ্বিজোত্তম ইত্যুক্তেঃ ক্ষত্রিয়বৈশ্যয়োর্ন প্রব্রজ্যাধিকার ইতি সূচয়তি।" তবে কি ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যের সন্ন্যাসে অধিকার নেই? বর্তমানে যেসব অব্রাহ্মণ সন্ন্যাস নিচ্ছেন তাঁদের পথ কি শাস্ত্র বিরুদ্ধ? 'আশ্রমাদাশ্রমং' বলতে কি ব্রহ্মচর্যের পর সন্ন্যাসের ব্যবস্থা, না গার্হস্থ্য ও বানপ্রস্থের পর সন্ন্যাস? শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরণে পাই গার্হস্থ্যের পর সন্ন্যাস। শাস্ত্র কিন্তু গার্হস্থ্য ও বানপ্রস্থ আশ্রম পালন না করা হলে সন্ন্যাসের অধিকার দিচ্ছেন না।

ত্রিশূলে ত্রিগুণাতীত তত্ত্বও বুঝায়। ত্রিগুণকে জয় করেছেন তাই হাতে ত্রিশূল। ত্রিগুণ তাঁর করধৃত। আবার এতে সৃষ্টির তিন অধ্যায় 'অ-উ-ম' ও বুঝায়। সৃষ্টি স্থিতি লয়ের কর্তা সদাশিব। শিব শুধু লয়ের কর্তা। সদাশিব এবং শিবের মধ্যে এই পার্থক্য টুকু মনে রাখতে হবে।

(১৩) বামকরে ডম্বরু বা ডমরু। ডমরু বাদ্যযন্ত্র বিশেষ, যা থেকে উৎপন্ন ধ্বনিরূপ প্রণবমন্ত্র 'ওঁ' সর্বদা ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। হর সর্বদা প্রণবমন্ত্রদ্বারা হরির সঙ্গে যুক্ত আছেন। ডমরুর মত আর কোন একটি বাদ্যযন্ত্র নেই যার উভয় দিক আকৃতিতে প্রকৃতিতে কাজে ব্যবহারে শব্দে ধ্বনিতে সমান। এটি ভজন-দেহের প্রতীক, যার অন্তর বার সমান। যে দিকেই বাজাও একই আওয়াজ একই সুর। দুই সুর বাজে না। দুই কথা জানে না। সকল জীবের পেট দেহের মধ্যিখানে এবং অপেক্ষাকৃত পেটের অংশ মোটা। ডমরুর পেট নেই। ক্ষীণ মধ্য। পেট নেই মানে পার্থিব রস গ্রহণ করে না। শিব পার্থিব রসের রসিক নন। নিষ্কিঞ্চন শিবের হাতে অকিঞ্চন ডমরু। ববম্বম্ ববম্বম্ করে শিব গালবাদ্য বা ডমরুবাদ্য বাজিয়ে জীবকে আনন্দ দেন, সুখ দেন। জীবের মঙ্গল করেন। ববম্বম্ শব্দটি আসলে ওঁ কার ধ্বনি ও তার প্রতিধ্বনি। সদাশিব সদা প্রণব মন্ত্রোচ্চারণ করে সর্ব জীবের সর্ব অমঙ্গল নাশ করেন। শিব মঙ্গল নিধান।

(১৪) সর্ব অঙ্গে বিভূতি। সর্ব অঙ্গে ভস্ম। এ শ্মশানের ভস্ম নয়। এ হচ্ছে শিবের অষ্টবিধ ঐশ্বর্য-অণিমা লঘিমা ব্যাপ্তি প্রাকাম্য মহিমা ঈশিত্ব বশিত্ব কামাবসায়িত্ব। কেউ এর যে কোন একটি পেলেই তার শক্তির মাদনায় উন্মাদপ্রায় হয়ে ধরাকে

সরা জ্ঞান করতে থাকে। কিন্তু শিবশম্ভু আট-আটখানা সিদ্ধির মালিক হয়েও নির্বিকার নিরহংকার। ওগুলোকে তিনি শ্মশানের পরিত্যক্ত ছাইসদৃশ মনে করেন। তাই তাঁর সর্বঅঙ্গে বিভূতির ছাই। ঐশ্বর্যে ভস্মজ্ঞান না হলে পরমপদ লাভ হয় না।

শ্ম—অর্থে মুখ বা মড়া (শব), আর শান অর্থ স্থান। তাই শ্মশান শব্দের এক অর্থ শবস্থান বা শবদাহের স্থান, আর এক অর্থ—মুখমণ্ডল যেথায় বিদ্যমান, অর্থাৎ দেহ। শিব শ্মশানবাসী, অর্থাৎ জীবতত্ত্বের লয় হলে পর শিবতত্ত্ব; অথবা জীব দেহেই শিব অধিষ্ঠান।

(১৫) বাহন বৃষভরাজ বলীবর্দ। শিব বলদের পিঠে চড়ে বেড়ান। বলদ অর্থ যে বল দান করে। বীর্যই শরীরে বল দান করে। বলদ বা ষাঁড় অমিত বলের প্রতীক, বীর্য বা বীর্যবত্তার প্রতীক। বলদের পিঠে শিব, অর্থাৎ বীর্যবত্তার উপর শিবতত্ত্ব বা শিবত্ব অধিষ্ঠিত। পূর্ণ বীর্যবান না হলে তার শিবত্ব লাভ হবে না। আর শিব বা হর না হতে পারলে হরির সঙ্গে একাত্মা হওয়া যায় না। অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞান হবে না। এ কারণে শিবমন্দিরের সম্মুখে একটি বৃষভ মূর্তি থাকেন যাঁকে নন্দি নামে আগে পূজা করতে হয়, পরে শিবের পূজা। এর অর্থ—বীর্যবান হলেই তবে শিবপূজায় অধিকার বা শিবত্বে অধিকার। বৃষভরাজের নন্দি নামটিও একই তত্ত্ব প্রকাশক। নন্দয়তি ইতি নন্দি। আনন্দ দান করেন বলে নন্দি। বীর্যই জীবকে পরমানন্দ দান করে। বীর্যই নন্দি। গরুর পিঠে কেউ কখনো ওঠে না। তবু দেবাদিদেব মহাদেবের মত ব্রহ্মজ্ঞানীকে বলদ-বাহন দেখান হল কেবল বীর্যতত্ত্ব এবং শিবতত্ত্ব যে অভিন্ন তা প্রকাশের জন্য।

(১৬) স্বয়ম্ভূ। স্বভাবজাত। শিবের জন্মকথা কেউ জানে না। তাঁর পিতামাতার ঠিকানা অজ্ঞাত। ব্রহ্মা বিষ্ণুরও জন্ম-কথা আছে। কিন্তু শিবের তা নেই, যেমন ব্রহ্মের জন্ম-কথা নেই। শিবতত্ত্ব এবং ব্রহ্মতত্ত্ব অভিন্ন। ব্রহ্মতত্ত্বকে অনুভবগম্য করাবার জন্যই শিবতত্ত্বের অবতারণা। শিব অনাদি তত্ত্ব। শক্তিরোহিত শিব নিষ্ক্রিয় নির্গুণ অলিঙ্গ। শক্ত্যালিঙ্গিত শিব জগৎ-কারণ, সলিঙ্গ। অলিঙ্গ-শিব হতেই লিঙ্গ-শিবের উৎপত্তি।

এতেও শিবের সবকথা বলা হল না। তিনি অনাদি। তাঁর কথাও অনাদি, বলে শেষ হয় না। অনন্ত বিভূতির অধিকারী শিবের অনন্তরূপ। যত রূপ তত শিব। প্রতি রূপের তত্ত্ব অনুধাবন করলে একই সত্যে পৌঁছান যাবে। সে সত্য হল, বীর্যবত্তাই ভগবত্তা। বীর্যবানই ভগবান। ভগবান শব্দের অর্থ হল—ভগ-যুক্ত। ভগ এক অর্থে স্ত্রী যোনি। আর এক অর্থে ষড়বিধ ঐশ্বর্য—বীর্য, যশ, শ্রী, জ্ঞান ঐশ্বর্য ও বৈরাগ্য। এতে ভগবান শব্দের দুটি অর্থ পাই—যোনিযুক্ত এবং ষড়ৈশ্বর্যযুক্ত। কিন্তু যোনিযুক্ত কে! ষড়ৈশ্বর্যযুক্তই বা কে? তার কোন ইঙ্গিত ভগবান শব্দে পাওয়া যায় না। ভগবান শব্দটি একটি বিশেষণ পদ। কাকে উদ্দেশ করে এই বিশেষণ পদ? এখন আমাদের সেই বিশেষ বিশেষ্যটিকে খুঁজে বের করতে হবে। আমরা যত্রতত্র ভগবান শব্দটি লাগিয়ে দেই। সেটা কতটা ঠিক তাও জানা যাবে এখানে। ভগবান শব্দের দুটি অর্থই যদি একই পাত্রে পাওয়া যায় তবে তিনিই হবেন প্রকৃত বিশেষ্যপদ যাঁকে উদ্দেশ করে 'ভগবান' এই বিশেষণপদটি ব্যবহার করা হয়েছে।

যোনিযুক্ত এবং ষড়ৈশ্বর্যযুক্ত এ দুটি তত্ত্ব একই ক্ষেত্রে পেতে হলে আমাদের খুঁজতে হয় অর্ধনারীশ্বর তত্ত্ব। ভাগবতের ৪।৩।১৪শ শ্লোকে স্বয়ং দক্ষকন্যা সতী শিবকে উদ্দেশ করে **"ত্বয়াত্মনোঽর্দ্ধেঽহমদভ্রচক্ষুষা"** বাক্যে তাঁদের অর্ধনারীশ্বর-স্বরূপ প্রকাশ করেছেন। এই অর্ধনারীশ্বর তত্ত্বের ভাবমূর্তি হল শিবলিঙ্গ, যাঁর সঙ্গে দুটি শক্তি যুক্ত আছে। উপরে লিঙ্গাকৃতিরূপে ক্ষেত্রজ্ঞ শিব এবং নিম্নে গৌরীপট্ট (গৌরীজ্ঞাপক পট্ট) ক্ষেত্ররূপে আদ্যাশক্তি ভগবতীর ব্রহ্মযোনি-পীঠ। শিবলিঙ্গ থেকে আমরা যোনিযুক্ত শিবের তত্ত্ব পেলাম। কিন্তু তিনি যে ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ বা ষড়ৈশ্বর্যযুক্তও বটে তা জানা দরকার। শিবের ষড়ৈশ্বর্যতার প্রমাণ কোন শাক্ত বা শৈব ধর্মসূত্র হতে পরিবেশন করলে সঙ্গত কারণেই বৈষ্ণবদের আপত্তি থাকতে পারে। বলতে পারেন—শৈবপন্থীরা তো শিবকে ভগবান বলবেনই। তাই সেপথে না গিয়ে বৈষ্ণব ধর্মের মূল গ্রন্থ শ্রীমদ্‌ভাগবতেরই আশ্রয় নেওয়া যাক্। ভাগবতের কাছ থেকে শিবের ষড়ৈশ্বর্যতার সংবাদ পেতে হলে ৮।৭।২১-৩৫শ শ্লোক সমূহ কৃপাপূর্বক আস্বাদন করুন। স্থানাভাবে উহাদের উদ্ধৃতি সম্ভব হচ্ছে না। শুধু ৮।৭।২৩ শ শ্লোকটির বঙ্গার্থ দিচ্ছি পাঠক-বর্গের কৌতূহল বৃদ্ধি করণার্থ।

(সমুদ্র মন্থনে হলাহল বিষ উৎপন্ন হলে যখন জগৎ ধ্বংস হবার উপক্রম তখন প্রজাপতিগণ শিবের স্তব করছেন যাতে শিব তুষ্ট হয়ে জগৎ রক্ষার জন্য একটা কিছু করেন) "হে বিভো! যখন গুণময়ী স্বকীয় মায়াশক্তি দ্বারা এই জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় ধারণ করেন, হে ভূমন্! তখন স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানময় আপনিই ব্রহ্মা বিষ্ণু ও শিব এই তিন নাম ধারণ করে থাকেন।" ভাগবতের ৪।৬।৪২-৪৩ শ শ্লোক আস্বাদনে অর্ধনারীশ্বর তত্ত্ব আরো পরিষ্কার হবে। তাদেরও বঙ্গার্থ দেওয়া হল।

(দক্ষযজ্ঞে সতী দেহত্যাগ করলে শিবকে প্রশমিত করতে

দেবতা ও ঋষিগণসহ ব্রহ্মা শিবের মহিমা কীর্তন করছেন) ব্রহ্মা বললেন—আপনিই বিশ্বের অধিপতি, যেহেতু জগতের যোনি যে শক্তি অর্থাৎ প্রকৃতি এবং জগতের বীজ যে শিব অর্থাৎ পুরুষ, এই উভয়েরই আপনি নিয়ন্তা এবং নির্বিকার যে ব্রহ্ম তাও আপনিই, ইহা আমি জানি ॥ ৪২ ॥

হে ভগবন! আপনিই মাকড়ের ন্যায় অবিভক্ত শিব এবং শক্তিকে (পুরুষ এবং প্রকৃতিকে) নিমিত্ত করে স্বীয় কর্ত্তৃত্ব প্রকটন-পূর্বক এই বিশ্বের সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয় সাধন করে থাকেন ॥ ৪৩ ॥

উল্লিখিত শাস্ত্রপ্রমাণাদি থেকে নির্ণীত হল—একমাত্র অর্ধ-নারীশ্বর (যাঁর অর্ধ অঙ্গ নারী বা গৌরী এবং অর্ধ অঙ্গ ঈশ্বর বা শংকর) রূপ-বিগ্রহেই যোনিযুক্ত এবং ষড়ৈশ্বর্যযুক্ত দুটি তত্ত্বই পূর্ণরূপে পাওয়া যায়। সুতরাং অর্ধনারীশ্বর বা পুরুষ-প্রকৃতির যোগযুক্ত বিগ্রই কেবল ভগবান পদবাচ্য। 'ভগবান' বিশেষণে অন্য আর কাউকেই বিভূষিত করা যাবে না। অর্ধনারীশ্বর তত্ত্বের মূর্ত বিগ্রহ হচ্ছেন শিবলিঙ্গ। ইনি হচ্ছেন সৃষ্টির আদি কারণ। ব্রহ্মবীজ। সৃষ্টির আদি রস। শৃঙ্গার রসের প্রতীক। নির্গুণ ব্রহ্ম সগুণাকারে শক্তিযুক্ত হয়ে প্রথম যখন সৃষ্টি আরম্ভ করেন সেই সৃষ্টিক্রিয়ার প্রতীক এই শিবলিঙ্গ। সর্বদুঃখহর হর হর-জায়ার শৃঙ্গার রূপটিই হচ্ছে আদি শৃঙ্গার রসের উৎস। লীলারসের আদি উৎস। মধুর রসের স্থূল বিগ্রহ। শৈবতত্ত্বের আদি শিব বা সদাশিবের প্রতিকৃতি হচ্ছেন এই শিবলিঙ্গ। এঁতে সৃষ্টি স্থিতি লয় এই তিন মূলতত্ত্বেরই ব্যঞ্জনা বিদ্যমান। শিবলিঙ্গ সাধনতত্ত্বের গুহ্যরহস্য নির্দেশক। কামগায়ত্রী-কামবীজের প্রতীক। এক কথায় সর্ব কারণের কারণ। অনাদি কারণ। এই অনাদি কারণকেই আমরা পূজা করি ধ্যান করি শিবলিঙ্গ রূপে। শিবতত্ত্ব ছাড়া সাধনতত্ত্ব নেই। তিনি সর্ব সাধনতত্ত্বের গুরু। জগৎগুরু। তাইতো ধর্ম-সম্প্রদায় মত-পথ নির্বিশেষে শিবের উপাসনা চলে

বিশ্বজুড়ে কোন না কোন আচারে। কেউ তিথিক্ষণ দেখে কেউ যাগ-যোগেতে জল ঢালে শিবলিঙ্গে সর্ব কামনার জ্বালা জুড়াতে। আবার কেউ ভোলানাথকে ভজতে নিজেই ভোলানাথ সাজে সবসিদ্ধি লাভের আশায়। কোন্ দিন থেকে শিবপূজা আরম্ভ হয়েছে কেউ জানে না। কোন্ দিন শিবস্থান কাশীপীঠ প্রতিষ্ঠা হয়েছে কেউ বলতে পারে না। কোন্ তত্ত্বটি কোন্ তথ্যটি হরপার্বতী-সংবাদ থেকে আসেনি তা খুজে পাওয়া যায় না। যে দিকেই তাকান যায় শুধু অনাদি দিগন্ত। এমন অনাদি অনন্ত তত্ত্ব কেই বা জানেন, আর কেইবা বলতে পারেন! যত জীব তত শিব। যত নর তত হর। যত জীউ তত শিউ।

যদিও যজ্ঞের অধিপতি যজ্ঞেশ্বর নারায়ণ, তথাপি শিব যজ্ঞে উপস্থিত না থাকলে যজ্ঞেশ্বর সে যজ্ঞ গ্রহণ করতে আগমন করেন না (ভাগবত ৪।৭।১০)। নারায়ণ যজ্ঞাধিপতি, যজ্ঞ গ্রহণ করেন মাত্র। কিন্তু যজ্ঞের শুভাশুভ ফলদাতা একমাত্র ভগবান শিবশংকর (ভাগবত ৪।৬।৫০)। এ কারণেই শিব ছাড়া যজ্ঞক্রিয়া অচল। আমরা কথায় বলি—শিবহীন যজ্ঞ অর্থাৎ ফলহীন কর্ম। গীতার ৪।২৫শ এবং ৪।২৮শ শ্লোক অনুযায়ী যজ্ঞের ব্যাপক অর্থ ধরলে আমরা যত প্রকার পূজানুষ্ঠানাদি করি সবই যজ্ঞপর্যায় পড়ে। এসব ক্রিয়াদিতে শুভফল পেতে হলেও শিবের কৃপা অত্যাবশ্যক। সুতরাং যে কোন মঙ্গলানুষ্ঠানে মঙ্গলময় শিবকে চাই-ই চাই। যাবতীয় মঙ্গলের অধিপতি হচ্ছেন শিব।

শিব যজ্ঞাধিপতি না হোন, তিনি যোগীশ্বর তো বটে। তিনি যোগের অধিপতি। যোগের আদি গুরু। জীবাত্মা পরমাত্মার মিলনে যে যোগ তারই মহড়া শুরু হয় পুরুষ-প্রকৃতির মিলনরূপ যোগ দিয়ে। শ্রীকৃষ্ণ পরম পুরুষ। প্রধান পুরুষ। একমাত্র পুরুষ। আর আমরা সকলেই প্রকৃতি। প্রকৃতির দেহ হচ্ছে

জন্ম নিয়েছি তাই আমরা সবাই প্রকৃতি। পরম পুরুষের সঙ্গে মহামিলনের জন্য, যুক্ত হবার জন্য আমরা সবাই আরাধনা করছি। তাই আমরা সবাই রাধা। যে আরাধনা করে সে-ই রাধা। এ কারণে ভাগবতে রাধা বলে নির্দিষ্ট কাউকে বলা হয় নি। এ ভজনে সবাই রাধা, সবাই গোপী। কৃষ্ণ-ভজনতত্ত্ব অতীব নিগূঢ়। নিগূঢ় বলেই গুপ্ত-গোপনীয়। এই গোপনীয় তত্ত্বপথে যারা পা বাড়ায় তারাই গোপী। শিবলিঙ্গ এই যোগের প্রতীক। তাই শিব যোগীরাজ বা যোগেশ্বর। শিব সর্বদা 'রাম' নাম জপ করছেন। 'রাম' তাঁর গুরু। এখানে 'রা' অর্থ রাধা এবং 'ম' অর্থ মদন-মোহন। অর্থাৎ রাধা-মদনমোহনের মিলিত রাস-রূপই শিবের ইষ্ট, ধ্যানের বস্তু ও জপের বস্তু। **"রাধয়া রময়ে নিত্যং রাম ইতি পরিকীর্তিত"**—যিনি রাধার সহিত সর্বদা রমণ-বিহার করেন তিনিই রাম। পদ্ম পুরাণে শ্রীরামচন্দ্রের শতনাম স্তোত্রের ৮ম শ্লোকে—

রমন্তে যোগিনোঽনন্তে সত্যানন্দে চিদাত্মনি।
ইতি রামপদেনাসৌ পরং ব্রহ্মাভিধীয়তে॥

অর্থ—সত্য আনন্দ ও চিৎ স্বরূপ অনন্ত আত্মায় যোগীগণ রমণ করেন। এই হেতু তাঁরা পরমব্রহ্মকে রাম নামে অভিহিত করেন।

রমণ অর্থ তুষ্ট করা, প্রীতি উৎপাদন করা, আনন্দ অনুভব করান ইত্যাদি। সুতরাং রাধাকৃষ্ণের রতিবিহার বা জীবাত্মা পরমাত্মার মিলনজনিত আনন্দানুভবই 'রাম'। অতএব শিব-তত্ত্ব শক্তিতত্ত্ব এবং প্রেমতত্ত্বের মিলিত তত্ত্ব। পূর্ণতম সাধনতত্ত্ব। শিব হলেন বৈষ্ণবের প্রতীক, বৈষ্ণবতার প্রতীক। শিবের আচরণ-ই শাস্ত্রানুমোদিত বৈষ্ণব আচরণ। বৈষ্ণব সমাজের আদর্শ ভগবান শংকর। তাই বৈষ্ণব-পরিচিতি অর্জনের পূর্বে অবশ্যই শিবতত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত হতে হবে। শিবতত্ত্ব এড়িয়ে বৈষ্ণবতত্ত্বের ভাবনা শাস্ত্র-বিরুদ্ধ।

শিবতত্ত্ব বা শিবস্বরূপ হৃদে পরিস্ফুট হলে তবেই শিবহৃদে একপদ রেখে দাড়ান শ্যামা মায়ের সেই চিরপরিচিত ভঙ্গীটির ব্যঞ্জনা হৃদয়ঙ্গম করা যাবে। শিব এবং শক্তির ঐ ভঙ্গীটিও একটি সাধনমুদ্রা, যা সাধনার স্তরভেদে বহুবিধ অর্থ প্রকাশক। যেমন—

(ক) সর্বদা হৃদয়ে শক্তির ধ্যান করতে হয়। শক্তিআরাধনাই সর্বাগ্রে করণীয়।

(খ) শক্তিহীন সাধক শবতুল্য। শক্তিই সাধনার প্রাণ।

(গ) শক্তির আনুগত্যে সাধনা। ত্রিগুণের উপরে শ্যামা মা।

(ঘ) বিশ্বপ্রসবিনীর এই "বিপরীত রতাতুরাং" মুদ্রাটি যেমন শক্তিসাধনার একটি গুহ্যতম তত্ত্বের ব্যঞ্জনা, তেমনি সংসারপথ থেকে সাধনপথের বিপরীত মুখী গতিপ্রকৃতিরও প্রকাশক।

শিবতত্ত্ব থেকেই সর্বপ্রকার সাধনতত্ত্ব এসেছে। হরপার্বতী-সংবাদ থেকেই সমস্ত তত্ত্ববিধির সৃষ্টি। বৈষ্ণব তত্ত্বের জন্মও শিবতত্ত্ব থেকে। সুতরাং শৈব সাধনা এবং বৈষ্ণব সাধনার মধ্যে তর্কের কোনই অবকাশ নেই। বৈষ্ণব শব্দের মূল অর্থ বিষ্ণুসম্বন্ধীয় (বিষ্ণু + অণ্ সম্বন্ধাত্থর্থে)। বিষ্ণুর সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপনপূর্বক তাঁর সাধনা। তাই এর নাম বৈষ্ণব সাধনা। ইতিপূর্বেই আমরা দেখেছি বিষ্ণু বা হরির সঙ্গে শিবের সম্বন্ধই নিকটতম, ঘনিষ্টতম। একারণেই সর্বশাস্ত্র শিবকে পরম বৈষ্ণব বা বৈষ্ণব-প্রধান বলেছেন। গীতার ১০।২৩শ শ্লোকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—**রুদ্রাণাং শঙ্করশ্চাস্মি**-রুদ্রদিগের মধ্যে আমি শংকর। শ্রীশ্রীচণ্ডীর ১১।৫শ মন্ত্রে শিবানীকে '**ত্বং বৈষ্ণবীশক্তিরনন্ত বীর্যা**' বলা হয়েছে। গীতা, ভাগবত, চণ্ডী প্রভৃতি স্পষ্টাক্ষরে শিব-শিবানীকে পরম বৈষ্ণব-বৈষ্ণবী বলে ঘোষণা করার পরেও যদি কোন মহলে শক্তি-

শৈব-বৈষ্ণবের দ্বন্দ্ব থেকে থাকে তা হলে বলতেই হয় তাঁরা শাস্ত্রনীতি না মেনে তর্কের আশ্রয় নিয়ে কেবল তর্কের জন্য তর্ক করছেন।

শিবতত্ত্ব বিশ্বের আদি ধর্মতত্ত্ব। জগতের তাবৎ ধর্মমতই শিব-তত্ত্বের নিকট ঋণী। বর্তমান বিশ্বের প্রধান তিনটি ধর্মমতের মধ্যে বৈদিক মতের কথা যেমন, খ্রীষ্টধর্ম এবং মুসলমানধর্মের প্রতি তাকালেও তা প্রমাণিত হয়। শিব শুধু হিন্দুর দেবতা নন। তিনি সমস্ত ধর্মের দেবতা। তিনি বিশ্বদেবতা। অনাদিকাল থেকেই বিশ্বদেবতা বিশ্বের সর্বত্রই পূজিত হয়ে আসছেন। তার যৎকিঞ্চিৎ উদাহরণ দেওয়া হল।

(১) জাপানে কোন কোন বৌদ্ধ সাধু মনকে কেন্দ্রীভূত করতে শিবলিঙ্গাকার প্রস্তর তিনফুট দূরে তিনফুট উচুতে স্থাপন করে ধ্যান করেন।

(২) প্রাচীন গ্রীক এবং রোমান জাতির মধ্যে লিঙ্গোপাসনা প্রচলিত ছিল। রোমকদের "প্রিয়াপস" (PRIAPUS) এবং গ্রীকদের "ফালাস" (PHALLUS) নামে লিঙ্গমূর্তি ছিল। আজও রোমের ইসাই ধর্মের রোমান ক্যাথলিকরা ডিম্বাকার প্রস্তরের পূজা করে থাকেন।

(৩) ইসরাইলরাও আগে লিঙ্গপূজা করতেন। মক্কায় মক্কেশ্বর নামে লিঙ্গমূর্তিকেই ইসরাইলরা পূজা করতেন। ইসরাইল তথা ভিন্ন দেশবাসী ইহুদীগণ এখনও শপথ গ্রহণকালে লিঙ্গাকৃতি প্রস্তরকে স্পর্শ করে থাকেন।

(৪) বাইবেলে (Old Testament, I King XV 13) পাওয়াযায় বোহোবোয়েমের পুত্র 'আশা' তার মা 'মায়াকাকে' লিঙ্গের বলিদিতে নিষেধ করে ছিলেন।

(৫) ইহুদীরা এবং মিশরীরাও লিঙ্গদেবতা "বেলফেগোর"কে পূজা করতেন।

(৬) মোয়াবীর এবং মদিনাবাসীরা ফেগোর পাহাড়েস্থিত লিঙ্গের উপাসনা করতেন।

(৭) জুদাবাসীরা (JUDAH) বাল (BAAL) নামক প্রস্তর লিঙ্গের পূজা করতেন। প্রতি অমাবস্যায় লিঙ্গমূর্তির সামনে একটি বৃষকে পূজোপহার দিতেন।

(৮) যীশুখ্রীষ্টের ১৩ বৎসর বয়স থেকে প্রায় ২৯ বৎসর বয়স পর্যন্ত—এই ১৬ বৎসরের জীবন-ইতিহাস বাইবেলে অনুপস্থিত। একথা এখন প্রায় সর্বজনস্বীকৃত যে ঐ সময়ে তিনি ভারতে অধ্যাত্মবিদ্যার জন্য এসে এখানের নাথ-যোগী সম্প্রদায়ের কাছ থেকে দীক্ষা শিক্ষা গ্রহণ করেন। নাথ-যোগীরা লিঙ্গোপাসক। আমাদের 'ওঁ' প্রণবমন্ত্রের প্রতিধ্বনি (অ-উ-ম) খ্রীষ্টধর্মের GOD শব্দে পাওয়া যায়। G–generation (সৃষ্টি), O operation (স্থিতি) এবং D—destruction (লয়)।

(৯) মক্কাশরিফের তীর্থযাত্রীদের নতজানু হয়ে 'সংগ-এ-অসবদ্' বা মক্কেশ্বর নামে এক বিশেষ কৃষ্ণবর্ণ শিলাকে চুম্বন করতে হয়। তান্ত্রিকগণ ইহাকে শিবের প্রতিকৃতি বলেই জানেন। মুসলমানধর্মের ভিত্তি খ্রীষ্টধর্ম।

এ ছাড়া মিশরের ফোনেশিয়া নগরে, ইরানের সহর সিরিয়া এবং য়ুনানে, স্পেনে, জার্মানী এবং স্কান্দনেভিয়াতে, মেক্সিকোর পেরু-হায়তী দ্বীপে, সুমাত্রা ও জাভা দ্বীপে—প্রভৃতি পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে শিবের ঐরূপ পার্থিব স্মৃতি-স্মারক দেখতে পাওয়া যায়।

শিব যে বিশ্বনাথ, বিশ্বপিতা এবং শিবতত্ত্ব যে বিশ্বতত্ত্ব এতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। এই সদাশিব একাধারে নির্গুণ নিরাকার (অলিঙ্গ), আবার ইনিই শক্তিযুক্ত হলে সগুণ-সাকার (লিঙ্গ)। লিঙ্গের অর্থ হচ্ছে মূর্তি, আকৃতি।

গুরুকুলে বাস সম্পর্কে শ্রীমদ্‌ভাগবতের নির্দেশ—

দ্বিতীয়ং প্রাপ্যানুপূর্ব্ব্যাজ্জন্মোপনয়নং দ্বিজঃ।
বসন্ গুরুকুলে দান্তো ব্রহ্মাধীয়ীত চাহুতঃ॥

—১১।১৭।২২

অর্থ—দ্বিজাতি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য আনুপূর্বিক গর্ভাধানাদি সংস্কারক্রমে উপনযনরূপ দ্বিতীয় জন্মলাভ করে আচার্যের আহ্বানে জিতেন্দ্রিয় হয়ে গুরুকুলে বাসপূর্বক বেদ অধ্যয়ন করবে।

ব্রহ্মজ্ঞান লাভের জন্যই ব্রহ্মচর্যাশ্রমে বেদ অধ্যয়ন করা। আমরা অতি শৈশব হতেই জাগতিক জ্ঞানাদি অর্জনের জন্য পাঠশালায় লেখাপড়া আরম্ভ করি। একটু বেশী বয়সে লেখাপডা শুরু করতে গেলে যে পাঠশালায় মন বসে না, গ্রাম্যবুদ্ধি মনে বসে গিয়ে মন শক্ত হলে যে পড়াশুনা মনে দাগ কাটে না তা আমাদের সকলেরই জানা। ব্রহ্মজ্ঞান লাভের জন্যও তেমনি কৈশোর থেকেই বেদ অধ্যয়নের ব্যবস্থা। নিষ্কলুষ মন না হলে নিষ্ঠা আসে না। নিষ্ঠাহীনের সিদ্ধি লাভ হয় না।

বেদ নিরাকার ব্রহ্মের বাণীরূপ সাকার ব্রহ্ম। বেদ শব্দব্রহ্মের মূর্ত বিগ্রহ। **"বেদয়তি ধর্মং ব্রহ্ম চ বেদঃ"** যিনি (যে শাস্ত্র) ধর্ম ও ব্রহ্মতত্ত্ব জানিয়ে থাকেন তিনিই বেদ। বেদ অখিল জ্ঞানের আকর। শুধু ধর্ম ও ব্রহ্মতত্ত্ব নয়, পার্থিব অপার্থিব পরা অপরা সবরকম জ্ঞানের খনি বেদ। বিদ্ ধাতু হতে বেদ শব্দ নিষ্পন্ন হয়েছে। বিদ্ অর্থ জানা। যিনি জানিয়ে দেন তিনি বেদ। বেদ অজানা-কে জানিয়ে দেয়। বেদ চারটি—ঋক্ সাম যজু ও অথর্ব। বেদ অপৌরুষেয়। অর্থাৎ ইঁহা কোন ব্যক্তি বা লৌকিকচিন্তা দ্বারা রচিত নয় (ভাগবত ১১।৩।৪৩)। বহুকাল ধরে বিভিন্ন ব্রহ্মবিদ্ সত্যদ্রষ্টা ঋষিগণ ধ্যানযোগে ব্রহ্মের সঙ্গে ঐকাত্ম্য হয়ে প্রজ্ঞানেত্রে যে সত্যকে দর্শন করেছেন, যে ব্রহ্মবাণী শ্রুত হয়েছেন সেই সব সংগৃহীত সংকলিত হয়ে বেদ বিরাট বপু নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছেন।

এভাবে সংগৃহীত এবং সংকলিত হবার জন্য বেদকে সংহিতাও বলা হয়। আবার ব্রহ্ম হতে বেদমন্ত্র শ্রুত বলে এঁকে শ্রুতিও বলা হয়। শ্রুতি বলার আরো একটি কারণ আছে—সেকালে গুরুমুখে শ্রবণ করে বিদ্যার্থীরা বেদ অবগত হত। এবং শুনে শুনে বেদের এক-এক শাখা মুখস্থ করে নিজেরাই এক চলমান বেদ হয়ে যেত। বেদী, দ্বিবেদী, ত্রিবেদী, চতুর্বেদী প্রভৃতি উপাধি থেকে এটা সহজেই বুঝা যায়। বেদের অপর নাম ছন্দঃ। ছন্দোবদ্ধ মন্ত্রের জন্যও বটে, আবার "মন্ত্র ছন্দঃ"—মন্ত্রার্থ রহস্যাবৃত, এ কারণেও বটে। শুধু এক-একটি বেদমন্ত্রেরই বহুবিধ অর্থ বা তাৎপর্য নয়, বেদের এক-একটি শব্দেরও বহুবিধ অর্থ। বেদ কি বলতে চাইছেন তা আজো কারো পুরাপুরি জানা হয় নাই। বেদের ভাব ব্যঞ্জনা আজো রহস্যাবৃত। বলতে পারেন—বেদ ভাব-বারিধি। ছন্দ শব্দের অন্য অর্থও আছে, যেমন—আচ্ছাদন বা আবরণ করা, অথবা আনন্দ দেওয়া। বেদমন্ত্র দ্বারা আপনাকে আচ্ছাদন করে সর্ব অমঙ্গল হতে আত্মরক্ষা করা—এই ভাব ; অথবা বেদমন্ত্র দ্বারা, বেদমন্ত্রের কৃপায় ব্রহ্মানন্দ লাভ করা। আনন্দের সঙ্গে ছন্দের একটা আত্মিক যোগ আছে। যেখানেই ছন্দ সেখানেই আনন্দ। আবার যেখানে আনন্দ সেখানেই ছন্দ। ব্রহ্মানন্দের ছন্দ হল বেদ বা বেদমন্ত্র। এই ছন্দের তালে তালে ব্রহ্মানন্দে উত্তরণ।

স্বয়ং বেদান্ত বেদের পরিচয় দিচ্ছেন এই বাক্যে—"**ধর্মব্রহ্মপ্রতিপাদকমপৌরুষেয়বাক্যং**"। গীতায় ভগবান বলেছেন-**গায়ত্রী ছন্দসামহম্** (১০।৩৫)—ছন্দোবদ্ধ মন্ত্রসমূহের (বেদের) মধ্যে আমি গায়ত্রী॥ ব্রহ্ম-গায়ত্রী ঋগ্‌বেদের ৩য় মণ্ডলের ৬২ সূক্তের ১০ম মন্ত্র। ভাগবতে বেদকে বলা হয়েছে 'নিগম'—সমগ্র জ্ঞান নির্গত হয়েছে যে আকর থেকে। মহাভারতের আদিপর্বে প্রথম অধ্যায়ের ২৭০শ শ্লোকে

"কার্ৎস্নং বেদমিমং বিদ্বান্" প্রভৃতি বাক্যে মহাভারতকেও বেদের মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। একই কথা স্বর্গারোহণ পর্বে পঞ্চম অধ্যায়ের ৬৬শ শ্লোকেও পাওয়া যায়।

চারটি বেদ নিয়ে হল শরীর এবং ছয়টি বেদাঙ্গ হল তার অঙ্গ। এই ছয়টি বেদাঙ্গ হল—শিক্ষা, ব্যাকরণ, ছন্দ, নিরুক্ত, জ্যোতি এবং কল্প। এক-একটি বেদ আবার চার অংশে বিভক্ত—সংহিতা (যে অংশে সূক্তগুলি আছে, সূক্ত হচ্ছে অনেকগুলি মন্ত্রের সমষ্টি), ব্রাহ্মণ (যেখানে যজ্ঞের বিধি বলা হয়েছে), আরণ্যক (এঁতে কর্ম অর্থাৎ যজ্ঞ এবং জ্ঞান উভয় বিষয়ই আলোচিত হয়েছে) এবং উপনিষদ (এঁতে ব্রহ্মতত্ত্ব বিষয়ক আলোচনা আছে, এঁকে বেদের জ্ঞানকাণ্ড বলা হয়)। মন্ত্র ব্রাহ্মণ আরণ্যক এবং উপনিষদ এই সমগ্র সাহিত্যকে প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে -কর্মকাণ্ড (মন্ত্র অংশ ও ব্রাহ্মণ অংশ) এবং জ্ঞানকাণ্ড (উপনিষদ)। আরণ্যকের স্থান এঁদের মধ্যবর্তী, কারণ এঁতে যজ্ঞ এবং জ্ঞানের কথা দুই-ই আছে। অথর্ব বেদের কোন আরণ্যক পাওয়া যায় না। উপনিষদে ব্রহ্মবিদ্যা লাভের গুহ্যতম তত্ত্ব বর্ণিত থাকায় ইঁহা বেদশাস্ত্রের মুকুটমণি। যে বিদ্যার অনুশীলন দ্বারা ব্রহ্মসামীপ্য লাভ হয় তাই উপনিষৎ (উপ-নি পূর্বক সদ্ ধাতু কিপ্ প্রত্যয় যোগে উপনিষৎ শব্দ নিষ্পন্ন; উপ=সামীপ্য, নি=নিয়ে যায়, নীত হয়)। উপনিষদ অনন্তবিদ্যাকে দুভাগে ভাগ করেছেন—পরা ও অপরা বিদ্যা। এই জ্ঞানতত্ত্বানুসারে বেদকে ভাগ করলে অপরা (প্রাকৃত) বিদ্যার ভাগে পড়ে চারটি বেদ সহ ছয়টি বেদাঙ্গ এবং পরা (অপ্রাকৃত) বিদ্যার ভাগে পড়ে কেবল ব্রহ্মজ্ঞানদায়ী উপনিষৎ। বেদশাস্ত্রের অন্তভাগে (শেষভাগে) সংগ্রথিত বলে উপনিষদশাস্ত্র 'বেদান্তবিজ্ঞান'

সংজ্ঞায় অভিহিত হয়। বিজ্ঞান অর্থ বিশেষ জ্ঞান বা প্রত্যক্ষানুভূতি-লব্ধ জ্ঞান, অপরোক্ষ জ্ঞান।

চার বেদ ব্রহ্মের চারটি রূপকে পল্লবিত পুষ্পিত করেছেন নানা ছন্দে নানা বন্দে। অতি সংক্ষেপে তা হল—

ক) ঋগ্‌বেদের মহাবাক্য—**প্রজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম।**

খ) সামবেদের মহাবাক্য—**তত্ত্বমসি।**

গ) যজুবেদের মহাবাক্য—**অহং ব্রহ্মাস্মি।**

ঘ) অথর্ববেদের মহাবাক্য—**অয়মাত্মা ব্রহ্ম।**

ব্রহ্ম ও আত্মা অভিন্ন বোধ হলেই বহ্মজ্ঞান হয়। এই চারটি মহাবাক্য হচ্ছে ব্রহ্মজ্ঞান বৃক্ষের চারটি কল্প। যে পথেই অগ্রসর হও গন্তব্যস্থল অভিন্ন।

উপনিষদীয় বেদান্ত বিজ্ঞানের জন্যই বহির্বিশ্বে ভারতের শ্রেষ্ঠত্ব। জগতের আর কোন ধর্মচিন্তা এইরূপ বিজ্ঞান উপহার দিতে পারে নি। শুধু হিন্দু বা আর্য ধর্মের জন্যই নয়, এই বেদান্তবিজ্ঞান তাবৎ বিশ্বের তত্ত্বানুসন্ধানীদের জন্য অদ্বিতীয় জ্ঞানবর্তিকা। ভারতীয় ভাবনার বৈশিষ্ট্য হল--আর্যঋষিরা কোন দিন কোন ব্যক্তি বা ব্যষ্টি নিয়ে ভাবেন নি। তাঁদের সম্যক্ জ্ঞান ব্যয়িত হয়েছে সমষ্টি ভাবনায়। ভূমাকে অনুভব করে বিশ্বভুবনের ভাবনাই ভেবেছেন। এ কথা সুনিশ্চিতভাবে বলা চলে—বিশ্বের যে কোন মতাবলম্বীর ঈশ্বরানুভব করতে হলে বেদান্ত বিজ্ঞানের আশ্রয় নিতেই হবে। যে চিরন্তন সত্য বেদান্ত প্রকাশ করেছেন তা দেশ কাল পাত্র ভেদে কোথাও প্রতিহত হবার নয়। ইহা সর্ব দেশের সর্বকালের জন্য একমাত্র পূর্ণতম সত্য। সত্য তার আপন শক্তিতেই কালজয়ের পতাকা বহন করবে। ঈশ্বরকে অনুভব-উপলব্ধি করা যেমন এই মুহূর্তে সকলের পক্ষে সম্ভব নয়, ঈশ্বর-স্বরূপ সত্যকে উপলব্ধি করাও চট্‌করে সম্ভব নয়। আজ হোক কাল হোক প্রত্যেককেই একদিন সত্যকে উপলব্ধি করতেই হবে। বর্তমান বিশ্বে বেদচর্চার

যে ঝোঁক দেখা যায় তা উপনিষদ-প্রকাশিত সত্যের আকর্ষণেই। যে চিরসত্য বিশ্বের অনন্ত জীবকে সততই আকর্ষণ করছে সেই সত্যের স্বরূপ ব্যক্ত করেছেন একমাত্র বেদান্ত-বিজ্ঞান।

কেউ হয়ত ভাবতে পারেন যে বৈদিক সাহিত্যে শুধুই ব্রহ্ম-জ্ঞান বা আধ্যাত্মিক জ্ঞানচর্চার কথা আছে! এ ধারণা সম্পূর্ণ অমূলক। ব্রহ্ম শব্দের একটি অর্থ হল বৃহত্তম বা ভূমা বা পূর্ণতম। তাই ব্রহ্মজ্ঞানে কি আধ্যাত্মিক কি জাগতিক কোন প্রকার জ্ঞানের কণামাত্রও অভাব নেই। সেথায় সাংসারিক জ্ঞানের এতটুকু অভাব ঘটলেও তাকে পূর্ণতম জ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞান বলা যাবে না। শ্রীকৃষ্ণকে পূর্ণতম ব্রহ্ম বলার কারণটিও তাই। কৃষ্ণের ভিতর সত্ত্ব-রজঃ-তমঃ ভাল-মন্দ সর্বগুণ পূর্ণমাত্রায় বিরাজমান। তাই তিনি পুরুষোত্তম। বেদে সর্ববিধ জ্ঞান আছে বলেই বেদ নিজেই ব্রহ্ম বা ব্রহ্মজ্ঞান। সেই সুপ্রাচীন বৈদিক যুগের সবরকম জ্ঞান-চর্চার পূর্ণ ইতিবৃত্ত যে অক্ষত অপরিবর্তিত অবস্থায়ই একালে আমরা পাচ্ছি, কালগ্রাসে যে তার কিছুই নষ্ট হয় নি—এমন কথা কেউই বলতে পারেন না। তথাপি বেদ-উপনিষদ সম্পদের যতটুকু এখন আমরা দেখছি অন্ততঃ সেটুকুতে প্রবেশ করতে পারলেও দেখাযাবে—বেদ-উপনিষদাদিতে শুধু অধ্যাত্মবিদ্যার কথাই নয়, ঐহিক সুখসম্পদের সর্বপ্রকার ব্যবস্থা-পত্রেরও নানা ভাবে উল্লেখ আছে। আমরা এই জ্ঞানভাণ্ডারের কোন খবর রাখি না তাই আধুনিক জ্ঞানকেই বড় এবং উপযুক্ত বলে মনেকরি। বৈদিক চিন্তা-ভাবনার সঙ্গে একটু পরিচিত হলেই আধুনিক জ্ঞানকে প্রাচীনের তুলনায় অতি ক্ষুদ্র বলে মনে হবে। প্রাচীন নালন্দা শিক্ষায়তনের ধ্বংসাবশেষ দেখে যেমন তৎকালের সুবৃহৎ অট্টা-লিকাদির আন্দাজ পাওয়া যায়, তেমনি আমাদের বেদ-উপনি-ষদের ভিত দেখেও বৈদিকযুগের জ্ঞানভাণ্ডারের অতি বৃহদাকারের অনেকটা অনুমান করা যায়। তা ছাড়া দিনে দিনে আমাদের

মন-চিন্তা-বিবেক এতই সঙ্কীর্ণতা প্রাপ্ত হচ্ছে যে বৃহৎ কিছুর কল্পনা করাও আজ আমাদের পক্ষে দুঃসাধ্য। আমাদের এই নিম্নমুখী দৃষ্টিকে ঊর্ধ্বমুখী করাতে না পারলে কোন প্রকার মঙ্গলের আশা নেই। দৃষ্টির এই দিক্‌পরিবর্তনই সাধনা।

প্রাচীন শিক্ষাব্যবস্থায় ঋষি-পুত্র ঋষি হতেন, জ্ঞানীর পুত্র জ্ঞানী হতেন। ফলে ধর্ম ও সংস্কৃতির শুচিপ্রবাহ অব্যাহত গতিতে চলত। তখন সত্যই ছিল একমাত্র গ্রহণীয় আচরণীয় বিচার্য ও সাধ্য বস্তু। কারণ, সত্যের উপলব্ধি ছাড়া 'সৎ' এর অনুভূতি কখনই সম্ভব নয়। সত্যদ্রষ্টা ঋষির কণ্ঠে একদা ধ্বনিত হল—

সত্যমেব জয়তে নানৃতং, সত্যেন পন্থা বিততো দেবযানঃ।
যেন আক্রমন্তি ঋষয়ো হি আপ্ত কামাঃ,
যত্র তৎ সত্যস্য পরমংনিধানম্ ॥

মুণ্ডক উপনিষদ ৩।১।৬

অর্থ—সত্যেরই জয় হয়। অসত্যের জয় হয় না। দেবযান নামক পথটি সত্যনিষ্ঠাতেই অবিচ্ছিন্নভাবে বিস্তৃত আছে। যেখানে সত্য-দ্বারা লভ্য সর্বোত্তম পুরুষার্থরূপ নিধি (পরমার্থ তত্ত্ব) নিহিত আছে সেই পথেই পূর্ণকাম (বিষয়তৃষ্ণাহীন) ঋষিগণ যান।

এই সত্যাশ্রয়ী বৃত্তি যে শুধু সাধন ভজন ক্ষেত্রে জয়ী হবার জন্য একান্ত আবশ্যক তাই নয়, জীবনের যে কোন ক্ষেত্রে জয়লাভ করতে সত্য ভিন্ন অন্য পথ নেই। আজ সমাজে প্রায়শঃ সত্যের প্রতি অনীহা প্রকাশে যে উৎসাহ দেখা যায় তার মূলকারণ হচ্ছে সত্যের মূল্যবোধের অভাব এবং সত্যের স্বরূপ বিষয়ে অজ্ঞতা। তত্ত্ব ও তথ্য নিয়ে বস্তুর স্বরূপ। সত্যের স্বরূপ ও পূর্ণ পরিচয় এবং সত্যের শক্তি সামর্থ্য আমাদের যদি জানা থাকত, সত্য কি দুর্লভ বস্তু আমাদের দিতে পারে তার একটুও আন্দাজ থাকত তবে এরূপ-ভাবে সত্যকে সর্বক্ষেত্রে বিসর্জন দিয়ে আমরা অন্তরে বাইরে এতটা দেউলিয়া হতাম না। দেশের এই দেউলিয়াপনা দূরীকরণার্থ

রাষ্ট্রনায়কগণ জাতীয় কুলতিলকে "সত্যমেব জয়তে' এঁকে দিয়েছেন। কিন্তু ঐ ব্রহ্মবাণীর প্রকৃত মূল্যবোধের অভাবে তার ফল হয়েছে উলটো। আচরণের অভাবে 'সত্য' বুঝি সত্যি সত্যিই আজ এ দেশ থেকে চিরবিদায় নিচ্ছে! অথবা বিদায় দেবার জন্য আমরা বুঝি উঠেপড়ে লেগে গেছি!

কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের কথা আমাদের সকলের জানা। আমাদের ব্যাবহারিক জীবনে কখনো সংকট ঘনীভূত হলে বলি—জীবনে কুরুক্ষেত্র বেঁধে গেছে। কিন্তু আমরা প্রায় প্রত্যহই নব নব বিষয়-চক্রব্যূহে ঘুরপাক খেয়েও কি একটিবার ভাবছি, সেই মহাসমরের মহাসংকট পঞ্চপাণ্ডব কি মন্ত্রগুণে কি শক্তিবলে কাটিয়ে উঠে ছিলেন! সমূহ-সংকটে শুধু আমরা সাধারণ বুদ্ধির লোকেরাই অধীর অস্থির হই না। মহা মহা ধীর ধীমানকেও তখন একান্ত বেসামাল দেখা যায়। যেমন মহাভারতের ভীষ্ম পর্বে ২১শ অধ্যায়ে—

বৃহতীং ধার্তরাষ্ট্রস্য সেনাং দৃষ্ট্বা সমুদ্যতাম্।
বিষাদমগমদ্ রাজা কুন্তীপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ॥ ১
ব্যূহং ভীষ্মেণ চাভেদ্যং কল্পিতং প্রেক্ষ্য পাণ্ডবঃ।
অক্ষোভ্যমিব সম্প্রেক্ষ্য বিবর্ণোঽর্জুনমব্রবীৎ॥ ২

অর্থ—কুন্তীনন্দন রাজা যুধিষ্ঠির দুর্যোধনের বিশাল সৈন্য বাহিনীকে যুদ্ধ করতে উদ্যত দেখে বিষণ্ণ হয়ে পড়লেন। পরে ভীষ্মরচিত অভেদ্য ব্যূহ দেখে এবং তা অক্ষোভ্য (অনাড়োলনীয়) মনে করত বিবর্ণ হয়ে অর্জুনকে বললেন।

চিন্তা-ভয়ে বিষণ্ণ ও বিবর্ণ ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের কথা শুনে, বিপক্ষের অধিক বুদ্ধিমান, বীর, গুণবান এবং সংখ্যায় বহুতর হলেও অল্প সংখ্যক ব্যক্তিরা কি উপায়ে তাদের জয় করতে পারে তা পূর্বে দেবাসুর সংগ্রামের সময়ে ব্রহ্মা যেরূপ ইন্দ্রাদি দেবগণকে বলে ছিলেন সেই কথা অর্জুন যুধিষ্ঠিরকে বললেন। যথা—

ন তথা বল-বীর্যাভ্যাং জয়তি বিজিগীষবঃ।
যথা সত্যানৃশংসাভ্যাং ধর্মেনৈবোদ্যমেন চ॥

—মহাভারত ভীষ্ম পর্ব ২১।১০

অর্থ জয়াভিলাষী ব্যক্তিগণ সত্য দয়া ধর্ম ও উদ্যমদ্বারা যেরূপ জয় করতে পারেন, বল ও বীর্য দ্বারা সেরূপ জয় করতে পারেন না,

এতদ্দ্বারা ইহা নিশ্চিত হল যে, পরমার্থ প্রাপ্তিতে যেমন সত্যপথ বিনা পথ নেই, পার্থিব বস্তু লাভ করে সংসারে সুখী হতেও তেমনি সত্যপথ অবলম্বন বিনা অন্য পথ নেই। কি ইহ-কালে কি পরকালে আমাদের দুর্দশার মূলকারণ সত্যের সঙ্গে সম্পর্কহীনতা। সত্য মনন, সত্য অনুশীলন, সত্য আচরণ না করলে ইহসংসারে যেমন তিলমাত্র শান্তির আশা নেই, তেমনি সাধন ভজনের সকল চেষ্টাতেও ছিদ্র কুম্ভে জল ভরা ছাড়া অন্য লাভ নেই।

ব্রহ্মচর্যাশ্রমের আলোচনায় আরো একটি বিষয় স্পষ্ট হল। আমরা যারা যৌবনের প্রথম প্রভাত থেকে বীর্যরক্ষা না করে মধ্যপথ থেকে সংযমী হতে চেষ্টা করি, ব্রহ্মজ্ঞান লাভে লোভ করি, আমাদের এ আশা এ প্রচেষ্টা ফলবতী হবে এমন সমর্থন শাস্ত্রে দেখা যায় না। তবে পথটা কিছু এগিয়ে থাকা যায়। সৎ প্রচেষ্টার বিনাশ নাই। সেকারণে পরজন্মে পথ একটু সহজ হয়। মহাভারতের উদ্যোগ পর্বে ৪১-৪৬শ অধ্যায়ে সনৎসুজাত অনুপর্বে ব্রহ্মনিরূপণ বিষয়ে অতীব নিগূঢ় আলোচনা আছে। তত্ত্ব-দর্শী পণ্ডিতগণ এর সমধিক মূল্য দেন। এখানে দেখা যাবে ধৃতরাষ্ট্র খুব ঔৎসুক্যসহ সর্বোত্তমা ও সর্বরূপা ব্রহ্মসম্বন্ধিনী বিদ্যার কথা জিজ্ঞাসা করায় সনৎসুজাত বললেন—

অব্যক্তবিদ্যামভিধাস্যে পুরাণীং বুদ্ধ্যা চ
তেষাং ব্রহ্মচর্যেণ সিদ্ধাম্।

অর্থ—এখন আমি অব্যক্ত ব্রহ্মের সহিত সম্বন্ধযুক্তা সেই পুরাতনী বিদ্যার বর্ণনা করব, যাতে মনুষ্যগণ নিজ বুদ্ধি ও ব্রহ্মচর্য দ্বারা সিদ্ধ হয়।

এ বাক্যের তাৎপর্য হল—পূর্ণ ব্রহ্মজ্ঞান বা ব্রহ্মসাযুজ্য প্রাপ্ত হতে হলে পূর্ণ ব্রহ্মচর্য চাই। অর্থাৎ আকৈশোর ব্রহ্মচর্য চাই। 'সিদ্ধাম্' শব্দটির ইহাই অভিব্যক্তি। তারপর ধৃতরাষ্ট্র যখন জিজ্ঞাসা করলেন—ব্রহ্মচর্য পালন কি ভাবে করতে হয়? উত্তরে মুনি মহারাজ বললেন—

আচার্যযোনিমিহ যে প্রবিশ্য ভূত্বা
গর্ভে ব্রহ্মচর্যং চরন্তি।

অর্থাৎ আচার্যের আশ্রমে প্রবেশ করে নিজ সেবাদ্বারা তাঁর অন্তরঙ্গ ভক্ত হয়ে ব্রহ্মচর্য পালন করতে হয়।

সুতরাং মধ্যপথের ব্রহ্মচর্য ব্রহ্মচর্যপদবাচ্য নয়। এখানে প্রশ্ন হতে পারে— তা হলে কি আমরা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করতে পারব না? উত্তরে বলাচলে—হাঁ, ব্রহ্মজ্ঞান তো হবেই। আর হবেই বা বলি কেন! ব্রহ্মজ্ঞান কম বেশী তো সকলের মধ্যেই আছে। যখন ভিতরে অন্তর্যামীরূপে ব্রহ্ম সদা বিরাজমান তখন ব্রহ্মজ্ঞান দূরস্থ রবে কেন! কিন্তু আমাদেব আলোচনা চলছে উপনিষদ কথিত ব্রহ্মজ্ঞান বিষয়ে—যার পরিচয় দিতে মুণ্ডক উপনিষদ বলছেন—

স যো হ বৈ তৎ পরমং ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি,

—৩।২।৯

অর্থ— যে কেউ এই পরম ব্রহ্মকে জানেন তিনি ব্রহ্মই হন (ব্রহ্মভূত হন)।

ব্রহ্মজ্ঞান লাভে জীব ব্রহ্মস্বরূপ হয়। মাঝপথে ব্রহ্মচর্য শুরু

করলে এতটা এগোনো যাবে না—এটাই আমরা বুঝতে পারছি এই শাস্ত্রালোচনা থেকে। তবে এতে নিরাশ হবার কিছু নেই। মৃত্যুর মুহূর্তেও যদি শুধু 'নারায়ণ' শব্দ উচ্চারণ করে বৈকুণ্ঠবাস হয় তবে আর ভয় ভাবনা কোথায়! এ অভয় স্বয়ং ভগবান আমাদের দিয়েছেন।

যথা—**স্বল্পমপ্যস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ।**

গীতা ২।৪০

অর্থ—এই ধর্মের অতি অল্পমাত্র আচরণও মহাভয় হতে পরিত্রাণ করে। স্বল্প মানে সু-অল্প, খুব সামান্য। শুধু অল্পের কথা হচ্ছে না। অতি অল্প সদ্ধর্মও জীবকে মহাভয় হতে রক্ষা করতে পারে। তবে আর আমাদের ভয় কি! ভয়-ভাবনায় সময় নষ্ট না করে এই ধর্মের এক তিলও যাতে সঞ্চয় হয় তার জন্য যত্নবান হওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ হবে।

ব্রহ্মচর্য দুই প্রকার—গার্হস্থ্য ও নৈষ্ঠিক। নৈষ্ঠিকে পত্নী পরিগ্রহ নাই। বিবাহিতের জন্য ব্রহ্মচর্য পালনের নির্দেশ সম্পর্কে মহাভারতে যুধিষ্ঠিরের প্রশ্নে মহামতি ভীষ্মদেব বলছেন—

নান্যদা গচ্ছতে যস্তু ব্রহ্মচর্যঞ্চ তৎ স্মৃতম্।

অনু: প: ১৬২ অ: ৪২ শ্লোক।

অর্থ—যে মানুষ ঋতুকাল ব্যতীত আর কোনও সময়ে স্ত্রীগমন করে না, তার এই আচরণ ব্রহ্মচর্য বলে অভিহিত হয়।

"তৎ স্মৃতম্" বাক্যের অভিপ্রায় হল—উপনিষদ বর্ণিত ব্রহ্মচর্য আর এই ব্রহ্মচর্য ভিন্ন বস্তু। অতএব ভিন্ন ফল। এই শ্লোকেই দেখা যাবে যে নিয়ম ভঙ্গ করলে গার্হস্থ্যের ব্রহ্মচর্যও ভঙ্গ হবে। তবে ব্রহ্মচর্যাশ্রম অন্তে অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞান লাভের পর সংসারাশ্রমে প্রবেশ করতে শাস্ত্রের নিষেধ নেই, বা তাতে ব্রহ্ম-

জ্ঞানের হানি হয় না। ব্রহ্মচর্যাশ্রমের পর যারা গার্হস্থাশ্রমে যেতে চাইত, আচার্য তাদের উপদেশ দিতেন—

* * * *

প্রজাতন্তুং মা ব্যবচ্ছেৎসীঃ। সত্যান্ন প্রমদিতব্যম্। ধর্মান্ন প্রমদিতব্যম্।* * স্বাধ্যায়প্রবচনাভ্যাং ন প্রমদিতব্যম্॥

তৈত্তিরীয় উপনিষদ ১।১১।১

অর্থ—সন্তান-ধারা অবিচ্ছিন্ন রাখবে। সত্য হতে ভ্রষ্ট হবে না। ধর্ম হতে বিচ্যুত হবে না। বেদপাঠ এবং অধ্যাপনা বিষয়ে অমনোযোগী হবে না।

এবিষয়ে আরো একটি বিশেষ মন্ত্র (মুণ্ডক উপনিষদ ৩।২।৯) পাওয়া যায়—**নাস্যাব্রহ্মবিৎ কুলে ভবতি।**
অর্থ—(যিনি ব্রহ্মকে জেনে ব্রহ্মভূত হন) তাঁর কুলে (বংশে) কেউ অব্রহ্মবিদ্ জন্মে না।

সুতরাং ব্রহ্মজ্ঞানীর সন্তান উৎপাদনে বাধা নেই যদি তিনি সত্য-ধর্ম-বেদ হতে বিচ্যুত না হন। স্বনামখ্যাত মুনি-ঋষিদের অনেকেই সন্তানের জনক ছিলেন। এর প্রয়োজন তখনো যেমন ছিল এখনো তেমনই আছে। নতুবা কৃষ্টি-সংস্কৃতি রক্ষা পায় না। মুনি-ঋষিদেব সেই সব সন্তানবা পিতাব ব্রহ্মজ্ঞানের উত্তরাধিকারী হত। শাস্ত্রে একটি বাক্য আছে—“**তেজীয়সাং ন দোষায় বহ্নেঃ সর্বভুজো যথা**”—শক্তিশালী ব্যক্তিব কোনও বিষয়ে দোষ স্পর্শ করে না, যেমন অগ্নি যাবতীয় বস্তুকেই গ্রাস করতে পারে। ভিতরে জ্বলন্ত ব্রহ্মাগ্নি থাকলে দোষ-পাপের কি সাধ্য আছে তাঁকে স্পর্শ করে। এর প্রমাণস্বরূপ ব্যাসদেবের জন্ম-কাহিনী স্মরণীয়।

তৎকালীন গার্হস্থ্যাশ্রমেও কঠোরভাবে সত্য-ধর্ম পালন করার নির্দেশ ছিল। তৈত্তিরীয় উপনিষদের ১।৯ মন্ত্রে আছে—**অতিথয়শ্চ স্বাধ্যায় প্রবচনে চ** (অতিথি সেবা, বেদাধ্যয়ন ও অধ্যাপনা)। **মানুষঞ্চ স্বাধ্যায় প্রবচনে চ** (লৌকিক আচার পালন, বেদাধ্যয়ন ও অধ্যাপনা)। **প্রজাচ স্বাধ্যায় প্রবচনে চ** (সন্তানোৎপাদন, বেদাধ্যয়ন ও অধ্যাপনা)। **প্রজনশ্চ স্বাধ্যায় প্রবচনে চ** (ঋতুকালে ভার্যাগমন, বেদাধ্যয়ন ও অধ্যাপনা)। **প্রজাতিশ্চ স্বাধ্যায় প্রবচনে চ** (পৌত্রোৎপত্তির নিমিত্ত পুত্রের বিবাহ দান, বেদাধ্যয়ন ও অধ্যাপনা)।

লক্ষণীয়—প্রতি মন্ত্রে বেদপাঠ এবং বেদ পড়ানোর উল্লেখে তার গুরুত্ব, প্রয়োজনীয়তা যেমন প্রকাশ পাচ্ছে, তেমনি ব্রহ্মজ্ঞ গৃহস্থকেও সাবধান করে দেওয়া হয়েছে। সংসার-গৃহের সবরকম দায়দায়িত্ব পালন করেও প্রত্যহ বেদপাঠ এবং অধ্যাপনা অবশ্য কর্তব্য ছিল। ব্রহ্মজ্ঞান চর্চায় যাতে ঘাটতি না পড়ে এবং ব্রহ্মজ্ঞানীর সংখ্যা যাতে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায় তার জন্যই এই বৈদিক বিধি। মনু সংহিতার ২।১৫৮ শ্লোকে আছে—ক্লীব যেমন স্ত্রীবিষয়ে নিষ্ফল, গাভী যেমন গাভীতে অফলা, মূর্খ ব্যক্তিকে দান যেমন ফলশূন্য, সেইরূপ বেদাধ্যয়নহীন ব্রাহ্মণও ফলহীন, অর্থাৎ কোন বৈধকর্মের যোগ্য নহে।

তৎকালে ব্রহ্মজ্ঞান প্রসার-প্রচারের জন্য কত গভীর আন্তরিক প্রচেষ্টা ছিল তা ভাবলেও বিস্ময়ান্বিত হতে হয়। চতুরাশ্রমের বাকী দুটিতে, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস আশ্রমেও যে বেদচর্চা, ধ্যান, সত্যনিষ্ঠা প্রভৃতি অপরিহার্য তা বলাই বাহুল্য।

স্ত্রীলোকগণের জন্য শাস্ত্রীয় বিধান হচ্ছে—

বৈবাহিকো বিধিঃ স্ত্রীণাং সংস্কারো বৈদিকঃস্মৃতঃ।
পতিসেবা গুরৌ বাসো গৃহার্থোঽগ্নিপরিক্রিয়া॥

মনুসংহিতা ২।৬৭

অর্থ—বিবাহ-সংস্কারই স্ত্রীলোকের বৈদিক উপনয়ন সংস্কারস্বরূপ। স্বামীর সেবাই গুরুগৃহে বাস এবং স্বামীর গৃহকর্মই সায়ংপ্রাতঃ-কালীন হোমরূপ অগ্নিপরিচর্যা।

বৈদিক যুগে যে নারীসমাজে বেদচর্চা ছিল এবং অনেক বিদুষী-ব্রহ্মবাদিনী মহিলা ছিলেন তার কথা আমরা আগেই জেনেছি। মাতৃজাতি সম্পর্কে মনুসংহিতার একটি মূল্যবান উপদেশ—

"যত্র নার্যাস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ"—

যে গৃহে নারীরা শ্রদ্ধাপূজার পাত্রী সে গৃহে সকল দেবতা বিরাজ করেন। মনুবচনের অন্তর্নিহিত ভাবটি গ্রহণ করলে ভজন-পথ সহজ হবে। প্রত্যেক নারীকে মহাশক্তির অংশ মনে করে শ্রদ্ধা করলে মা মহামায়া তুষ্টা হন। সমস্ত দেবতা প্রীত হন। ফলে সাধকের শক্তি লাভ সুলভ হয়। সাধকের প্রথম শক্তিসাক্ষাৎ হয় নারীর ভিতরে। শ্রীশ্রীচণ্ডীর ২।১৩ মন্ত্রে আছে—

অতুলং তত্র তত্তেজঃ সর্বদেবশরীরজম্।
একস্থং তদভূন্নারী ব্যাপ্তলোকত্রয়ং ত্বিষা ।।

অর্থ—অনন্তর সকল দেবতার শরীর হতে সঞ্জাত ত্রিলোক ব্যাপী অনুপম তেজোরাশি একত্র হয়ে এক নারীমূর্তি ধারণ করল।

এসব তত্ত্ব স্মরণে রেখে সাধকগণ নারী সম্পর্কে একটু বেশী সাবধান হবেন। নারীর আশীর্বাদে যেমন সহজেই অভীষ্ট লাভ হয়, আবার তাঁদের অভিশাপে পতনের পথও দ্রুত তৈরী হয়।

ব্রহ্মজ্ঞান লাভের পরেও স্বাধ্যায় এবং প্রবচন নিয়ে ঐরূপ বৈদিক বাধ্যবাধকতার এবং কঠোর নিয়মানুবর্তিতার কি কারণ ও প্রয়োজন থাকতে পারে তা একটু চিন্তা করলেই বুঝা যায়। প্রাচীনতম যুগেই সমাজের চিন্তাশীল ব্যবস্থাপকরা জেনে ছিলেন—কি ব্যক্তিগত জীবনে কি সমাজজীবনে সবরকম অনাচার অশান্তির

মূলে মানুষের পশুবৃত্তি। মনীষীগণ বললেন—মনই মানুষকে মহান করে, আবার এই মনই মানুষকে মহাপাতকী করে। সংসার-বন্ধন বা মোক্ষ-মুক্তির বীজ লুকিয়ে আছে মানুষের মনে। মনের আসুরিক বৃত্তিকে নিষ্ক্রিয় নিরোধ করার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হল। ইতিমধ্যে মনের একটি বিচিত্র চরিত্র অবগত হওয়া গেল—সে কখনই চুপ করে বসে থাকতে জানে না। সবসময়েই কিছু না কিছু কাজ মনের চাই-ই চাই। আদিযুগ থেকেই সেই সদা-চঞ্চল ইন্দ্রিয়াধিপতি মনকে নিয়ে চলছে সদা-মনন। এ মননের শেষ আজো নেই, অনাদি ভবিষ্যতে ও নেই। একে তো রাজা তার উপর সদা চঞ্চল। এই চঞ্চলের রাজাকে নিয়ে বিজ্ঞমহলে বেশ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হল। মহাসমরসংকটে দাড়িয়ে মহাধনুর্ধর অর্জুন তো শ্রীভগবানের কাছে কবুল করে বসলেন—**চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ প্রমাথি বলবদ্দৃঢ়ম্।** একে সংযত নিয়ন্ত্রিত করার কৌশল আবিষ্কারের গবেষণায় রত হলেন পণ্ডিতগণ।

অবস্থা দেখে মনে হয়, এই চঞ্চল মনকে সংযত করার উপায় খুঁজতে গিয়েই একদা ঈশ্বরচিন্তার দরজা খুলে যায়। গীতায় শ্রীভগবান বলেছেন, আমি ইন্দ্রিয়গণের প্রবর্তক মন। এই মন-ভগবানের তত্ত্ব খুঁজতে গিয়েই ব্রহ্মভগবানের হদিশ পাওয়া গেল। কারণ, মনকে এমন একটা কাজে নিয়োজিত করা দরকার হয়ে পড়ল, যে কাজ কোন দিন ফুরোবেনা, যে কাজে আসুরিকবৃত্তি কোন দিন নাক গলাতে পাবেনা। পণ্ডিতদের এই ভাবনাতে সাহায্য করল সদাদৃশ্যমান দিগন্তদিশারী অনন্ত নীল আকাশ। অনন্ত আকাশ দেখেই অনন্তব্রহ্মের প্রথম কল্পনাবুদ্‌বুদ্ দেখা দেয় মানব মনে। আকাশের মাধ্যমেই অনন্তের সঙ্গে মানুষের প্রথম পরিচয়। এই অনন্তের অফুরন্ত ভাবনার পিছে মনকে লেলিয়ে দিতে পারলে মন আর অন্য ভাবনার সুযোগ পাবে না। ব্রহ্ম অনন্ত অফুরন্ত বলে যতই মন ব্রহ্মচিন্তায় নিমগ্ন হবে অনন্তের হাত-

ছানিতে এ চিন্তাও ততই অনন্তের পানে ছুটবে। ব্রহ্মানন্দের আকর্ষণে মন কেবল সামনেই ছুটবে। পিছন ফিরতে ফরসুত পাবে, না। আসুরিক শক্তি পিছে পড়ে থাকবে। তত্ত্বদর্শীগণ বললেন—"তদ্‌রসামৃত তৃপ্তস্য নান্যত্র স্যাদ্‌ রতিঃ ক্বচিৎ।" একবার ঐ অনন্ত ব্রহ্মের স্বাদ পেলে জীব আর অন্য রসে মজবে না।

অনন্ত ব্রহ্মের অনন্ত ভাবনা থেকে কোন অবস্থাতেই কখনো যাতে ব্রহ্মজ্ঞানী বিযুক্ত না হন তার জন্যই বেদে ঐরূপ বাধ্যবাধকতা। কারণ, ঈশ্বরভাবনা থেকে মন কোনক্রমে একবার ছুটি পেলে সে পলকেই অঘটন ঘটিয়ে ফেলতে পারে। এর উদাহরণ শাস্ত্র-পুরাণে পদে পদে। তেমন অঘটন থেকে বাঁচবার উপায় হল সদা বেদ-ভাবনায় ডুবে থাকা। ব্রহ্মভাবনায় বন্দী থাকা'। তা ছাড়া আচরণ করে আদর্শ প্রচারের প্রশ্নও আছে। আচার্যরা আচরণে কঠোর হলেই সে আদর্শ বেঁচে থাকে। স্থায়ী হয়।

কালপ্রভাবে জ্ঞানানুশীলনের জন্য গুরুগৃহে গমন রহিত হওয়ায় গুরুকুলপ্রথা কার্যতঃ উঠে গেল। সত্যদ্রষ্টা অধ্যাপকের আলোকবর্তিকা হতে জ্ঞানপ্রদীপ জ্বালবার সুযোগ ব্রহ্মচারীদের আর রইল না। এতে শুধু ব্রহ্মচারীরাই বঞ্চিত হল না, উপযুক্ত জ্ঞান-গ্রহীতার অভাবে গুরুগণের জ্ঞানচর্চাও ভীষণভাবে ব্যাহত হল। কারণ, এ ধন যতই দান করা যায় ততই বেড়ে যায়। জ্ঞান-দানের পরিণতি জ্ঞানবৃদ্ধিতে। জ্ঞানদানের সুযোগ যদি সংকুচিত, বৃদ্ধিও তবে বিঘ্নিত। ফলে ক্রমশঃ ধর্ম ও সংস্কৃতির ধারা ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হতে লাগল। সমাজে সত্যাদর্শের চর্চা কমতির সঙ্গে সঙ্গে ধর্মে ও আচরণে সত্যানুরাগ নিম্নমুখী হল। সত্য-ভ্রষ্ট সভ্যতায় যেমন সমাজে সুখ আসে না, সত্যভ্রষ্ট ধর্মচর্চায়ও তেমনি অন্তরে কোন উপলব্ধি আনে না।

গুরুকুল প্রথার প্রয়োজন হয়ত কালপ্রভাবে ফুরাতে পারে,

কিন্তু সত্যের প্রয়োজন চিরন্তন। সুখ এবং আনন্দের জন্যই সত্যের প্রয়োজন। সত্য বিহনে ধর্ম নেই। ধর্ম বিহনে সুখ নেই। জনমনকে আনন্দময় সত্যধর্মে প্রতিষ্ঠিত করতে একমাত্র যাঁরা সক্ষম সেই সত্যদ্রষ্টা আচার্যদের অভাব ঘটল গুরুকুলপ্রথা উঠে যাবার ফলে। আমাদের ব্যষ্টিগত সদাচারের উপরই সমাজের সমষ্টিগত সদাচার নির্ভর করে। সত্যনিষ্ঠ গুরুর প্রয়োজন শুধু ব্যক্তিগত পারমার্থিক চাহিদা পূরণেই সীমাবদ্ধ নয়, পরন্তু সামাজিক শৃঙ্খলা তথা সুস্থ গার্হস্থ্য পরিবেশ তৈরীতেও আচার্য-গুরুগণের অবদান অনস্বীকার্য। ঐরূপ সত্যদ্রষ্টা আচার্যের অভাবে দেশ আজ সত্য-ভ্রষ্ট ধর্মে প্রভাবিত। ফলে সর্বত্র অনাচার-অশান্তি। যে কোন অশুভ-অশান্ত শক্তি যে সত্যের সম্মুখে নতশির তার প্রমাণ বহুবার আমরা গান্ধীজীর জীবনে পেয়েছি। তবু আমরা সত্যের মূল্যায়ন করতে পারি নি। কিন্তু সমাজে সুখ-সমৃদ্ধি আনতে হলে অবশ্যই একদিন সত্যের মূল্যায়ন করতে হবে। সত্যভিন্ন পথ নেই।

বহুকাল পূর্বে হারিয়ে যাওয়া গুরুকুলপ্রথা সমর্থনে কোন আলোচনা কেউ কেউ এখন অবান্তর বা পক্ষপাতদুষ্ট মনে করতে পারেন। অন্য কেউ আধুনিক যুগে ঈশ্বর-ভাবনার প্রয়োজনীয়তা পর্যন্ত অস্বীকার করতে পারেন। দ্বিতীয় পক্ষের জন্য কৈফিয়ৎ দিবার বিশেষ কিছু নেই, শুধু তাঁদের একটু অপেক্ষা করতে অনুরোধ করা ছাড়া। কারণ, দেখা গেছে অধিকাংশ ক্ষেত্রে তথাকথিত নাস্তিকরাই পরে শ্রদ্ধাভক্তিতে আস্তিকদেরও ছাড়িয়ে যান। তবে প্রথম পক্ষের কাছে বিনীত নিবেদন— বহুবার • আমরা রাজনৈতিক অর্থনৈতিক সামাজিক শিক্ষা সংস্কৃতি, এমন কি সাধন জগতেরও কোন কোন ক্ষেত্রে পুরানো প্রথা রদ করে নূতন ধারা আমদানী করেছি। তার অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কি আমাদের বিপুল খেসারত দিতে হয় নি! এখনো কি দিচ্ছি না! পুরাতন হলেই পরিত্যাজ্য আর নব মানেই গ্রহণীয়—

এ কথা বলা যাবে কি ? যদি তা না যায় তবে নূতন-পুরাতন তর্ক ছেড়ে আসতে হয় বস্তুর গুণ-বিচারে। গুণ-বিচারের সহজ মাপকাঠী পাওয়া যেতে পারে গুণের পরিণামে বা ফলে। ফল-বিচারে দেখাযাবে প্রাচীন শাস্ত্র-দর্শন প্রভৃতিতে মানবমনের প্রধান চাহিদা সুখ বা সদানন্দ লাভের যে স্থায়ী পথের নির্দেশ রয়েছে তার স্থান দখল করতে পারে এমন তত্ত্ব-সংবাদ আধুনিক চিন্তাধারায় খুঁজে পাওয়া যায় না। কেবল আমাদের নিজস্ব বিচার-মানদণ্ডের কথাতেই নয়, বহির্বিশ্বের জ্ঞানবিচারের তুলাদণ্ডেও সর্ব-শ্রেষ্ঠ প্রমাণিত হয়ে আর্যসংস্কৃতি বিশ্বের জনমানসে শ্রদ্ধার এক উঁচু আসন দখল করে আছে। বিশ্বসাহিত্যের রাজদরবারে আমাদের "গীতাঞ্জলি" যে রসতত্ত্বগুণে জয়মুকুট পরে ছিল সেই রসসৃষ্টির উপাদান কি আর্যসভ্যতার শ্রেষ্ঠতম অবদান বেদ-উপ-নিষদ-গীতা প্রভৃতি থেকে সংগৃহীত হয় নি ! আমাদের এই অতুলনীয় প্রাচীন সম্পদের বড়াই যদি কেবল মুখেই করি আর কার্যক্ষেত্রে আচরণে তার উলটো করি তবেই কি আমাদের ধন-জ্ঞান ভাণ্ডার কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে উঠবে !

অবশ্য এ কথা বলা হচ্ছে না যে দেশে কোথাও এখন আর বেদচর্চা নেই। কিছু কিছু বিদ্যাপীঠে মঠমন্দিরে গেলে এখনও বেদাধ্যয়নরত ব্রহ্মচারীদের সাক্ষাৎ পাওয়া যাবে। তাদের সমবেত সামগান শ্রবণে ক্ষণিকের জন্য হলেও বৈদিক যুগ থেকে ঘুরে আসা যাবে। কিন্তু দেশের জনসংখ্যার তুলনায় তারা এতই নগণ্য যে সমাজের ওপর দেশের ওপর তাদের কোন প্রভাব লক্ষিত হয় না। অপৌরুষেয় বেদ তাঁর নিজগুণগ্রামে দেশের কোন ক্ষুদ্র কোণে কোনপ্রকারে বেঁচে আছেন, এই মাত্র। এতে আমাদের কোনই গৌরব নেই। বরং অগৌরব পুরাপুরি। ভারতবাসীর কাছে লজ্জারও কারণ, যখন ভারতের বাইরে বেদচর্চা বাড়ছে। বঙ্গবাসীর কাছে ততোধিক পরিতাপের বিষয়,

যখন আমাদের ছেলেরা বেদ-উপনিষদ কাকে বলে তাই জানে না। সংস্কৃত ভাষা জাদুঘরে ঠাঁই পেতে চলছে। দেবভাষা পরিত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে আমরা দেবভাবও পরিত্যাগ করেছি। অসুরভাবের মাথাচাড়া দিয়ে না ওঠার কোন কারণ নেই।

নিরপেক্ষ বিচারে অবশ্যই স্বীকার করতে হয়—কোন কৃষ্টির ক্রমোন্নতি ঘটাতে, সেই উন্নতমান রক্ষা করতে এবং তাতে যুগোপযোগী প্রবাহ সঞ্চার করতে নিরবচ্ছিন্ন চর্চানুশীলনের পথ ছাড়া দ্বিতীয় পথ নেই। আর সেই চর্চা অনুশীলন পরম্পরাগত না হলে, রক্তের সঙ্গে মিশে না গেলে তা যেমন স্থায়ীত্ব লাভ করে না, তেমনি তা উন্নদ্ধও থাকে না। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে সঙ্গীতি ঘরানার কথা। সঙ্গীতের এক-এক গায়কী ঢঙ্‌'এর সূক্ষ্ম কলাকৌশলের বিশুদ্ধতা রক্ষার জন্য এক-একটি ঘরানার সৃষ্টি। সেই সব ঘরানার গুণীজনেরা পরম্পরাগতভাবে নিষ্ঠার সহিত আপন আঙ্গিকের বিশুদ্ধতা রক্ষার জন্য, ক্রমোন্নতির জন্য নিরন্তর যে সাধনপ্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছেন তারই ফলশ্রুতি সঙ্গীত-জগতের চিত্তবিত্তহারী বিভিন্ন রাগমঞ্জুষা। ঐ সব কলাকারসৃষ্ট বিভিন্ন রাগমূর্ছনা যখন অরসিক মনেও অপার্থিব রসতাণ্ডব সৃষ্টি করে তখনই অবাক লাগে, কি উপায়ে শিল্পী তার আপম ভাব অপরের হৃদয়তন্ত্রীতে ঝঙ্কৃত করেন! আমরা বলি, উনি নিজে ডোবেন তাই অপরকে ডোবাতে পারেন, নিজে কাঁদেন তাই অপরকে কাঁদাতে পারেন। জানতে চাইনে— রম্যরসের কোন্ ধারায় স্নাত হয়ে নয়নে তার পুলকাশ্রু! জানতে চাইনে—বিশ্বে কি এমন ভাবপরিবাহী মাধ্যম বিদ্যমান যা এক হৃদয়ের ভাব-বিভাব অন্য হৃদয়ে অবিকৃতভাবে সঞ্চালিত করে! এ রসের রহস্যও উদ্‌ঘাটন করেছেন শ্রুতি। তৈত্তিরীয় উপনিষদ ২য় অধ্যায়ে ৭।২ মন্ত্রে বলছেন—

যদ্বৈ তৎ সুকৃতম্। রসো বৈ সঃ। রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি। **এষ হ্যেবানন্দয়াতি।

অর্থ—যিনি সুকৃত (স্বয়ংকর্তা) তিনিই রসস্বরূপ (তৃপ্তিকর সুখস্বরূপ)। জীব এই রসকে লাভ করেই আনন্দিত হয়। ইনিই (রসস্বরূপ ব্রহ্ম) জীবকে আনন্দ দান করেন।

আচার্য শংকর এই শ্রুতিবাক্যের ব্যাখ্যায় বলেছেন—"তিনি রসস্বরূপ বলেও তাঁর অস্তিত্ব সিদ্ধ হয়। তাঁকে রসস্বরূপ বলার তাৎপর্য এই যে, যাঁ সুকৃত (স্বয়ংকর্তা, ব্রহ্ম) তাই রসস্বরূপ।" রসনেন্দ্রিয়ের তৃপ্তিসাধন করে সেরকম মধুর অম্ল ইত্যাদি রস আস্বাদন করেই সাধারণ লোক সুখ পায়। অসৎ পদার্থকে অর্থাৎ অস্তিত্বহীন কাল্পনিক পদার্থকে কোথাও কাউকে সুখ বা আনন্দ দান করতে দেখা যায় না। দেখা যাচ্ছে, সাধারণ লোক টক-মিষ্টি খেয়ে যেমন আনন্দ পায় নিষ্কাম ব্রহ্মজ্ঞগণ তা না খেয়েও আনন্দিতই থাকেন। তাহলে নিশ্চয়ই ব্রহ্মজ্ঞগণ কোন রসবস্তু আস্বাদন করে আনন্দিত থাকেন। তাঁরা ব্রহ্ম ছাড়া অন্য বস্তু আস্বাদন করেন না। অতএব ব্রহ্মই রসবস্তু।

'রস' শব্দটি "রস আস্বাদন স্নেহয়োঃ"-এভাবে সিদ্ধ হয়ে আছে। অর্থাৎ—রস এবং রসন্ (আস্বাদন) এই দুটিকেই বুঝায় 'রস' শব্দে। **"রস্যতে ইতি রসঃ, রসনাদ্ ইতি রসঃ"**— অর্থাৎ রস শব্দে আস্বাদ্য রস বস্তুটি এবং সেই বস্তুটির উপযোগ (ব্যবহার, ভোগ) এই দুটিই বুঝায়। অতএব রসময় ব্রহ্মের দুটি ভাব। এক ভাবে তিনি আস্বাদ্য রস, অপর ভাব তাঁর আস্বাদনক্রিয়াশীলতা। এ দুটি ভাবই যুগপৎ কার্য করে। সদাসর্বত্র বিদ্যমান রসবান ব্রহ্মের আস্বাদনক্রিয়াশীলতাই বিশ্বের ভাবপরিবাহী মাধ্যম—যার মধ্যস্থতায়, যার মারফৎ এক হৃদয়ের অতীন্দ্রিয় ভাব অবিকৃত অবস্থায় অন্য

হৃদয়ের তন্ত্রীতে পৌঁছে যায়। তুলনা দিয়ে বুঝাতে গেলে বেতার তরঙ্গের সঙ্গে তুলনা দেওয়া চলে।

যখন বিদগ্ধ সঙ্গীতকারের আপন তান-মন-ধ্যান একযোগে বিশুদ্ধ রাগমার্গে বিচরণ করে তখনই রসের সৃষ্টি হয়। রস নিজে ব্রহ্ম অর্থাৎ আনন্দময়। তার কাজই হচ্ছে আনন্দ দান করা বা আনন্দ আস্বাদন করানো। রসের এই আস্বাদন-ক্রিয়াশীলতাই যুগপৎ সঙ্গীতকারকেও কাঁদায় শ্রোতাকেও কাঁদায়। এই ভাব-ক্রিয়া আমাদের জীবনের সর্বক্ষেত্রেই সমভাবে ক্রিয়াশীল। সামাজিক, রাজনৈতিক, ব্যাবহারিক, আধ্যাত্মিক—কোন ক্ষেত্রই এই ক্রিয়াশীলতার কবল থেকে রেহাই পায় না। আধুনিক সামাজিক এবং রাজনৈতিক উচ্ছৃঙ্খল-অশান্তির মূল উৎসও লুকিয়ে আছে কর্মকর্তাদের মনোভাবের মধ্যে। তাঁদের মনোগত অশুদ্ধ ভাবই রূপ পরিগ্রহ করেছে জনমানসে। দেশকে শুদ্ধ-শোধন করতে হলে আগে কর্তাদের মনেই গঙ্গাজল সিঞ্চন করতে হবে। দ্বিতীয় পথ আগেও ছিল না, এখনও নেই।

ভাব যত সূক্ষ্ম হতে থাকে তার শক্তিও তত বাড়তে থাকে। অন্যভাবে বলা যায়, ভাব যতই শুদ্ধ হতে থাকে, শুদ্ধতর থেকে শুদ্ধতম হতে থাকে তার শক্তিও সেই অনুপাতে বৃদ্ধি পেতে থাকে। এর সহজ উদাহরণ আমাদের চোখের সামনেই আছে। যেমন, হোমিওপ্যাথিক ঔষধ। ঔষধের ঘনত্বকে যতই লঘুকরণ করা হবে তার শক্তি ততই বৃদ্ধি পাবে। রজোগুণীভাব অপেক্ষা তমোগুণী-ভাব স্থূলতর এবং জড়। রজোগুণীভাব অপেক্ষা সত্ত্বগুণীভাব সূক্ষ্ম-তর, তাই অধিক শক্তিশালী। একারণে যার ভাব যত সূক্ষ্ম যত 'অণোঃ অণীয়ান্' (অতি সূক্ষ্ম হতেও সূক্ষ্ম) ইন্দ্রিয়াতীত ভাব গ্রহণে-আস্বাদনে তার শক্তিও তত 'মহতো মহীয়ান্' (বৃহত্তম হতেও

বৃহৎ)। অর্থাৎ 'অণোঃ অণীয়ান্' ভাবনা-ই কেবল 'মহতো মহীয়ান্' ব্রহ্মকে আস্বাদন করতে পারে। অন্যভাবে—'অণোঃ অণীয়ান্' এর ভিতরে 'মহতো মহীয়ান্' শক্তি বিরাজমান। যতই সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম স্তরে পৌঁছবে ততই মহতী শক্তির সন্ধান মিলবে। এই মহতী শক্তিই আত্মা ঈশ্বর ভগবান ব্রহ্ম। শক্তিতত্ত্বের উৎসমুখ মানবজ্ঞানের অগম্য। তবু এ রহস্য-রাজ্যের কিছুটা পথ অতি সূক্ষ্মদর্শী অতিক্রম করতে পারেন শুধু সূক্ষ্মতম জ্ঞানাত্মক মনন দ্বারা।

পরমাত্মা অতীব সূক্ষ্ম। আমাদের দৃষ্টি অতীব স্থূল। শুধু একারণেই আমাদের আত্মদর্শন হয় না। ভগবানকে খুঁজতে হয় না। তিনি সম্মুখেই আছেন, নেই আমাদের দৃষ্টি। সূক্ষ্মতম ক্ষেত্রেই বিরাট পুরুষকে ধরা যায়। ব্রহ্মের এ বড়ই লুকোচুরি লীলা! ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র মানব অনন্ত অসীম ব্রহ্মকে ধরবার জন্য ভূলোকে গোলোকে পাতালে সর্বত্রই খুঁজে বেড়িয়েছে। তিনিও সর্বদা আগে আগে ছুটে পালিয়েছেন। কোথাও ধরা দেন নি। জীব খুঁজেছে, ব্রহ্ম লুকিয়েছেন। ধরতে না পেরে সে ক্লান্ত পরিশ্রান্ত হয়ে চুপ হয়ে বসে গেল। পরাজিতের মত একটু ভাবল আর মনে মনে বলল—দাঁড়াও ঠাকুর, তোমার লুকোচুরি খেলা বন্ধ করতে, তোমার সঙ্গে যুক্ত হতে এক কৌশল করছি। "যোগঃ কর্মসু কৌশলম্।" কৌশলে তোমাকে ধরব। জীব কৌশল আবিষ্কারের চিন্তায় মগ্ন হল। ধ্যানস্থ হল। সমাধিস্থ হল। এবার লীলাময় ব্রহ্ম করুণাময় হলেন জীবের একাগ্রতায়। এক অগ্র (বিষয়), অথবা এক অগ্র্য (প্রধান), অথবা এক (এক ব্রহ্ম) অগ্রে যার—তেমন একাগ্রতার বড়ই তীক্ষ্ণধার। তার কাছে দুর্ভেদ্য বলে কোন পদার্থ নেই। তার তীক্ষ্ণতার কাছে হার না মানে এমন কেউ নেই। এ অস্ত্রের শক্তিও ভগবৎ শক্তি। সময়ে অপরাজেয় ভীষ্ম যেমন স্নেহবশ হয়ে

স্বীয় বধের কৌশল ধর্মানুগামী পাণ্ডবদের বলে দিয়ে ছিলেন; অবাঙ্মনসগোচর শ্রীহরি তদ্রূপ করুণার্দ্র হয়ে বেদরূপ ধরে নিজ গুপ্ত গৃহে প্রবেশের গুপ্ত কৌশল সত্যসন্ধ ঋষিকে জানিয়ে দিলেন—

অণোরণীয়ান্মহতো মহীয়ান্
আত্মাস্য জন্তোর্নিহিতো গুহায়াম্।
তমক্রতুঃ পশ্যতি বীতশোকো
ধাতুপ্রসাদান্মহিমানমাত্মনঃ॥

—কঠ উপনিষদ ১।২।২০ ; শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ ৩।২০

অর্থ—এই পরমাত্মা পরমাণু প্রভৃতি সূক্ষ্ম বস্তু হতেও সূক্ষ্মতর, আকাশাদি মহৎ (বৃহৎ) পদার্থ হতেও মহত্তর (বৃহত্তর)। তিনি জীবের হৃদয়-গুহাতে প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থিত আছেন। কামনা-বিহীন ও শোকদুঃখবর্জিত ব্যক্তি ধাতুর প্রসন্নতাবশতঃ আত্মার মহিমা প্রত্যক্ষ করে বিগতশোক হয় (মানব জীবন সফল করে)।

এই মন্ত্র থেকে ব্রহ্মের গোপন আবাসের ঠিকানা জীব জানতে পেল। জানা গেল—হৃদয়গুহাতে হানা দিতে পারলে তাঁর নাগাল পাওয়া যাবে। আর জানা গেল, ধাতুর প্রসাদে পরমাত্মার দর্শনলাভ হবে। ভগবৎ সাক্ষাতের গুপ্ত রহস্য বেদের কৃপায় মানব অবগত হল। পরম পুরুষ কোথায় প্রচ্ছন্নভাবে লুকিয়ে আছেন, কি উপায়ে তাঁর সাক্ষাৎ মিলবে এ সব তথ্য জানা হল। তবু যেন রহস্যের জট পুরাপুরি খুলছে না। ব্রহ্ম নিজেই জানিয়ে দিলেন তিনি জীবের হৃদয়গুহাতে বা বুদ্ধিরূপ গুহাতে লুকিয়ে আছেন। তবে সেখানে গেলেই তো তাঁর সাক্ষাৎ পাবার কথা! না, সেরকম তিনি সোজা-সুজি দর্শনের কথা বললেন না। সব অন্ধিসন্ধি বলেও আসল সাক্ষাৎটা কে এক 'ধাতুর' দয়ার ওপর ছেড়ে দিলেন! দেখছি, ব্রহ্ম তাঁর লুকোচুরি-স্বভাব এখনো একেবারে ত্যাগ করতে পারেন

নি। গোপন গুহার চাবি খুলে দিয়েও ঢাকনাটি তুলে দেন নি। বললেন, ঢাকনা তুলতে হবে 'ধাতুঃ প্রসাদাৎ'। অর্থাৎ ধাতু প্রসন্ন হলে তবে ঢাকনা উঠবে, দর্শন পাবে। এ যেন এক রহস্য মোচন না হতে আর এক রহস্যের আবরণ। সর্ব কারণের কারণ ব্রহ্ম ইচ্ছে করলেই দর্শন দিতে পারেন। তিনি স্বাধীন স্বতন্ত্র স্বরাট। কোন ব্যাপারেই তিনি এযাবৎ কারো অপেক্ষা রাখেন নি। আজ তিনি আপন প্রসন্নতার কথা না বলে কেন ধাতুর প্রসন্নতার কথা বললেন! তেত্রিশ কোটি দেবদেবী মায় মহামায়া-যোগমায়া প্রভৃতি শক্তির কারো নাম না করে কেন ধাতু শব্দ ব্যবহার করলেন! মন বুদ্ধি ইন্দ্রিয় জ্ঞান বিবেক—এদের প্রসন্নতার কথা না বলে ধাতুর কথা বলার উদ্দেশ্য এবং রহস্যটি আমাদের জানতে হবে শাস্ত্রমুখে। এজন্য সহৃদয় পাঠককে অনুরোধ করব পূর্ববর্তী ১৮ পৃষ্ঠায় '(৪) ব্রহ্মচর্যেন নিত্যম্'.আলোচনা স্মরণ করতে, যেখানে দেখাগেছে, ব্রহ্মদর্শন সম্ভব হবে একমাত্র ওজো ধাতুর কৃপায়। আলোচ্য বেদমন্ত্রে শুধু ধাতু শব্দ বলা আছে। শ্রেষ্ঠতম বা শুদ্ধ-তম এরকম কোন বিশেষণ দেওয়া নেই। তবু শাস্ত্রবচনের প্রথা অনুযায়ী ধরে নিতে হবে শরীরের শ্রেষ্ঠতম ধাতু ওজোর কথা বলাই এ মন্ত্রের অভিপ্রায়। কারণ, শাস্ত্র যখন সত্ত্বগুণের কথা বলেন তখন উহা শুদ্ধ সত্ত্বগুণকেই বুঝায়, রজঃ মিশ্রিত সত্ত্বগুণকে বুঝায় না।

আমরা আর একবার ব্রহ্মচর্যব্রতের শক্তি-মাহাত্ম্য অনুভব করলাম এবং ব্রহ্মদর্শনের মূল উপকরণটি যে অখণ্ড অটুট বীর্য-শক্তি সে বিষয়ে সুনিশ্চিত হলাম। বীর্যরূপী সাকার ব্রহ্মকে ধারণ করলে নির্গুণ নিরাকার ব্রহ্ম আপনা হতেই ধরা দেন। তখন জ্ঞান বিবেক বৈরাগ্য ভক্তি প্রেম প্রভৃতি স্বর্গীয় ভাব আপনা হতেই হৃদয়ে ফুটে ওঠে। এদের জন্য তখন আর আলাদা করে

কোন সাধন করতে হয় না। সমগ্র উপনিষদ-শাস্ত্রের ভিতর এটি গুরুত্বপূর্ণ এবং গুহ্যতত্ত্বপূর্ণ মন্ত্র। যেকটি বিশেষ মন্ত্র একাধিক উপনিষদে দেখা যায় এটি তার অন্যতম। এ মন্ত্রের 'গুহায়াং' শব্দটিও সবিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। গুহা বলা হয় পর্বতগহ্বর বা কন্দরকে, যার প্রবেশ এবং নির্গমনের একটিই মাত্র পথ বা মুখ। কোন প্রকারে ঐ গুহামুখ বন্ধ করতে পারলে বা আগলাতে পারলে অন্য কারো পক্ষে প্রবেশ বা নির্গমন সম্ভব হয় না। বেদ-ভগবান গুহা শব্দ ব্যবহার করে বলে দিলেন—ব্রহ্মচর্য পালন দ্বারা ধাতুপাত বা বীর্য-পতনরূপ গুহামুখ বন্ধ করে দিলেই হৃদয়গুহা হতে ভগবানের বহির্গমনের পথ চিরতরে বন্ধ হয়ে যাবে। শ্রীহরির পালাবার কোন পথ থাকবে না। নিরাকার ব্রহ্ম এবার গুহা-কারাগারে বন্দী। এরূপ আরো রহস্য এ মন্ত্রে আছে।

ঐ ওজো ধাতুই যে শরীরের সর্বশ্রেষ্ঠ ধাতু সর্বশক্তিমান পদার্থ তার প্রমাণ সামবেদের পূর্বার্চিকের আগ্নেয় কাণ্ডের ১১শ মন্ত্র—**'ওঁ নমস্তে অগ্ন ওজসে গৃণন্তি দেব কৃষ্টয়ঃ'** **– হে অগ্নি, মানুষেরা ওজঃ শক্তির জন্য নত হয়ে তোমার স্তব করে।। এই মন্ত্রে আত্মা-ব্রহ্মকে অগ্নি [অগি ধাতু (গতি অর্থে) + নি কর্তৃ] বলা হয়েছে। যিনি অগি-যুক্ত বা গতি-যুক্ত হয়ে তাঁর বৃদ্ধিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে থাকেন তিনিই অগ্নি। অর্থাৎ যিনি ঊর্ধ্বদিকে গমন করেন, বহন করেন, আমাদের ঊর্ধ্বদিকে নিয়ে যান—এই অর্থে আত্মাকে অগ্নি বলা হয়েছে। ওজঃশক্তিই আত্মার ঊর্ধ্ব-গামী শক্তি। আত্মাকে ঊর্ধ্বগামী করার নিমিত্ত ব্রহ্মের নিকট ওজঃ-শক্তির জন্য এই প্রার্থনা-মন্ত্র। কারণ, ওজঃশক্তি না হলে জ্ঞান-চক্ষু খুলবে না। ভগবান ইচ্ছে করলেই আমাদের সামনে এসে দাঁড়াতে পারেন। কিন্তু তিনি এলেও আমি তাঁকে দেখতে পাব না যদি তাঁকে দেখার মত দিব্যদৃষ্টি আমার না থাকে। একমাত্র

ওজঃধাতুর প্রভা-প্রভাবেই মানবের তৃতীয় নয়ন জ্ঞানচক্ষু খুলে যায়।[১] বিশ্বরূপ দর্শনের সময়ে কৃপাকরে ভগবান কৃষ্ণ অর্জুনকে দিব্যচক্ষু দিয়ে ছিলেন। আমাদের দেহস্থিত ওজঃশক্তিই অন্তর্যামী ভগবানের কৃপা শক্তি। জীবের আর কোন সাধনের আবশ্যক হয় না যদি বীর্যব্রহ্মকে অটুট অব্যয় রাখতে পারে। যতটুকু সাধনের প্রয়োজন তা শুধু বীর্য ধারণের জন্যই। ভগবান সাধনলভ্য নন, তিনি কৃপালভ্য—এ কথা বারবার শাস্ত্রমুখে শুনেও আমরা সাধনের মূল উদ্দেশ্য বুঝতে পারছি না। ওজঃশক্তিতে শক্তিমান বলবান হতে পারলেই ভগবান তাকে কৃপা করেন, তার কাছে ধরা দেন। জপ তপ মন্ত্র তন্ত্র বা অন্য কোন উপায়েই তাঁকে লাভ করা যায় না—এ বেদেরই কথা।

নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো
ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ
আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বাম্‌॥

—কঠ উপনিষদ ১।২।২৩ ; মুণ্ডক উপনিষদ ৩।২।৩

অর্থ—বেদাধ্যয়ন দ্বারা এই আত্মাকে লাভ করা যায় না। মেধা অথবা বহু শাস্ত্রশ্রবণ দ্বারাও এঁকে লাভ করা যায় না। এই আত্মা যাঁকে বরণ করেন (যাঁকে যোগ্য বলে গ্রহণ করেন) তিনিই এঁকে লাভ করেন। তাঁর নিকট এই আত্মা স্বীয় স্বরূপ ও মহিমা প্রকাশ করেন।

ব্রহ্ম কাকে বরণ করেন, কাকে যোগ্য বলে গ্রহণ করেন, কি গুণে এই যোগ্যতা হয়, এসব প্রশ্নের উত্তর হল ঐ ওজঃ। ইনিই দেহস্থিত যোগমায়া শক্তি। দেহে থেকে জীবাত্মার সঙ্গে পরমাত্মার মিলন ঘটিয়ে দেন। পরমাত্মার সঙ্গে জীবাত্মার এই পরম মিলন ঘটান বাইরের কোন শক্তি দ্বারা কভু সম্ভব নয়। এটা বাইরের

কোন ব্যাপারই নয়। যার দেহে ওজঃশক্তি আছে শক্তিমান তাকেই বরণ করেন।

সামবেদে যে ওজঃশক্তির জন্য অগ্নির উদ্দেশে প্রার্থনা-মন্ত্র দেখা গেল সে বিষয়ে একটু বলার আছে। পণ্ডিতগণের মতে সামবেদই বেদের সারসংকলন। গীতায় শ্রীভগবান বলেছেন—**বেদানাং সামবেদোঽস্মি**—বেদসমূহের মধ্যে আমি সামবেদ (১০।২২)। সুতরাং সামবেদের শ্রেষ্ঠতা প্রশ্নাতীত। এই সামবেদ শুরু হয়েছে অগ্নিস্তুতি দিয়ে। এর প্রধান কারণ, সৃষ্টি বা প্রাণের উৎস অগ্নি বা সূর্য। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যেমন সূর্য হতে জন্ম নিয়েছে, বিশ্বের তাবৎ প্রাণীকুলও তেমনি সূর্যের তেজ হতে প্রাণ পেয়েছে। তাপশক্তিই প্রাণ-শক্তি। শরীরে তাপ নেই তো প্রাণও নেই। অগ্নিই ব্রহ্মের তথা প্রাণের প্রধান প্রতিভূ। সেকারণ আর্যঋষিগণ সর্বাগ্রে অগ্নিদেবতার স্তুতি করেছেন। ভুবন-বিখ্যাত গায়ত্রী মন্ত্রে সূর্যেরই উপাসনা করা হয়েছে। ত্রিগুণাত্মিকা ব্রহ্মের গুণ তিনটি আমরা অগ্নির ভিতরও প্রত্যক্ষ করি। অগ্নির দাহিকাশক্তিরহিত প্রথম নীল অংশ তার সত্ত্বগুণ, তার উপর দাহিকাশক্তিপূর্ণ উজ্জ্বল অংশ রজঃ গুণ। তার উপর ধূমাকার অংশ তমঃ গুণ। অগ্নিব্রহ্ম বিনা বিশ্বে প্রাণ থাকে না, মহাযজ্ঞ (আহার) প্রস্তুত হয় না। খাদ্য খেলেও অগ্নি-ভগবানের কৃপা ছাড়া তা হজম হয় না। কোন দেবকার্য সম্পন্ন হয় না। অগ্নিই প্রাণ। অগ্নিই ব্রহ্ম। অগ্নি-উপাসনা সম্পর্কে শুধু বেদ-উপনিষদেরই নির্দেশ নয়, শ্রীমদ্ ভাগবতের উপদেশ আরো স্পষ্ট, আরো ব্যাপক।

অগ্নৌ গুরৌ আত্মনি চ সর্বভূতেষু অধোক্ষজম্।
ভূতৈঃ স্বধামভিঃ পশ্যেৎ অপ্রবিষ্টং প্রবিষ্টবৎ॥

৭।১২।১৫

অর্থ—সর্ববিধ আশ্রমী ব্যক্তিই অগ্নি গুরু আত্মা এবং সর্বভূতে অপ্রবিষ্ট বিষ্ণুকে স্বাশ্রয় জীবাত্মার সহিত প্রবিষ্টের ন্যায় দেখবে।

এখানে শুধু ব্রহ্মচারীর কথা বলা হয় নি। গৃহস্থ, বানপ্রস্থী, সন্ন্যাসী সকলেই অগ্নিকে ব্রহ্মজ্ঞান করবেন। ভাগবত আরো বলেছেন—

অগ্নির্মুখং যস্য তু জাতবেদা,
জাতঃ ক্রিয়াকাণ্ডনিমিত্তজন্মা।
অন্তঃ সমুদ্রেঽনুপচন্ স্বধাতূন্,
প্রসীদতাং নঃ স মহাবিভূতিঃ॥ ৮।৫।৩৫

অর্থ—যে অগ্নি হতে বেদরূপ ধন উৎপন্ন হয়, ক্রিয়াকাণ্ড (বেদ-প্রতিপাদ্য কর্ম) সম্পাদনের নিমিত্ত যাঁর জন্ম, উদর মধ্যে অন্নাদিকে যিনি পরিপাক করেন, সেই অগ্নি যাঁর মুখ, সেই মহাবিভূতিশালী ভগবান আমাদের প্রতি প্রসন্ন হউন।

গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ একাধিকবার অগ্নির স্বরূপ ব্যক্ত করেছেন। **'অহং অগ্নিঃ অহং হুতম্'** (আমি অগ্নি আমিই হোম, ৯।১৬)। **'বসূনাং পাবকশ্চাস্মি'** (অষ্ট বসুর মধ্যে আমি অগ্নি, ১০।২৩)। অষ্টবসু—আপ, ধ্রুব, সোম, ধর, অনিল, অনল, প্রত্যুষ ও প্রভাস।

বৈষ্ণবদের অবশ্য করণীয়রূপে শক্তিপূজা, হোম-যাগ প্রভৃতি নিয়ে যে আলোচনা হল তার সঙ্গে মুণ্ডক উপনিষদের নিম্নোক্ত মন্ত্রটির মর্মার্থ অনুধাবন করলে বিষয়টির যথার্থ মূল্যায়ন সম্ভব হতে পারে এবং লোলজিহ্ব কালীকরালীর তত্ত্ব-রহস্যও উদ্‌ঘাটিত হতে পারে। তন্ত্রসাধনার অষ্টসিদ্ধির জলুস দেখে কখনো কখনো আমাদের চমক লাগে বটে, কিন্তু যদি মহামায়ার ঐ মায়াজাল কেটে একটিবার শ্রীমদনমোহনের দরজা পর্যন্ত পৌঁছা যায় তবে দেখাযাবে এখানে অমন কতশত ঋদ্ধি সিদ্ধি শ্রীগোবিন্দের আঙিনার

ধূলাতে গড়াগড়ি যাচ্ছে। এখানে আরো দশ-দশটা সিদ্ধি বেশী আছে। অর্থাৎ গোবিন্দের কাছে অষ্টাদশ সিদ্ধি আছে। আটের লোভ ছাড়তে পারলেই আঠারো-লাভ (ভাগবত ১১।১৫।৩ -৩৫শ শ্লোকাদি দ্রষ্টব্য)। মুণ্ডক উপনিষদের মন্ত্রটি হচ্ছে—

কালী করালী চ মনোজবা চ
সুলোহিতা যা চ সুধূম্রবর্ণা।
স্ফুলিঙ্গিনী বিশ্বরুচী চ দেবী
লেলায়মানা ইতি সপ্ত জিহ্বাঃ॥ ১।২।৪

অর্থ—কালী, করালী, মনোজবা, সুলোহিতা, সুধূম্রবর্ণা, স্ফুলিঙ্গিনী ও দীপ্তিশালিনী বিশ্বরুচী—অগ্নির এই সাতটি লেলিহান জিহ্বা (আহুতি গ্রহণে সমর্থ)।

বাক্যমনের অগোচর সেই একমাত্র বৃহৎ পরমব্রহ্মই যে নির্বিকল্প সত্য ও ফলপ্রকাশরূপ মায়া, এই দুই প্রকার হলেন—এ তো কোন তন্ত্রশাস্ত্রের কথা নয়, সাক্ষাৎ ভগবানের কথা :—

তন্মায়া ফলরূপেণ কেবলং নির্বিকল্পিতম্।
বাঙ্মনোঽগোচরং সত্যং দ্বিধা সমভবদ্‌বৃহৎ ॥

ভাগবত ১১।২৪।৩

গৌড়ীয় বৈষ্ণবমতের সঙ্গেও যে তন্ত্র বা আগমের কোন প্রকার দ্বন্দ্ব-দ্বিমত নেই তার উজ্জ্বল প্রমাণ তাঁদেরই প্রামাণিক শাস্ত্র শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে জ্বলজ্বল করছে। অন্ত্যলীলার উনবিংশ পরিচ্ছেদের ২৫শ ও ২৮শ পয়ার দ্বয়—

প্রভু কহে আচার্য্য (অদ্বৈতাচার্য) হয় পূজক প্রবল।
আগম-শাস্ত্রের বিধি বিধানে কুশল॥

*   *   *   *   *   *

মহাযোগেশ্বর আচার্য্য তরজাতে সমর্থ।
আমিও বুঝিতে নারি তরজার অর্থ॥

নির্গুণব্রহ্ম সগুণ বা মায়ারূপ পরিগ্রহ করেছেন জীবকে কৃপা করার জন্য। কেবল সগুণ ব্রহ্মের কৃপায় আমরা নির্গুণ ব্রহ্মে প্রবেশ করতে পারি, তাঁকে অনুভব করতে পারি আস্বাদন করতে পারি। মহামায়া-যোগমায়া কৃপা না করলে, পূর্ণতম ব্রহ্মের সংবাদ না দিলে, ব্রহ্মের সঙ্গে জীবকে যুক্ত করে না দিলে জীবের কি শক্তি বা সাধনা আছে যে সে পরমব্রহ্মের রস আস্বাদন করে! একমাত্র শক্তি বা মায়া-ই জীবকে শক্তিমানের কাছে পৌঁছে দেন। মায়া মহতীবৃত্তি-যুক্তা অর্থাৎ জীবকে ঈশ্বরসান্নিধ্য করার বৃত্তিযুক্তা হলেই তখন তিনি মহামায়া বা যোগমায়া।

এই সমস্ত শাস্ত্রবাক্য-ভগবদ্‌বাক্যের মুখ্য উদ্দেশ্য জীবকে—, আমাদিগকে ভগবদ্‌মুখী করান। ভগবৎ-মুখী হতে হলে সামনে ভগবানকে চাই। নইলে কার মুখোমুখী হব! অপর কারো মুখ সামনে না থাকলে শুধু আমার একখানা মুখ নিয়ে তো আর মুখোমুখী হওয়া চলে না! তাই ভগবানের অভিন্ন কলেবর শ্রীমদ্ভাগবত কৃপাপূর্বক 'অগ্নিঃমুখং যস্য'—অগ্নি যাঁর মুখ (৩৪ পৃষ্ঠা দেখুন) বাক্যে জানিয়ে দিলেন অগ্নিরূপ শ্রীভগবানের মুখ আমাদের সামনেই আছে। অগ্নির স্বরূপ জানি না তাই ভগবানের মুখ দেখতে পাই না। তাঁর মুখ চিনতে পাচ্ছি না বলে মুখোমুখী হতেও পারছি না। ফলে ভগবৎ-মুখী হওয়া হয়ে উঠছে না। আমরা ভগবানের অন্য কোন বিভূতি বা রূপ চিনতে ভুল করতে পারি, কিন্তু অগ্নিদেবতাকে চিনতে—ভগবানের শ্রীমুখ চিনতে ভুল হবার কথা নয়। অগ্নিদেবতার সঙ্গে আমাদের অচ্ছেদ্য সম্পর্ক। তাঁকে হাতের কাছে পেতে আমাদের কোন সাধনারই আবশ্যক হয় না। আবশ্যক শুধু আমাদের সদিচ্ছার। ভগবানকে সামনে রেখে তাঁকে খুঁজে মরছি না কি! ভগবান কিন্তু সর্বদাই উপস্থিত, শুধু আমিই অনুপস্থিত, আমার দৃষ্টিশক্তি অনুপস্থিত। ভগবৎ লীলা, ভগবৎ মহিমা, ভগবৎ রূপ, ভগবৎ ধাম স্থূল দৃষ্টিতে

কভু দেখা যায় না। বৃন্দাবন সহর দর্শন আর শ্রীবৃন্দাবন ধাম *দর্শন সম্পূর্ণ ভিন্ন বস্তু। এ বিষয়ে শ্রুতি বলেন—

এষঃ সর্বেষু ভূতেষু গূঢ়ঃ আত্মা ন প্রকাশতে।
দৃশ্যতে ত্বগ্র্যয়া বুদ্ধ্যা সূক্ষ্ময়া সূক্ষ্মদর্শিভিঃ।।

—কঠ উপনিষদ ১।৩।১২

অর্থ—যে পুরুষকে জীবের সর্বোত্তম গতি বলা হয়েছে তিনি আত্মারূপে সর্বভূতে প্রচ্ছন্ন (গুপ্ত) আছেন বলে সকলের নিকট প্রকাশ পান না। (অর্থাৎ সকলে এঁকে স্বীয় আত্মারূপে জানতে পারে না।) যে সকল জ্ঞানীলোকের বুদ্ধি সাধনা দ্বারা বিশুদ্ধ ও সূক্ষ্মবস্তু দর্শনের যোগ্য হয়েছে সেই অগ্র্যবুদ্ধি ব্যক্তিগণই তাঁদের নির্মল ও সূক্ষ্মবুদ্ধি দ্বারা পরমাত্মাকে প্রত্যক্ষ করেন।

'অগ্র্য' শব্দের অর্থ অগ্রবর্তী অথবা অগ্রেজাত (শ্রেষ্ঠ)। অগ্র্য-বুদ্ধির অর্থ সংস্কৃত শোধিত শুদ্ধ সূক্ষ্ম বুদ্ধি। এখানে সত্যদৃষ্টিক্ষম অতীন্দ্রিয় দৃষ্টি যা সবরকম বাধা ভেদ করে অগ্রে গমন করত অন্তর্যামীকে প্রত্যক্ষ করতে পারে। আত্মা সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম। স্থূলের ক্ষমতা নেই যে সে সূক্ষ্মের ভিতর প্রবেশ করে। যেমন, একটা খুব ছোটমুখের পাত্রে চিনি রাখা আছে। বড় চামচে দিয়ে সে চিনি তোলা যাবে না কারণ, পাত্রের মুখের চেয়ে চামচেটা বড়। চিনি তুলতে হলে পাত্রের মুখের চেয়ে চামচেটা ছোট হওয়া চাই। আমরা সূচে সূতো পরিয়ে সেলাই করি। সূচের ছেঁদার চেয়ে সূতো মোটা হলে সূচে পরান যাবে না। সূক্ষ্ম ছেঁদার ভিতর প্রবেশ করাতে হলে সূতো ছেঁদার চেয়ে সূক্ষ্মতর হওয়া চাই। আত্মা সকল সূক্ষ্মতম বস্তু অপেক্ষাও সূক্ষ্ম। অতীব সূক্ষ্ম। এই আত্মার ভিতরে প্রবেশ করতে—তাকে প্রত্যক্ষ করতে অতীন্দ্রিয় দৃষ্টিযুক্ত অগ্র্যবুদ্ধি ছাড়া অন্যের সামর্থ্য নেই। অগ্র্যবুদ্ধির শক্তিসামর্থ্যের একটা ধারণা করতে আধুনিক রঞ্জন রশ্মির অস্বচ্ছ ও স্থূল বস্তু ভেদ

করে তার ভিতরকার বস্তুকে দৃশ্যমান করার ক্ষমতার সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে।

এই তত্ত্ব-নীতি অনুযায়ী ধর্ম ও সংস্কৃতির অনুশীলনে যতই সূক্ষ্মতম মননশীলতা থাকবে, আমাদের কৃষ্টি-কলা-আদর্শ ততই ব্রহ্ম-সংস্পৃষ্ট হয়ে কালজয়ী হবে। প্রাচীন সত্যদ্রষ্টা আর্য-ঋষিদের এই প্রকার সূক্ষ্মতম মননশীলতা ছিল বলেই তাঁদের প্রতিটি ভাব চিন্তা কর্ম অমরত্ব লাভ করেছে। তাঁদের প্রদর্শিত পথ যুগযুগান্তরের ব্যবধানে আজও অভ্রান্ত প্রমাণিত। এর মূল কারণ তাঁরা সত্যে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, সত্যকে দর্শন করে ছিলেন। সত্যময় হয়ে গিয়েছিলেন। সত্যই ব্রহ্ম। সে কারণ তাঁরা ব্রহ্মময় হয়ে ছিলেন। ব্রহ্ম ভ্রম-ভ্রান্তি বর্জিত। ঋষিদেব চিন্তাও তাই ভ্রম প্রমাদ বর্জিত। অভ্রান্ত। চিবসত্য।

ব্রহ্মচর্যাশ্রম হতে বিদায়কালে আচার্য তাঁর ব্রহ্মজ্ঞানী শিষ্যদের কর্তব্য সম্বন্ধে সাবধান করে দিয়ে উপদেশ দিতেন—
সত্যং বদ (সত্যকথা বলবে)। **ধর্মং চর** (ধর্ম আচরণ করবে)।
স্বাধ্যায়াৎ মা প্রমদঃ (বেদপাঠে অমনোযোগী হবে না)।
সত্যান্ন প্রমদিতব্যম্ (সত্যানুষ্ঠানে অমনোযোগী হবে না)।
ধর্মাৎ ন প্রমদিতব্যম্ (ধর্মাচরণে অমনোযোগী হবে না)।

তৈত্তিরীয় উপনিষৎ ১।১১।১

* * * *

এই বেদমন্ত্রের সতর্কবাণী বিশেষভাবে লক্ষণীয়। এক জন ব্রহ্মজ্ঞানী শিষ্যের পক্ষে যদি বেদপাঠ অবশ্য কর্তব্য হয়, তবে যারা ব্রহ্মজ্ঞান লাভে ইচ্ছুক তাদের পক্ষে বেদপাঠ কতটা জরুরী তা খুলে বলার কি কোন আবশ্যকতা আছে? আমাদের ধর্মের মূল উৎস বেদ। সেই মূল থেকে সম্পর্কচ্যুত, সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন

হয়েছি বলেই আজ আমরা সত্যভ্রষ্ট হয়েছি। কথায় বলি, ধর্ম ধার্মিককে রক্ষা করে। কিন্তু আমরা কি ধর্মকে রক্ষা করছি? ধর্মকে আমরা রক্ষা করব না, অথচ রক্ষা পেতে চাইব—এটা কি কোন যুক্তি-তত্ত্ব মেনে নেবে? ধর্ম কি বস্তু? একটু আলোচনা করলেই দেখা যাবে সত্যই পরম ধর্ম। উপনিষদ ব্রহ্মের যে তিনটি রূপ বর্ণন করেছেন—সত্যস্বরূপ জ্ঞানস্বরূপ অনন্তস্বরূপ (**সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম**) তার মধ্যে সত্যই অগ্রগণ্য। কারণ ব্রহ্মের সত্যস্বরূপ অনুভব না হলে তাঁর জ্ঞানস্বরূপ বা অনন্তস্বরূপ অনুভব হবে না। সত্যে প্রতিষ্ঠিত না হলে আনন্দে বা জ্ঞানে প্রতিষ্ঠা লাভ করা যাবে না। আনন্দ আস্বাদন করা যাবে না। সত্য কি বস্তু তা বুঝাতে গিয়ে ভগবান উদ্ধবকে বলছেন —

যদুপাদায় পূর্বস্তু ভাবো বিকুরুতেঽপরম্।
আদিরন্তো যদা যস্য তৎ সত্যমভিধীয়তে॥

ভাগবত ১১।২৪।১৮

অর্থ—যে পূর্বভাব (কারণ) পরভাব কার্যরূপে পরিণত হয় এবং যে কারণ কার্যের আদি ও অন্তে থাকে, তাই সত্য বলে অভিহিত হয়।

দেখাগেল সত্যই জগতের আদি কারণ। আমাদের ভজনের আদি কারণও সত্য। সত্য উপলব্ধি করা যেমন আদি কর্তব্য, আবার অন্তেও সেই মহাসত্যের উপলব্ধি। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সত্য উপলব্ধির মধ্যদিয়ে মহাসত্যে পৌঁছতে হয়। এক দিনেই কারো মহাসত্য বা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয় না। সত্যের ভিতরই ধর্ম্ম নিহিত, ব্রহ্ম নিহিত। একারণেই শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম শ্লোকে ধ্যানরূপ প্রণাম জানাতে বললেন—**সত্যং পরং ধীমহি—সেই সত্যস্বরূপ-লক্ষণময় পরমেশ্বরকে আমরা ধ্যান করি।

যে কোন দেশের প্রাচীনতম কৃষ্টির তত্ত্বানুসন্ধান করলেই দেখা যাবে সেই কৃষ্টির দীর্ঘায়ুলাভের মূলে রয়েছে সত্যের সঙ্গে তথা

ধর্মের সঙ্গে আত্মিক যোগ। ঈশ্বরতত্ত্বানুসন্ধান চলছে মানব সভ্যতার আদিম লগ্ন থেকে প্রায় প্রতি দেশে প্রতি জাতির ভিতরে। এবং চলবে যত দিন মানব সমাজ আছে। যেদিন ঈশ্বরের সঙ্গে মানবের যোগসূত্র ছিন্ন হবে সেদিন মানব সভ্যতার অবলুপ্তি। ঈশ্বর-তত্ত্বানুসন্ধানের ধারা যুগপ্রভাবে কভু স্ফীত কভু ক্ষীণ হতে পারে। কিন্তু এর মৃত্যু নেই। এই অমর ধারার সঙ্গে কোন কৃষ্টি বা সংস্কৃতির যোগ থাকলে তাও অমরত্ব পায়। একমাত্র সত্যধর্ম এই যোগসূত্র রচনা করতে সক্ষম। বর্তমান বৈজ্ঞানিক যুগেই যেন আমরা বেশী বিভ্রান্ত। বিজ্ঞান সত্যনির্ভর, তা জেনেও আমরা সত্যে নিস্পৃহ। ততোধিক—সত্যের কদর্থ করেই যেন আমরা আমাদের কর্তব্য শেষ করি! এমনই সত্যহীনতার যুগ চলছে যে,এখন কেউ সদাচারী সত্যভাষী হলে সমাজে সে উপেক্ষিত ধিক্কৃত। এই পটভূমিতে এ আলোচনা কতটুকু অর্থবহ হবে তা ঈশ্বরই জানেন। 'ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা'-এই মহাবাণীর বুঝি বর্তমান ভাবার্থ হচ্ছে—সত্যসংকল্প হলে আর তাকে এজগতে বাস করতে হবে না; এজগতে মিথ্যার রাজত্ব, মিথ্যার আধিপত্য! এমনই বিকৃত আজ আমাদের চিন্তা-ভাবনা! পাপের প্রদীপ ক্ষণিকের জন্য একটু বেশী তেজেই জ্বলে। কিন্তু তার আসন্ন মৃত্যুর দিকে আজ কজনার দৃষ্টি পড়ে! মরজগতের বাহাদুরী এখানেই যে আমরা অমরত্বের পথ পরিহার করে মৃত্যুর পথে চলতেই বেশী লালায়িত। সত্যভ্রষ্ট হবার জন্যই সংসার-জীবনের সর্বক্ষেত্রেই যে সর্বদা আমরা বিফল হচ্ছি নিম্নগামী হচ্ছি তা দেখেও, দুঃখ অপমানের শতজ্বালায় জ্বলেও যখন আমাদের হুঁশ হচ্ছে না, তখন কোন্ ঔষধে যে আমাদের মোহনিদ্রা ভাঙ্গবে তা একমাত্র বিধাতাই জানেন! গীতার উপদেশামৃতের সূচনা হয়েছিল বিভ্রান্ত অর্জুনের বিষাদ যোগ দিয়ে কুরুক্ষেত্র সমরাঙ্গনে। আমাদের সে লগ্ন যদি এখনো না এসে থাকে তবে কি এর চেয়েও

ভয়াবহ বিষাদ আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে ! সে কথা ভাবতেও শিউরে উঠতে হয় ! আমরা কি ঈশ্বরকে ত্যাগ করে ত্যাগেশ্বর হতে চলছি ।

আরো একটি বেদনার কথা। কিছু বন্ধুদের দেখছি, ব্রাহ্মণ-বর্ণের প্রতি তাদের যেন একটু বিরূপভাব। তাদের বক্তব্য—অধ্যাত্মবিদ্যা প্রচলন শাস্ত্র-প্রণয়ন বৈদিক ক্রিয়াকর্মাদির বিধান এসবই ব্রাহ্মণদের সৃষ্টি নিজ বর্ণের স্বার্থে। সুতরাং ধর্মাচরণে ব্রাহ্মণ-বর্ণের আনুগত্য স্বীকার করার কোন নৈতিক যুক্তি বা আধ্যাত্মিক দায়দায়িত্ব নেই। এই কল্পিত ধারণা এক দিকে তত্ত্ববিষয়ে অজ্ঞতা প্রকাশক, অন্য দিকে মনের অসূয়া শ্রদ্ধাহীনতা সঙ্কীর্ণতা বৃদ্ধি-কারক। মনের এই ভাব শুধু ব্রহ্মজ্ঞান কেন, যে কোন প্রকার জ্ঞান লাভের পরিপন্থী। মন হবে গুণগ্রাহী। বিচার হবে গুণের। পদ্ম পঙ্কে জন্মিলেও দেবভোগ্য। বিষফল হিমালয়ে জন্মালেও বর্জনীয়।

আমরা ত্রিসন্ধ্যা যে তিন-নাথের নাম জপ করি— হর কৃষ্ণ রাম— তাদের দুজনই অবতীর্ণ হয়েছেন অব্রাহ্মণ কুলে। যিনি বেদ বিভাগ করে চতুর্বেদ সংকলন করেছেন, সমস্ত পুরাণ-শাস্ত্র লিখে-ছেন, পরম রসিকের চরম তৃষা মেটাতে গোপ্য-গোপীপ্রেমের রসতত্ত্ব নিভৃত নিকুঞ্জ হতে আহরণ করে শ্রীভগবানের অঙ্গস্বরূপ ভাগবতে পরিবেশন করেছেন এক কথায় সর্বশাস্ত্র যাঁর উচ্ছিষ্ট সেই মহামতি ব্যাসদেবের জন্ম অব্রাহ্মণ যোনিতে। ভক্তিসূত্রের মূল প্রবক্তা দেবর্ষি নারদের পরিচয় দাসীপুত্ররূপে। এর পরেও কি বলা যাবে হিন্দুধর্ম ব্রাহ্মণবর্ণের সৃষ্টি বা পক্ষপুটে ! তবে হাঁ, তাঁরা ব্রাহ্মণ ছিলেন—জন্মসূত্রে নয়, ব্রহ্মজ্ঞানে। তবু যদি প্রশ্ন থাকে—হিন্দু ধর্মকে ব্রাহ্মণ্যধর্ম বলে কেন ? তার উত্তরে বলা যায়—একমাত্র হিন্দুধর্মেই পূর্ণ ব্রহ্মজ্ঞান লাভের সর্ববিধ উপকরণ

আছে পূর্ণ চাঁদের ষোল কলার মত। পৃথিবীর অপরাপর ধর্মে এক বা একাধিক কলা বিদ্যমান। হিন্দুধর্ম বা আর্যধর্মই মূলবৃক্ষ, অপরাপর ধর্ম শাখা-উপশাখা মাত্র। ধর্মবৃক্ষের মূলকে জানতে হলে এখানে আসতেই হবে। কেবলমাত্র আমাদের এই প্রাচীনতম সনাতন সাত্বত ধর্ম্ম ব্রহ্মবিদ্যা বা ব্রাহ্মণত্ব প্রদানে সমর্থ বলেই একে ব্রাহ্মণ্য (ব্রাহ্মণ+ষ্যঞ্ ভাবে) ধর্ম বলা হয়। ব্রাহ্মণ বর্ণের সৃষ্ট এ অর্থে নয়। তবে আর্যধর্ম নিশ্চয়ই ব্রাহ্মণের সৃষ্টি যাঁরা ব্রহ্মকে জেনে ব্রাহ্মণ (ব্রহ্মন্+অণ্ জ্ঞাতার্থে) হয়ে ছিলেন। শুধু মাত্র কুলগৌরবে যাঁরা ব্রাহ্মণ তাঁদের দ্বারা এ ধর্ম সৃষ্টি হয় নি। ব্রহ্মকে জানবার অধিকার আপনার আমার সকলারই আছে। এতে জাতি জন্ম বর্ণ কুলের বাধা শাস্ত্র কখনই স্বীকার করেন নি।

একটু আগে উপনয়ন-সংস্কার আলোচনাকালে আমরা দেখেছি, আদিতে সকলেই ব্রাহ্মণ ছিলেন। পরে বর্ণ-বিভাগ হয়েছে। এই বর্ণবিভাগ যে ব্যক্তিগত কর্ম ও গুণের ভিত্তিতেই হয়ে ছিল, জন্মসূত্রে নয় তার সুলভ প্রমাণ গীতার ভগবৎ বাণী।

চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্মবিভাগশঃ।
তস্য কর্তারমপি মাং বিদ্ধ্যকর্তারমব্যয়ম্॥

গীতা ৪।১৩

অর্থ —(শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলছেন) বর্ণ চতুষ্টয় গুণ ও কর্মের বিভাগ অনুসারে আমি সৃষ্টি করেছি বটে, কিন্তু আমি উহার সৃষ্টিকর্তা হলেও আমাকে অকর্তা ও বিকাররহিত বলেই জেনো।

ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং শূদ্রাণাঞ্চ পরন্তপ।
কর্মাণি প্রবিভক্তানি স্বভাবপ্রভবৈর্গুণৈঃ॥

গীতা ১৮।৪১

অর্থ—হে পরন্তপ, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্রদিগের কর্মসমূহ প্রকৃতিজাত ত্রিগুণানুসারেই পৃথক্ পৃথক্ রূপে বিভক্ত হয়েছে।

এরূপ বিভাগ যে জন্মগত কারণে নয়, শুধু ব্যক্তিগত গুণ ও স্বভাব-বিচারে তা আরও স্পষ্ট হয় ঋগ্‌বেদের নবম মণ্ডলের ১১২শ সংখ্যক মন্ত্র হতে। উহার মর্মার্থ সংক্ষেপে উদ্ধৃত করা হল—

"হে সোম, সকল ব্যক্তির কার্য একপ্রকার নয়। আমাদিগের কার্যও নানাবিধ। দেখ, তক্ষ (সূত্রধর) কাঠ তক্ষণ করে, বৈদ্য রোগের প্রার্থনা করে, স্তোতা যজ্ঞকর্তাকে চায়। দেখ, আমি স্তোত্রকার (ব্রাহ্মণ), আমার পুত্র চিকিৎসক (বৈশ্য), আমার কন্যা যবভর্জনকারিণী (শূদ্র)।"

এখানে দেখা যাবে, একই পরিবারের বিভিন্ন ব্যক্তি নিজ নিজ কর্মানুসারে বিভিন্ন বর্ণান্তর্গত হয়েছে। এর পর এসেছে জাতি-ভেদ। বর্ণভেদ এবং জাতিভেদ দুটি পৃথক বস্তু। বর্ণভেদ হয়েছে গুণ এবং কর্মানুসারে ভগবান কর্তৃক। জাতিভেদ হয়েছে জন্মসূত্রে সমাজ কর্তৃক। শাস্ত্র বলেছেন, রাজসূয় যজ্ঞে ব্রাহ্মণের অধিকার নেই। কিন্তু ক্ষত্রিয়রাজ বিশ্বামিত্রের ব্রাহ্মণত্ব লাভে বাধা হয় নি। এর কারণ হল—তমঃ হতে রজে এবং রজঃ হতে সত্ত্বে যাওয়াই বিধি। কিন্তু এর বিপরীত গমন—সত্ত্ব হতে রজে গমন শাস্ত্রবিরুদ্ধ। বহু ক্ষত্রিয়ের ব্রাহ্মণত্ব লাভের ইতিহাস হরিবংশ এবং বিষ্ণুপুরাণ প্রভৃতি শাস্ত্রে পাওয়া যায়। হরিবংশের ৩২শ অধ্যায়ে দেখা যায়, পুরুবংশের (ক্ষত্রিয়) অন্তর্গত রাজা গৃৎসমতির পুত্ররা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন বর্ণের ছিল। মুনি-ঋষিরা সকলেই ব্রাহ্মণ কুল থেকে এসেছেন এমন কথা কোথাও নেই। শাস্ত্রে দেখা যায়, ঐতরেয় উপনিষদের দ্রষ্টাঋষির নাম মহিদাস। তাঁর মাতার নাম ইতরা। মাতার নাম অনুসারে ঋষি তাঁর উপনিষদের 'ঐতরেয় উপনিষদ' নামকরণ করেছেন, ইতরার পুত্র ঐতরেয়—এই অর্থে। পণ্ডিতগণের ধারণা, বৈদিক যুগের এ দুটি নাম উচ্চবংশের পরিচয় বহন করে নি। অতীতের কথা ছেড়ে দিয়ে বর্তমান ধর্মচেতনার

জন্মলগ্ন শ্রীমন্মহাপ্রভুর শুভাবির্ভাবকাল থেকে দেখা যাবে, সাধক বৈষ্ণব আচার্য ও গোস্বামী প্রভুদের অনেকেই অব্রাহ্মণ কুলের মুখোজ্জ্বল করে ধরায় অবতীর্ণ হয়েছেন। শূদ্রকুলে জন্ম নিয়ে অনেকেই ব্রহ্মজ্ঞানী হয়েছেন। বিদুর ও ধর্মব্যাধের কথা আগেই পেয়েছি। সুতরাং ধর্মজগতে কোন বর্ণবিশেষের একাধিপত্য কোনকালেই স্বীকৃতি পায় নি। স্বীকৃত হয়েছে গুণ-কর্ম-আচরণ। যেমন—

"গুণৈঃ সত্ত্বেন বিপ্রঃ, সত্ত্বরজোভ্যাং ক্ষত্রিয়ঃ,
রজস্তমোভ্যাং বৈশ্যঃ, তমসা শূদ্র ইতি।"

শাস্ত্রানুসারে চারবর্ণের পরিচয় এইরূপ—

ব্রাহ্মণ—যিনি ব্রহ্মতত্ত্ব জেনে অগ্নির মত সমাজকে শুদ্ধ-শোধন করে সুপথে নিয়ে চলেন। যজন যাজন অধ্যয়ন অধ্যাপনা দান প্রতিগ্রহ—এই ছয়টি তাঁর কর্ম।

ক্ষত্রিয়—যিনি শাসকরূপে অধিষ্ঠিত থেকে সমাজকে ক্ষত বা আঘাত থেকে ত্রাণ (রক্ষা) করেন। রাজ্যরক্ষা প্রজাপালন যজন অধ্যয়ন দান—এই পঞ্চবিধ কর্ম তাঁর। কিন্তু ভাগবতের ১১।১৭।৪৮শ শ্লোকে ক্ষত্রিয়কে ব্রাহ্মণবৃত্তি অর্থাৎ অধ্যাপনাদির ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে সময় বিশেষে।

বৈশ্য—যিনি বিশে বিশে অর্থাৎ প্রতিজনের সঙ্গে সম্বন্ধ রেখে প্রতিজনের প্রয়োজনীয় দ্রব্য বণ্টনের ব্যবস্থা করত নিজ প্রয়োজন মেটাবার জন্য পারিশ্রমিক রূপে সামান্য লাভে সন্তুষ্ট থাকেন। কৃষি গোরক্ষা বাণিজ্য—এই তিনটি তাঁর কর্ম।

শূদ্র—যিনি কায়িক পরিশ্রমদ্বারা, সেবামূলক কাজের দ্বারা নিজ অন্নসংস্থান করত সন্তুষ্ট থাকেন। এঁদের শুধু সেবাত্মক কর্ম। ভাগবতের ১১।৭১।১৯শ শ্লোকে শূদ্রকে দেব দ্বিজ এবং গোগণের সেবাধিকার দেওয়া হয়েছে। দেবসেবা বলাতে শূদ্রের ধর্মানু-

তাদের অধিকার স্বীকার করা হয়েছে।

বর্ণের বদলে জাতি শব্দের প্রচলন অনেক পরে হয়েছে। পিতার বর্ণগত পেশা আশৈশব দেখে দেখে পুত্রের মনের গতি স্বাভাবিক ভাবে সে দিকে মোড় নিল।

পুত্রের সাধনায় ও সাহায্যে পিতার শিল্পকলার মান উন্নত হতে লাগল। ফলে কর্ম বংশানুক্রমিক হতে আরম্ভ হল। এর পিছনে প্রধানতঃ দুটি শক্তি কাজ করেছে—এক, মানুষ অভ্যাসের দাস, এই সূত্রানুযায়ী পিতার কাজ দেখে দেখে, তাঁকে সাহায্য করতে গিয়ে পুত্র পিতার স্বভাব পেল। দুই, পিতার দৈহিক ও মানসিকতার ছাপ পুত্র জন্মসূত্রে লাভ করে। এই উভয় কারণেই কর্ম বংশগত পেশা হতে লাগল। সমাজব্যবস্থাপকরা দেখলেন—কুম্ভকারপুত্রের হাতে মৃৎশিল্পের যে উন্নতমান কৃষক-পুত্রের কাছ থেকে তা পাওয়া যায় না। যাজক ব্রাহ্মণ-কুমারের যেমন মন্ত্র-উচ্চারণ তেমনটি অপরের দ্বারা হচ্ছে না। তা ছাড়া জীবনযাপনের মান উন্নত করার জন্য নূতন নূতন জীবিকার সৃষ্টি হল। সে সব একই মানুষ বা একই পরিবার শিক্ষা করে উঠতে পারে না। এভাবে শ্রমের প্রকার ভেদে বিভিন্ন জীবিকা গড়ে উঠল; যার সুষ্ঠু বিন্যাস এবং পরিচালনার জন্য প্রথমে পরিবারগত পরে জন্মগত দায়িত্ব এসে গেল। ফলে জাত বা জন্মসূত্রের অর্থে জাতি শব্দের প্রচলন শুরু হল। ব্রাহ্মণের পুত্র ব্রাহ্মণ হতে লাগল। শূদ্রের পুত্র শূদ্রের কাজ করতে লাগল। সমাজসৃষ্ট এই কারণের জন্য ভগবদ্সৃষ্ট বর্ণবিভাগ ব্যাহত হতে পারে না। কোন শাস্ত্র-পুরাণেও 'জাতির' পক্ষে এবং 'বর্ণের' বিপক্ষে কিছুই পাওয়া যায় না। বর্ণ বিভাগকে মৌলিক বা আন্তর বিভাগ এবং জাতি-ভেদকে সামাজিক বা বাহ্যিক বিভাগ বলা চলে। এ দুয়ের ভিতর কিন্তু ছোট বড় সকলেই প্রথমটির পক্ষপাতি। বর্তমান

পরিস্থিতিতে খুব ভাল মনেই সকলে মেনে নিতে পারবেন যে, ভগবৎ বিধানকে অমান্য করে সামাজিক বিধানকে প্রাধান্য দিয়ে দেশে এত হানাহানি এত অশান্তি। এক সময়ে আমরা সকলেই মুখস্থ করেছিলাম—'নির্গুণের সমাদর কোনখানে নাই।' গুণেরই প্রাধান্য সর্বত্র, আবার এই গুণের জন্যই জটিলতাও সর্বত্র, তা সগুণ-নির্গুণ ব্রহ্মবিষয়েই হোক বা সত্ত্ব-রজঃ-তমঃ গুণ বিষয়েই হোক। গুণই মানবকে দেবত্ব প্রদান করে। আবার গুণই তাকে দেবত্ব হতে গর্তে নিপতিত করে। গুণের ওপর কথা নেই। গুণের ওপর তত্ত্ব নেই। গুণেরই গরিমা, গুণেরই বিচার— কোনটি হবে বর্জনীয় আর কোনটি ভজনীয়! অপার শাস্ত্র-সমুদ্র মন্থনের মুখ্য উদ্দেশ্যও গুণ-বিচার। জাতি-প্রথার কুফল থেকে বাঁচতে হলে শুধু গুণগ্রাহী হলেই চলবে না, গুণ অর্জনেও অগ্রণী হতে হবে। নিজে গুণবান না হলে গুণের মর্যাদা কখনই রক্ষা পাবে না।

দেখা যায়, কোন কোন আচার্যদেব ব্রাহ্মণ বর্ণকে যেন বিশেষ বিশেষ সময়ে অপর বর্ণের ছোঁয়া থেকে একটু বাঁচিয়ে রাখার ব্যবস্থা করেন। কোন সন্দেহ নেই, এ ব্যবস্থা সাধারণ চোখে একটু দৃষ্টিকটু লাগবে। কিন্তু তত্ত্বদর্শীদের নিকট আবেদন করব, এ ব্যবস্থার কতটা প্রয়োজনীয়তা তা ক্ষতিয়ে দেখতে। ক্ষেতের ফসল বাড়াতে আবশ্যক উত্তম বীজ। সেরকম বীজ সংগ্রহ করতে আগে-ভাগেই প্রস্তুতি নিতে হয়। ফসল পুষ্ট করে পাকাতে হয়। পাকা ফসল সযত্নে আলাদাভাবে মাড়াই, গোলাজাত করতে হয়। একটি শস্যবীজ সম্পর্কেই যদি এতখানি সাবধান হতে হয়, তবে যাঁদের দ্বারা জনচিত্তক্ষেত্রে ব্রহ্মজ্ঞানের বীজ বপনের আশা-পরিকল্পনা তাঁদের একটু সতর্ক যত্ন নিয়ে লালন-রক্ষণ করা বিশেষ আবশ্যক হবে না কি! প্রশ্ন হতে পারে- এজন্য শুধু ব্রাহ্মণ বর্ণকে বেছে নেওয়া কেন? এ প্রশ্নের খুব একটা সহজ সরল উত্তর

দেওয়ার ভাষা আমার জানা নেই। উত্তরটি তাই সবার কাছে স্পষ্ট নাও হতে পারে।

হিন্দুধর্মের ভিত্তি জন্মান্তরবাদ, যা কর্মবাদেরই ফলশ্রুতি মাত্র। "পুনরপি জননং পুনরপি মরণং পুনরপি জননী জঠরে শয়নম্" (শঙ্কর) —এ হল জন্মান্তরবাদ। পুনঃপুন জগতে এসে যে সব ধর্মকর্ম জীব আচরণ করে তাতে তার একটা অভ্যাস বা মনোবৃত্তি তৈরী হয়। সেই বৃত্তির ছাপ কালের অদৃশ্য কালিতে ছাপা হয়ে থাকে তার জীবাত্মাতে। এভাবে জন্মজন্মান্তরের অভ্যাস বা বৃত্তি নিয়ে জীবের একটি নিজস্ব ভাব বা স্বভাব তৈরী হয়—যাকে সহজ কথায় সংস্কার বলি। এই বৃত্তি বা সংস্কার কর্মানুসারে 'সু' বা 'কু' হয়ে থাকে এবং তদুপযোগী বিধিনির্দিষ্ট বংশে বা বর্ণে তার জন্ম হয়। এ সম্পর্কে গীতার ৬।৪০—৪৫শ শ্লোকাদি দ্রষ্টব্য। এই সংস্কার এতই শক্তিশালী যে, জীবকে সে অবশ করে কর্ম করায়। অর্থাৎ জীব সংস্কারের দাস হয়ে পড়ে (গীতার ১৮।৬০শ শ্লোক দ্রষ্টব্য)। এই সংস্কারের প্রভাব চলে বংশপরম্পরায়। পিতা-মাতার চিত্তবৃত্তি বহুলাংশে সন্তানে সঞ্চারিত হয়। সুতরাং মানুষের মৌল চিত্তবৃত্তি গঠনের উপাদান প্রধানতঃ আসে স্বভাবে, পূর্বজন্ম সংস্কার হতে এবং পিতামাতার সংস্কার হতে। এটা জন্ম-লগ্নের অবস্থা। ক্রমে এর ওপর শিক্ষাদীক্ষা, সংসর্গ এবং পারি-পার্শ্বিক অবস্থা প্রভৃতি প্রভাব বিস্তার করে ঐ কচি বৃত্তিকে পাকা-পোক্ত রূপ দিতে। এতদ্‌সব বিচারেই চার বর্ণের ভিতর ব্রাহ্মণ বর্ণকে শ্রেষ্ঠ বলা হয়েছে তার সুসংস্কারের জন্য। ব্রাহ্মণের এ সংস্কার এসেছে তার ব্রহ্মজ্ঞ পূর্বপুরুষের কাছ থেকে। মুণ্ডক উপ-নিষদে ৩।২।৯ মন্ত্রে আছে—

স যো হ বৈ তৎ পরমং ব্রহ্ম বেদ
ব্রহ্মৈব ভবতি নাস্যাব্রহ্মবিৎ কুলে ভবতি।

অর্থ—যে কেউ সেই পরব্রহ্মকে জানেন তিনি ব্রহ্মই (ব্রহ্মভূত) হন। তাঁর বংশে কেউ অব্রহ্মবিদ্ জন্মে না।

ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করে নিজে তো মহিমান্বিত হন-ই, তাঁর বংশ-কেও মহিমান্বিত করেন মহত্তমের সঙ্গে অচ্ছেদ্য বন্ধনে বেঁধে দেন। বংশপরম্পরায় সে সম্বন্ধ ক্ষীণ-শীর্ণ হলেও একদম টুটা-কাটা হয়ে যায় না। এ কারণেই আমরা অধিক ক্ষেত্রে মহতের কুলে মহতের আবির্ভাব দেখতে পাই। ব্যতিক্রম যা দেখা যায়, সেটা ব্যতিক্রমই। তা নিয়ে সাধারণ আলোচনা চলে না। ভাগবতের ৭।১৪।৪১শ শ্লোকেও ব্রাহ্মণকে সুপাত্র বলা হয়েছে। সুতরাং ব্রহ্মজ্ঞান প্রচার-প্রসারার্থ ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত করতে যদি কোন মহাত্মা ব্রাহ্মণবর্ণকে একটু বিশেষ বা আলাদাভাবে রক্ষণ-পোষণ করেন, তা মহাত্মার সূক্ষ্মদর্শীতার তথা সমাজ-হিতৈষণার পরিচায়ক। মহাত্মার এ ব্যবস্থা যেমন শাস্ত্রবিরুদ্ধ নয়, তেমনি এতে অন্য বর্ণকে কোন প্রকার কটাক্ষ করা হয় না বা তাঁদের ব্রাহ্মণত্ব লাভের অধিকারকেও খর্ব করা হয় না। বরং এ ব্যবস্থা দ্বারা বশিষ্ঠাদির মত ব্রাহ্মণকুলের উদ্ভব ঘটাতে পারলে বিশ্বামিত্রাদির মত উগ্র ক্ষাত্রকেও ব্রাহ্মণত্বে উন্নীত করা সম্ভব হবে। ব্রহ্মজ্ঞানী-ই ব্রাহ্মণ পদবাচ্য। ব্রাহ্মণের দৃষ্টিতে কেউ ছোট বড় নন, সবাই সমান, সবাই ব্রাহ্মণ। এমত ব্রহ্মজ্ঞ আচার্য যখন কোন ভিন্ন ব্যবস্থা নেন তখন তাঁর গূঢ় উদ্দেশ্যের প্রতি নজর দেওয়াই মঙ্গলের কাজ হবে। তাতে সমাজের মঙ্গল, দেশেরও মঙ্গল। এভাবেই মঙ্গলময় ভগবান মহাত্মাদের মাধ্যমে জগতের মঙ্গলবিধান করেন।

তবু যদি কারো মনে কোন কিন্তু থাকে এবং তিনি বলতে চান—আজকালের ব্রাহ্মণদের মধ্যে ব্রহ্মতেজের রেশটুকুও দেখা যায় না, তার উত্তর শাস্ত্রের মুখ থেকে শুনুন :—

নাহং বিশঙ্কে সুররাজবজ্রান্নত্র্যক্ষশূলান্ন যমস্য দণ্ডাৎ।
নাগ্ন্যর্কসোমানিলবিত্তপাস্ত্রাচ্ছঙ্কে ভৃশং ব্রহ্মকুলাবমানাৎ॥

—ভাগবত ৫।১০।১৭

অর্থ—(রাজা রহূগণ ভরতকে বলছেন) আমি ইন্দ্রের বজ্র, মহাদেবের ত্রিশূল, যমের দণ্ড, অগ্নি সূর্য চন্দ্র বায়ু ও কুবেরের অস্ত্রকেও ভয় করি না। কেবল ব্রাহ্মণকুলের অবমাননাকেই ভয় করি।

(২) কশ্যপঘরণী বিনতা সপত্নী কদ্রুর কপট আচরণে তাঁর দাসী হয়ে ছিলেন। মাতাকে দাসীবৃত্তি থেকে মুক্ত করার জন্য পুত্র পক্ষিরাজ গরুড় কদ্রুসন্তান সর্পগণের কথামত অমৃত আহরণে চলছেন। সুদীর্ঘ পথে গরুড় কি খাদ্য গ্রহণ করবেন এই প্রশ্নে মাতা বললেন, পথে এক দেশে নরহত্যাকারী নির্দয় দুরাত্মা ও পাপী সহস্র সহস্র ব্যাধ বাস করে। তাদের ভোজন করে তুমি অমৃত আনয়ন কর। কিন্তু, সাবধান! ব্রাহ্মণ হত্যা করার জন্য তোমার যেন কোনও প্রকারে দুর্বুদ্ধি না হয়; কারণ, অগ্নিসদৃশ ব্রাহ্মণ সকল প্রাণীরই অবধ্য। ঐ কথা বলে মাতা ব্রাহ্মণের মহিমা বর্ণন করলেন। এসব শুনে গরুড় জানতে চাইলেন ব্রাহ্মণ চিনবার লক্ষণ কি কি? উত্তরে মাতা বললেন—যিনি তোমার কণ্ঠদেশের মধ্যে গিয়ে গিলিত বড়িশের মত অথবা অগ্নিযুক্ত অঙ্গারের ন্যায় কণ্ঠ দগ্ধ করবেন, যিনি উদরের মধ্যে গিয়েও জীর্ণ হবেন না, তাঁকেই শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ বলে জানবে। গরুড় মহারাজ যাত্রা করলেন। পথে সেই ব্যাধপুরী পৌঁছলেন। সেথায় এক ব্রাহ্মণ এক নিষাদ রমণীকে বিবাহ করে ব্যাধগণের সঙ্গে বাস করছিলেন। পক্ষিরাজ যখন ব্যাধকুল উদরস্থ করলেন সেই সঙ্গে সস্ত্রীক ব্রাহ্মণও গরুড়ের উদরমধ্যে চলে গেলেন। তখন কণ্ঠদেশ প্রজ্বলিত অঙ্গারের ন্যায় দগ্ধ হতে লাগলে গরুড় বললেন—

দ্বিজোত্তম বিনির্গচ্ছ তূর্ণমাস্যাদপাবৃতাৎ।
ন হি মে ব্রাহ্মণো বধ্যঃ পাপেষ্বপি রতঃ সদা॥

—মহাভারত, আদিপর্ব—২৯।২

অর্থ—হে ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ! আমি মুখব্যাদান করছি, আপনি সত্বর বহির্গত হোন। সর্বদা পাপে নিরত ব্রাহ্মণও আমার বধ্য নহে।

গরুড়ের এই বাক্য শুনে ব্রাহ্মণ বললেন, আমার এই নিষাদী ভার্যাও আমার সঙ্গে নির্গত হোক! গরুড় বললেন—আপনি সস্ত্রীক এক্ষণই বহির্গত হোন এবং নিজেদের রক্ষা করুন। এখানে লক্ষণীয় হল—মাতা শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণের লক্ষণ বলে ছিলেন। কিন্তু পুত্র যে ব্রাহ্মণকে উদরস্থ করলেন তিনি নিষাদ রমণীকে বিবাহ করে এবং নিষাদ সমাজে বাস করে অবশ্যই লোকচক্ষুতে পতিত বা নিন্দনীয় ছিলেন। তবু তাঁকে ভক্ষণে গরুড়ের কণ্ঠদেশ প্রজ্বলিত অঙ্গারের ন্যায় দগ্ধ হতে লাগল, যেমনটি তাঁর মাতা বলে ছিলেন শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ সম্পর্কে। একারণেই গরুড় তাঁকে দ্বিজোত্তম বলে সম্বোধন করলেন এবং তাঁর সম্মানার্থে তাঁর নিষাদী পত্নীকেও অব্যাহতি দিলেন। পক্ষিরাজ গরুড়ের এই বিচার-বিবেচনা বিষয়ে কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না, যখন শ্রীভগবান গরুড়ের পরিচয় দিচ্ছেন "বৈনতেয়শ্চ পক্ষিণাম্" বলে (গীতা ১০।৩০)। গরুড়ের সিদ্ধান্ত এবং ভগবদ্‌বাক্য একই বস্তু। ব্রাহ্মণ-সন্তান হীন কাজ করলেও তাঁর ভিতর তাঁর ব্রহ্মজ্ঞ পূর্বপুরুষের যে ব্রহ্মবীজ রয়েছে তাঁকে যে কোন শ্রদ্ধাবানেরই শ্রদ্ধা জানান কর্তব্য। ব্রাহ্মণের কথা ছেড়ে দিলেও যার আত্মসম্মানবোধ আছে সে কখনই অপর কোন আত্মাকে অসম্মান করতে পারে না। অপরের প্রতি হীন-নীচ ভাব তখনই আসে যখন আমি হীনতায় ডুবে থাকি।

৩) **যথা দেবেষু বেদেষু গোষু বিপ্রেষু সাধুষু।**
ধর্মে ময়ি চ বিদ্বেষঃ স বা আশু বিনশ্যতি॥

—ভাগবত ৭।৪।২৭

অর্থ—(ভগবান বললেন) যখন কেউ দেবতা বেদ গো ব্রাহ্মণ সাধু ধর্ম ও আমার প্রতি বিদ্বেষ করে তখন সেই বিদ্বেষী শীঘ্র বিনষ্ট হয়।

৪) "অবিদ্যো বা সবিদ্যো বা ব্রাহ্মণো মামকী তনু"

অর্থ—(ভগবান কৃষ্ণের উক্তি) পণ্ডিত হোক বা মূর্খ হোক ব্রাহ্মণগণ আমার দেহস্বরূপ।

বীজ বা বংশের মূল্য-মহিমাকে অস্বীকার করার উপায় নেই। উচ্ছের বীজে উচ্ছেই ফলবে, করলা ফলান যাবে না। বাঁশের ঝাড়ে বাঁশই জন্মে। খাকের ঝাড়ে হাজার জলসেচ দিলেও বাঁশ পাওয়া যাবে না। জীবে জীবে যেমন ভেদ নেই, আবার ভেদ আছেও। ভেদও বটে, অভেদও বটে। উভয়ই সমান সত্য। এই ভেদাভেদের কঠিন বিচারেই তত্ত্বজ্ঞের পরীক্ষা। তত্ত্বদর্শীর কাছে জীবজ্ঞানে ভেদ শিবজ্ঞানে অভেদ। মা তাঁর দুটি সন্তান-কেই সমান স্নেহ-প্রেমে পালন করেন। আবার এক সন্তানের জন্য কখনো তিক্ত ঔষধের ব্যবস্থা, অপরটির জন্য তখন স্বাদু খাদ্য।

বহু শতাব্দী-সঞ্চিত নীতিহীনতার পরিণতিরূপে ধর্মাচরণ যখন ভক্তিনির্ভর না হয়ে তর্কনির্ভর হল, সমাজে ভ্রষ্টাচার দেখা দিল তখনই প্রেমের মূর্তিমান অবতার শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব। সত্যাদর্শবর্জিত সমাজের এই অবক্ষয়ের মূল কারণ দূরীকরণার্থ মহাপ্রভু আপন আদর্শ তুচ্ছ করে বহুজনের সুখের জন্য বহুজনের হিতের জন্য অভিন্নহৃদয় শ্রীপাদ নিত্যানন্দ অবধূতকে দার পরি-গ্রহের নিঠুর আদেশ প্রদান করলেন। উদ্দেশ্য—এক অবধূতের আবাল্য ব্রত নষ্ট হয় হোক, তবু তাঁর গার্হস্থ্য আশ্রমের ফলস্বরূপ যেসব ধর্মাচারশীল বংশের উদ্ভব ঘটবে তা দ্বারা অদূর ভবিষ্যতে অধুনালুপ্ত প্রাচীন গুরুকুলের অভাব পূরণ অনেকটা সম্ভব হবে। এর পরিণামে দেশ তার কৃষ্টি সংস্কৃতি ফিরে পাবে। সমাজে সদাচার

আসবে। লোকের সত্যনিষ্ঠা বাড়বে। মহাপ্রভুর এই ইচ্ছা রূপ পরিগ্রহ করল যখন বহু গোস্বামী-পরিবারের উদ্ভব হল। মহাপ্রভুর আশীর্বাদপুষ্ট সেই সব পরিবারে কালে কালে অনেক সিদ্ধ সাধক মহাত্মা প্রজাত হলেন মহাপ্রভুর আরব্ধ কর্মকে পরম্পরাগতভাবে এগিয়ে নিতে।

এই সব গোস্বামী প্রভুগণ আজ প্রায় পাঁচশত বৎসর ধরে মহাপ্রভুর নাম-প্রেম ধারাকে রক্ষা করে তথা সুপাত্রে বিতরণ করে দেশের ও দশের মঙ্গল করে চলেছেন। প্রেমঘন প্রভু আমাদের শুধু অনর্পিত বস্তুই অর্পণ করেন নি, সেই বস্তুর সাধনপ্রণালীর ধারা যাতে ছিন্ন না হয় তারও বিধিব্যবস্থা রেখে গেছেন গোস্বামী-পরিবার সৃষ্টি করে। জীবের কাছে সবচেয়ে আশার বাণী ভরসার বাণী—"যোগক্ষেমং বহাম্যহম্" (গীতা ৯।২২)। শ্রীভগবান কলিহত জীবকে জানিয়ে দিলেন—আমিই তোমাদের সেই পরম অমৃতরূপ প্রেমধন প্রদান করব। শুধু দিয়েই আমি ক্ষান্ত হব না, সেই অমূল্য সম্পদ যাতে তোমরা রক্ষা করতে পার তার ব্যবস্থাও আমি করে দেব। সেই প্রতিজ্ঞা পূরণের জন্য কুরুক্ষেত্রের কৃষ্ণ নদীয়ার নিমাই সেজে অনর্পিত ব্রজের প্রেম অবিচারে জীবকে বিলালেন। আর সেই স্বর্গীয় সম্পদ যাতে জীব সুখে ভোগ করতে পারে তার জন্য প্রহরীস্বরূপ গোস্বামিকুল সৃষ্টি করলেন। দাতা শুধু দান করেন। আর মহাদাতা শুধু দানই করেন না, দানের সামগ্রী যাতে গ্রহীতা আপন দখলে রেখে ভোগ করতে পারে তার ব্যবস্থাও করেন। একারণে শ্রীল রূপ গোস্বামী শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর স্তব করছেন—"নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণপ্রেমপ্রদায়তে**" প্রভৃতি বাক্যে (চৈতন্যচরিতামৃত ২।১৯।৩ শ্লোক)। মহাপ্রভুর মহাবদান্যতার ফল গোস্বামিকুল।

গুরুকুলের হুবহু বিকল্প ব্যবস্থা না হলেও গোস্বামিকুল প্রবর্তন

করে মহাপ্রভু বৈষ্ণব তথা বৈদিক ধর্মকে মহা অবক্ষয় থেকে রক্ষা করেছেন। আগে গুরুকুলের আচার্যগণ ব্রহ্মজ্ঞান বিতরণ করতেন; আর মহাপ্রভু নির্মৎসর নিষ্কিঞ্চন গোস্বামিগণকে আদেশ দিলেন ঐ জ্ঞানবৃক্ষের সুপক্ক সুরসাল ফল প্রেম বিতরণ করতে। এখানে মনে হতে পারে, মহাপ্রভু বুঝি ব্রহ্মচর্যকে বাদ দিয়ে দিলেন। না, মহাপ্রভু বা কোন অবতারই বেদকে কখনই উল্লঙ্ঘন করেন নি। কলিজীবের স্বল্পায়ু দেখে করুণাসাগর মহাপ্রভু দয়াপরবশ হয়ে সাধনবৃক্ষের মেওয়াটি হাতে তুলে দিলেন। সাধন-শ্রম থেকে জীবকে অব্যাহতি দিলেন, যদি মেওয়ার লোভেও জীব ঈশ্বরমুখী হয়। কিন্তু এ মেওয়াফল আস্বাদন করতে ব্রহ্মচর্য চাই। সাধন করতে হল না, কিন্তু ভজন অবশ্যই করতে হবে। সাধনটি হল, যেমন গাছে উঠে একটি নারকেল পেড়ে আনা। আর ভজনটি হল, ঐ নারকেলের ছোবড়া ছাড়িয়ে নারকেল ভেঙ্গে তার ভিতরের শাঁস-রস আস্বাদন করা। ভজন শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হচ্ছে—ভেঙ্গে ভিতরে প্রবেশ করা। প্রেমফলটি পাওয়া হল বিনা সাধনে, কিন্তু তাকে আস্বাদন করতে ব্রহ্মচর্য ছাড়া গতি নাই। ব্রহ্ম-চর্যের অমোঘ শক্তি ছাড়া প্রেমফলের ভিতরের শাঁস-রসে পৌঁছান যাবে না।

প্রশ্ন হতে পারে, ঐ ব্যবস্থার সুফল বর্তমান সমাজ কতটুকু পাচ্ছে? এর উত্তর দেবার দায়িত্ব বোধহয় আমাদের সকলের। একটি নিশ্চিত সত্য হল—চাওয়ার ধরনের উপর পাওয়ার পরিমাণ নির্ভর করে। জিজ্ঞাসু ছাত্রের জ্ঞানপিপাসা মেটাতে যে শিক্ষককে পড়াশুনা করে নিজেকে তৈরীকরে নিতে হয়, এ তো আমরা চোখেই দেখতে পাই। তদ্রূপ ধর্মজগতেও যদি কেউ শুদ্ধভাব, খাঁটি তত্ত্বের তত্ত্বজিজ্ঞাসু থাকেন তবে অবশ্যই তিনি তা লাভ করতে পারেন। গীতায় শ্রীভগবান ৭।১৬শ শ্লোকে বলেছেন, আর্ত তত্ত্বজিজ্ঞাসু

অর্থকামী ও জ্ঞানী এই চার প্রকার ব্যক্তি তাঁকে ভজনা করে। এবং ৪।৩৪শ শ্লোকে বলেছেন—প্রণিপাত, সশ্রদ্ধ জিজ্ঞাসা ও সেবা দ্বারা প্রসন্ন হয়ে তত্ত্বদর্শী জ্ঞানী ব্রহ্মজ্ঞান উপদেশ করেন। ভগবানের এই সব বিধিবিধান মেনে চলার পরেই কেবল জিজ্ঞাসা করা চলে—আমরা সদ্‌বস্তু পেলাম কৈ? আগে আপন ফাঁক-ফোকর বন্ধ করে অপরের ফাঁক খুঁজলে ভাল হয় না কি! গ্রহীতা প্রস্তুত থাকলেই তো দাতার দানের সুযোগ আসে। তবু যদি বলা যায়—ধর্মক্ষেত্রে যাঁরা কর্ণধার তাঁদের ঔদাসীন্যের জন্যই আজ আমরা ধর্মের সঠিক স্বাদ পাচ্ছি না। এ ধারণাকে মেনে নিলেও আমাদের কর্তব্য থেকে যায়। আমার জীবনে যে অপূর্ণতা রয়ে গেল, যে মহামূল্য সম্পদ থেকে আমি বঞ্চিত রইলাম, আমার পরবর্তী বংশধরদের ভাগ্যে যাতে তেমনটি না ঘটে তার জন্য কি আমার কোন কর্তব্য নাই! বড় হয়ে যখন বুঝলাম উপযুক্ত জ্ঞানচর্চার অভাবে সমাজে প্রতিষ্ঠা পাচ্ছি না তখন আমার সন্তানদের জন্য যথোপযোগ্য শিক্ষাদানের বন্দোবস্ত করা কি আমার একটা প্রধান কর্তব্য নয়! আসল কথা হল—কি সংসারক্ষেত্রে কি ধর্মক্ষেত্রে সর্বত্রই আমাদের·চেতনার অভাব। আমার ভিতরে এই অভাব আছে বলেই বাইরে যে দিকে তাকাই সে দিকই ফাঁকা দেখি। অধ্যাত্ম জগতের একটু খবর নিলেই দেখা যাবে—শিষ্যের আধ্যাত্মিক ক্ষুধা মেটাতে পারলে গুরু শুধু পরিপূর্ণ তৃপ্তি পান না, তিনি তখন নিজ সাধনায় সিদ্ধি লাভ করেছেন মনে করেন। জ্ঞান বিতরণের ঐকান্তিক নিষ্ঠাতেই প্রকৃত জ্ঞানীর পরিচয়। আজপর্যন্ত এমন দৃষ্টান্ত বোধহয় পাওয়া যাবে না যে কোন জ্ঞানান্বেষী উপযুক্ত জ্ঞানীর সাক্ষাৎ পান নি। তা হলে যে ভগবানের প্রতিজ্ঞা—**"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্"** (গীতা ৪।১১) রক্ষা পায় না! ভগবানকে জানতে চাইলে জানা যাবে না, তাঁকে পেতে চাইলে পাওয়া যাবে না—এসব কথা শুধু শাস্ত্র-

বিরুদ্ধই নয়, অজ্ঞানতার পরিচায়কও বটে। কোন সৎ শিষ্য কোনই সৎ গুরুর সাক্ষাৎ পান নি—একথা মিথ্যারই নামান্তর মাত্র। এটাই চিরসত্য কথা যে, সদ্‌গুরুর অভাব নেই, অভাব উপযুক্ত শিষ্যের। আচার্যের আচরণে ত্রুটি খুঁজতে যাওয়া শুধু অন্যায় নয়, অপরাধও বটে।

গুরু শিষ্যকে তৈরী করেন, এ সাধারণ কথা। অসাধারণ কথা হল—খাঁটি শিষ্য হলে সে গুরুকেও সময়কালে মহাবিপদ থেকে পার করতে পারেন। উপযুক্ত শিষ্যের প্রেরণায় গুরুও অনুপ্রাণিত হন, আপন ত্রুটি বিচ্যুতি শুধরে নেন। এর প্রমাণ গোরক্ষপুরের যোগীরাজ গোরক্ষনাথ এবং তদীয় গুরুবর মহাত্মা মৎসেন্দ্রনাথ। গুরুবর একদা কোন রাজাকে বিষয়বাসনা হতে মুক্ত করার সংকল্প নিয়ে সেই রাজবাড়ীতে অবস্থান করতে থাকেন। কালপ্রভাবে তিনি নিজেই বিষয়-ভোগে ডুবে যান। শিষ্য গোরক্ষনাথ গুরুদেবকে এ অবস্থা থেকে অতি কৌশলে মুক্ত করেন। সেই থেকে গোরক্ষনাথের নাম প্রবাদবাক্যের মত সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়ে। এখানে শিষ্যের বাহাতুরীর কথা চিন্তা করার পূর্বে ভাবতে হবে গুরুর বাহাতুরী। তিনি কত খাঁটি একজন শিষ্যকে উপযুক্ত ভাবে তৈরী করে ছিলেন, যে শিষ্য আপৎকালে আপন শক্তিতে গুরুকে বিপদ-মুক্ত করতে পেরেছিলেন। আবার শিষ্যের সামর্থ্যের কথাও ভাবতে হবে। তাই বলছি, শুধু গুরু-গোসাঁইদের দোষত্রুটির কথা পাড়লেই এ পথ পাওয়া যাবে না। মদীয় শ্রীগুরু বলতেন—শিষ্য শুধু শাসনযোগ্য পাত্রই নয়, শীর্ষকও বটে। অর্থাৎ প্রিয় শিশু-সন্তানকে যেমন মাতা পিতা মাথায় নিয়ে আদর করেন, প্রিয় শিষ্যকেও তেমনি গুরু তাঁর মাথার মণি মনে করেন। এবিষয়ে ভাগবতে একটি সুন্দর উপাখ্যান আছে। একদা দেবাসুর সংগ্রামে দেবতারা হেরে গেলে ব্রহ্মা দেবতাদের উপদেশ দিলেন, ত্বষ্টার

পুত্র বিশ্বরূপকে গুরুরূপে ভজনা করতে। তদনুযায়ী দেবগণ পুত্রতুল্য ব্রহ্মজ্ঞ বিশ্বরূপের নিকট গিয়ে তাকে উপাধ্যায়-গুরুরূপে বরণ করে বললেন—

ন গর্হয়ন্তি হি অর্থেষু যবিষ্ঠাঙ্‌ঘ্র্যভিবাদনম্।
ছন্দোভ্যোঽন্যত্র ন ব্রহ্মন্ বয়োজৈষ্ঠস্য কারণম্॥

—ভাগবত ৬।৭।৩৩

অর্থ—হে ব্রাহ্মণ! প্রয়োজনানুরোধে কনিষ্ঠের পদবন্দনা নিন্দনীয় নয়। বিশেষতঃ বেদজ্ঞান বর্জন করে কেবল মাত্র বয়স দ্বারা জ্যেষ্ঠত্ব বিচার্য নয়।

সাধনজগতে ছোট-বড় বিচার করতে যাওয়া বিপদের কথা। ষোল বৎসর বয়স্ক ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ শুকদেব গোস্বামীকে বর্ষীয়ান মহাত্মা এবং মুনিঋষিগণও অভিবাদন করতেন। কপিল-দেবহূতি উপাখ্যান সকলেরই জানা আছে। মাতা দেবহূতি পুত্র কপিলের নিকট শুধু শিক্ষা গ্রহণ করেন নি, দীক্ষাও গ্রহণ করে ছিলেন। শিষ্যের মানসিক প্রস্তুতিই প্রথম এবং প্রধান কথা। মনে হয়, গুরুশিষ্যের সম্পর্ক-সম্বন্ধটা উভয়ের কাছে স্পষ্ট না হলে ভজন চলতে পারে না। এ একটি যৌথ দায়িত্ব। উভয়ের মিলিত চেষ্টায় শিষ্যের ব্রহ্মদর্শন বা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়। শিষ্যের একার সাধ্য নেই সে এই দুর্গম পথ পার হয়। শিষ্য গুরুর সঙ্গে সহ-যোগিতা না করলে গুরুরও দুঃসাধ্য হয় শিষ্যের কিছু মঙ্গল করা। আচার্য বা গুরুবর্গের গুরুত্বের আলোচনারূপ গুরুনিন্দার ভাগী না হয়ে আপন অন্তরে কতটা অধ্যাত্ম ক্ষুধা জেগেছে, আপন আগ্রহ নিষ্ঠা কতটা ঐকান্তিক তা পরিমাপ করলে সমস্যাটির তাৎপর্য উপলব্ধি করা সহজ হবে। ক্ষুধা না থাকলে সুধা দিলেও কি সুখ আসে। খাদ্য বস্তুর মূল্য বা আদর তখন, যখন পেটে ক্ষুধা থাকে।

অধ্যাত্মজ্ঞান লাভে যদি উদগ্র আকাঙ্ক্ষা থাকে তবেই তত্ত্ব-জ্ঞানের মূল্যবোধ হবে। তখনই গুরুর উপদেশ ফলদায়ী হবে এবং অভীষ্ট-সিদ্ধি হবে।

গীতায় শ্রীভগবান বলেছেন—সাধুদিগের পরিত্রাণের জন্য, দুষ্কৃতকারীদিগের বিনাশের জন্য এবং ধর্মসংস্থাপনের জন্য আমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হই (৪।৮)। এই ভগবদ্‌বাক্যের মূল সূত্রে লক্ষ করা যাবে—সাধুরা পরিত্রাণ চাইলে অথবা তাঁদের ত্রাণ করা জরুরী হলে ভক্তের জন্য ভগবান যুগে যুগে অবতার গ্রহণ করেন। গৌরসুন্দরের লীলায় পাই—অদ্বৈতাচার্যের প্রার্থনায় ভগবান অবতীর্ণ হলেন। শাস্ত্রাদিতে এরূপ অনেক উদাহরণ আছে যেখানে ভক্তের ডাকে ভগবান সাড়া দিয়েছেন। মনুষ্য-ভক্ত ছাড়াও মনুষ্যেতর ভক্ত যেমন গজেন্দ্র-মোক্ষণ উপাখ্যানে বনের পশু হাতীর অন্তিম প্রার্থনায় সাড়া দিয়ে শ্রীহরি চক্রদ্বারা গ্রাহকে (কুম্ভীরকে) বধ করত হাতীকে রক্ষা করেছিলেন। এই সব প্রমাণাদিতে দেখা যায়, শ্রীহরির নিকট প্রার্থনা জানালে তা অবশ্যই পূরণ হয়। ইষ্টলাভের প্রার্থনা কোন দিন অপূর্ণ থাকে নি। এক্ষেত্রে আমাদের প্রার্থনা পূরণ না হবার কোন কথাই ওঠে না। আসলে আমাদের প্রার্থনা প্রার্থনাপর্যায়ে পড়ে কিনা তাই দেখার বিষয়। যখন আমাদের প্রার্থনা পূরণ হয় না তখন নিশ্চিতভাবে বুঝতে হবে প্রার্থনা ঠিক হয় নি। প্রার্থনা পূরণে কখনও দেরি দেখা যায় না, প্রার্থনা করতেই যা দেরি। নীতিকথায় আছে—

মন্ত্রে তীর্থে দ্বিজে দেবে দৈবজ্ঞে ভেষজে গুরৌ।
যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী॥

অর্থ—মন্ত্র তীর্থস্থান ব্রাহ্মণ দেবতা জ্যোতিষী ঔষধ এবং গুরু—এ সকল বিষয়ে যার যেমন বিশ্বাস এবং ভাবনা তার সেইরূপ ফল লাভ হয়।

অর্থাৎ মন্ত্র গুরু দেবতা তীর্থ এঁরা আমার কতটুকু ভাল করতে পারবেন তা নির্ভর করছে তাঁদের প্রতি আমার কতটুকু শ্রদ্ধা ভক্তি বিশ্বাস আছে তার ওপর। কারো কোন হিতপ্রচেষ্টায় কোনই ফল হবে না যদি আমি হিতকামী না হই। গুরু-গোবিন্দের পক্ষেও অসম্ভব হবে আমার কোন মঙ্গলবিধান করা যদি আমার ভিতর মঙ্গলচিন্তা না থাকে। আমার ভিতরের সদসৎ চিন্তাকে অবলম্বন বা আশ্রয় করেই চিন্তামণি ভগবান আমাকে তদনুরূপ ফল প্রদান করেন। বস্তুতঃ আমাদের সদসৎ চিন্তাই আমাদের ভাগ্যবিধাতা। অমৃত-ভাবনাই অমৃত ফল প্রসব করে। ভাবনা-ই অমৃত। ভাবনামৃত। অমৃতময় ভগবানের সহিত ভাবনাকে যুক্ত করলেই ভাবনামৃত। সমস্ত সাধন-ভজন নির্ভর করছে এই ভাবনামৃতের ওপর। ঈশ্বর আমাদের ভাবনাটুকুরই মূল্যায়ন করেন। তাই তিনি "ভাবগ্রাহী জনার্দন"।

কৌরবসভায় রাজা দুর্যোধনকেও ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বিশ্বরূপ দেখিয়ে ছিলেন। কিন্তু দুর্যোধন তা কৃষ্ণের ভোজবাজী মনে করলেন। ফলও তেমনি ভোজবাজীর মত হল। কর্ণের মত মহাবীর, ভীষ্মের মত মহারথী, দ্রোণাচার্যের মত মহাধনুর্ধর, জয়দ্রথের মত যুদ্ধ-বাজ, এরকম বহু বাঘাবাঘা রথী-মহারথী সহ এগার অক্ষৌহিণী সৈন্যবল নিয়েও মাত্র সাত অক্ষৌহিণী সেনার কাছে নিঃশেষে পর্যু-দস্ত হলেন দুর্যোধন। এর কারণ, দুর্যোধনের আপন মনের দুষ্ট ভাবনা। তাঁর অপরিমিত বাহুবল আপন দুষ্ট ভাবনার কাছে পরাজিত হল। যে রূপ দর্শনে জীবের মোহভঙ্গ হয়, সেই বিশ্বরূপ দর্শনে দুর্যোধনের মোহ শতগুণে বৃদ্ধি পেল। অসদ্‌ভাবনা ইহকাল পরকাল দুই নিয়েই টান দেয়।

সুতরাং আত্মজ্ঞান, আত্মদর্শন, ব্রহ্মজ্ঞান প্রভৃতি সব কিছুই নির্ভর করছে আমার নিজের ভাবনা বিশ্বাসের ওপর। আমরা ভুলে-

গেছি যে আমরা অমৃতের সন্তান। পিতৃধনে যেমন পুত্রের নির্ব্যূঢ় 'অধিকার, অমৃতেও আমাদের তেমন অধিকার। অধিকার-সত্ব ভুলে গেলে যেমন পিতার ধন পুত্র পায় না, আমরাও তেমনি পিতার কথা, পিতার অমৃত-সম্পদের কথা ভুলে গিয়ে অমৃতধনে বঞ্চিত আছি। আমাদের এই সর্বস্বান্ত ভাবের জন্য একমাত্র অজ্ঞানতাই দায়ী। অজ্ঞানতার চালাকি একবার বুঝতে পারলেই অজ্ঞানতা পালাবে। ধরাপড়বার উপক্রম হতেই যেমন চোর-বাটপাড় পালিয়ে বাঁচে, অজ্ঞানের অবস্থাটাও ঠিক তেমনি। সাধন-ভজন দ্বারা আমরা অজ্ঞানতার স্বরূপ বুঝে সাবধান হই।

আমরা আনন্দ হতে এসেছি। আমরা আনন্দের কণা। আনন্দে থাকব। আবার আনন্দেই ফিরে যাব। আমরা আনন্দের অংশ, আর পূর্ণতমব্রহ্ম কৃষ্ণ হলেন অংশী। অংশের স্বভাব-ধর্ম হচ্ছে অংশীর সঙ্গে মিলিত হওয়া। অংশীর ধর্ম হচ্ছে অংশকে কাছে টেনে নেওয়া। তাই জ্ঞাতে অজ্ঞাতে আমাদের একটা টান বা আকর্ষণ রয়েছে অংশীর প্রতি, ব্রহ্মের প্রতি। এই আকর্ষণের তত্ত্ব জ্ঞাত হয়ে যে স্বেচ্ছায় ঈশ্বরাভিমুখী হয় তাকে ভক্ত বলা হয়। অর্থাৎ ঈশ্বরের প্রতি তার ভক্তিভাব। যে এতত্ত্ব না জেনে অজ্ঞাত আকর্ষণে অনিচ্ছায় চলছে ঈশ্বরপানে, সে অভক্ত। অর্থাৎ ঈশ্বরের প্রতি তার বৈরীভাব।

ভক্তভাব এবং বৈরীভাব উভয়ের মূলে একই সত্য—অণুর প্রতি বিভুর ঐ আকর্ষণ। একারণ উভয় ভাবের একই প্রাপ্তি। প্রাপ্তিতে পার্থক্য নেই, পার্থক্য আছে প্রাপ্তির গতিতে। অর্থাৎ কি ভাবে প্রাপ্তি হবে, অথবা কিরূপ গতিতে ভগবানের নিকটে গমন হবে তার ওপর নির্ভর করছে অমৃত আস্বাদনের বা প্রাপ্ত বস্তু আস্বাদনের তারতম্য। মহাভারতে স্বর্গারোহণ পর্বের চতুর্থ অধ্যায়ে দেখা যায়—ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির দিব্যলোকে পৌঁছে দেখতে

পেলেন কুরুপতি ধৃতরাষ্ট্র এবং মহাবীর কর্ণ প্রভৃতি শত্রুপক্ষীয়গণ, যাঁদের শত্রুতামূলক আচরণের জন্য পাণ্ডবদের জীবন জর্জ্জরিত হয়েছিল তাঁরা তাঁর আগেই সেখানে পৌঁছে দিব্যকান্তিতে বিরাজমান আছেন। অবশ্য দ্রৌপদীসহ ভীমসেনাদি চার ভাইও ধর্মরাজের আগেই দিব্যলোকে পৌঁছে গেছেন।

দেখা গেল, বৈরীভাব নিয়ে শীঘ্রই পরমপদ লাভ হয়। কিন্তু আস্বাদন হয় না। এ বিষয়ে ভক্তিতত্ত্বের মূল প্রবক্তা দেবর্ষি নারদকে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির প্রশ্ন করেছিলেন—হে মহর্ষে! এ অত্যন্ত অদ্ভুত ব্যাপার যে, পাপাত্মা দমঘোষের পুত্র চেদিরাজ শিশুপাল যেদিন হতে অব্যক্ত বাক্য বলতে আরম্ভ করেছে সেদিন হতেই আজ পর্যন্ত ভগবান বাসুদেবের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে তদীয় নিন্দাবাদ প্রয়োগ করে আসছে এবং দুষ্টমতি দন্তবক্রও ঠিক ঐরূপ ভাবে ভগবানের প্রতি বিদ্বেষবুদ্ধি পোষণ করে আসছে। তবু ঐ পাতকীদ্বয় পাপগতি প্রাপ্ত না হয়ে ভগবানের সাযুজ্য লাভ করল কেন? উত্তরে দেবর্ষি বললেন—

যথা বৈরানুবন্ধেন মর্ত্যস্তন্ময়তামিয়াৎ।
ন তথা ভক্তিযোগেন ইতি মে নিশ্চিতা মতিঃ॥

—ভাগবত ৭।১।২৬

অর্থ—এই মর্ত্যবাসী শত্রুতা আশ্রয় করে শত্রুর প্রতি যেরূপ তন্ময়তা ধারণ করে, ভক্তিযোগে তাদৃশ তন্ময়তা লাভ করে না। ইহাই আমার নিশ্চিত সিদ্ধান্ত।

কাজেই ভক্তিযোগ অপেক্ষা যখন বৈরীভাব অধিক তন্ময়তাসাধক এবং তন্ময়তাই যখন ঈশ্বরের সাযুজ্যপক্ষে প্রধান, তখন ভক্তিযোগ অপেক্ষা বৈরই শ্রেয়স্কর। কিন্তু শ্রেয়স্কর হলেও যে তা প্রেষ্ঠ বা মধুর নয়। আমরা অমৃতের পুত্র বলে শ্রেয়স্কর থেকে প্রেষ্ঠতেই আমাদের বেশী লোভ। মধুর স্বাদে বেশী লোলুপতা। তাই

আমরা মুক্তির সহজতম পথ 'বৈরানুবন্ধঃ' উপেক্ষা করে প্রেমভক্তির কণ্টকময় পিচ্ছিল ঘুরপথে চলি মধুলোভে। প্রেমাস্পদকে পেয়েও কাঁদি, না পেয়েও কাঁদি। আমাদের সেই কাঁদা দেখে ত্রিভুবনেশ্বরও কাঁদেন বৈ কি! বৈর ও ভক্তি ছাড়া শাস্ত্রে অবশ্য আরো পথের কথা আছে, যেমন—

"ভয়েন বা, স্নেহাৎ কামেন বা যুঞ্জ্যাৎ"

ভাগবত ৭।১।২৫

ভয়েই হোক, স্নেহেই হোক অথবা কামহেতুই হোক যে কোনও ভাবে ঈশ্বরে মনঃসংযোগ করলেই মুক্তি। ভগবানের ভাব-দেহ, ভূত-দেহ নহে। সুতরাং নিন্দা স্তুতি সৎকার তিরস্কার কিছুই ভগবানের ভাবদেহ স্পর্শ করতে পারে না। তিনি শুধু ভাব গ্রহণ করেন। তাঁকে ভাব আরোপ করলেই মুক্তি। বৈর নির্বৈর ভয় স্নেহ বা কাম কোন ভাবের ভাবেই ভূমা বা ভগবানের কোনই ক্ষতিবৃদ্ধি নেই। ক্ষতিবৃদ্ধি আছে অণুর বা জীবের—যে ভক্তি বা বৈরভাব নিয়ে আকর্ষণের টানে তাঁর পানে ছুটেচলে। ঐ আকর্ষণজনিত গতির জন্যই জীবের চৌরাশিলক্ষ যোনিতে গতাগতি। এই ভ্রমণপর্ব চলাকালে জীবের ভ্রম ক্রমে ক্রমে ক্ষয় পেতে থাকে; ফলে জীব ক্রমে উন্নততর দেহ পেতে থাকে। ভ্রমণের শেষলগ্নে আকর্ষণের তীব্রতা বাড়ে। তখন জীব কৃষ্ণরসাস্বাদনের জন্য ব্যাকুল হয়। যাকে আমরা অভক্ত অপরাধী পাপী বলি সেও কৃষ্ণধন চায়। সেও আনন্দ চায়, অমৃত চায়। কিন্তু পাবার রাস্তা না জানার জন্য পুণ্যের পথ ছেড়ে পাপের পথে চলে।

শাস্ত্র জীবকে বহুভাগে ভাগ করেছেন—পুণ্যবান, পাপী, পাপপুণ্য জ্ঞানহীন প্রভৃতি। কিন্তু উপনিষদ ব্রহ্মকে এক বাক্যে প্রকাশ করেছেন—'রসো বৈ সঃ'—রসস্বরূপ বলে (৬৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। সুতরাং জীবকেও সেই সূত্রে দুভাগে ভাগ করা যায়—

'ব্রহ্ম রসস্বরূপ' এ জ্ঞান যাদের আছে, আর এ জ্ঞান যাদের নেই। সমগ্র সাধক-সমাজকে তথা সমস্ত সাধন-তত্ত্বকেও দুভাগে ভাগ করা যায়। একভাগে—যাঁরা ভগবানের মাধুর্য রসের পিয়াসী, অন্য ভাগে—যাঁরা তাঁর ঐশ্বর্যে বিলাসী। মাধুর্যরস কৃষ্ণের চিচ্ছক্তি বা অন্তরঙ্গা স্বরূপশক্তির বিলাস। আর ঐশ্বর্য ভগবানের মায়া-শক্তি বা বহিরঙ্গাশক্তির বিকার। একারণ মাধুর্যরসের আকর্ষণী শক্তি সর্বাধিক। অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ড এই আকর্ষণের টানে ছুটছে। আমরাও ছুটছি।

তাই আমরা বুঝি বা না বুঝি সকলেই রসপানে লালায়িত। এই লোভ বা লালসাটুকু সম্বল করে রসের পথে রসস্বরূপকে পেতে পা বাড়ালেই স্বল্প আয়াসে বাঞ্ছিতধন পাবার সমূহ সম্ভাবনা। লোভেই লাভ। তাঁকে পাবার লোভ জন্মিলে অবশ্যই তাঁকে লাভ করা যাবে। উপায় তিনিই জানিয়ে দিবেন। এ শুধু আশার কথা নয়, এ ভগবানের প্রতিজ্ঞা। অর্জুনকে উপলক্ষ করে সাধন-শক্তি অর্জনকারী অখিল জনকে তিনি জানিয়ে রাখলেন—

"দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে—

যে বুদ্ধিদ্বারা আমাকে লাভ করা যায় সেই তত্ত্ববিষয়ক সম্যক্ জ্ঞান আমি প্রদান করি (গীতা ১০।১০)।" গুরু রূপে, সাধু রূপে, সখা রূপে, বিবেক রূপে, স্বপ্নযোগে অথবা শাস্ত্রাদিরূপে—যে কোন প্রকারেই হোক তিনি তাঁর তত্ত্ব-সংবাদ যথাসময়ে অবশ্যই সাধককে জানিয়ে দেন। এর ভূরি ভূরি প্রমাণ শাস্ত্রপুরাণ থেকে আরম্ভ করে সাধু-মহাপুরুষদের জীবনীতে পাওয়া যায়।

শ্রীকৃষ্ণই পরমতত্ত্ব। জীবের সাধ্য নেই যে সে আপন বিচার-বুদ্ধিতে বুঝতে পারে কোনটি শ্রেষ্ঠতম তত্ত্ব। তাই কৃপাসিন্ধু ভগবান স্বমুখে জানিয়ে দিলেন—

মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয় ॥ গীতা ৭।৭
বেদৈশ্চ সর্বৈরহমেব বেদ্যঃ * * *। গীতা ১৫।১৫

অর্থ—হে ধনঞ্জয়, আমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কেউ নাই। সকল বেদের জ্ঞাতব্য বিষয় আমিই।

শ্রীমদ্‌ভাগবতে দেখা যায়, শৌনকাদি মুনিগণের প্রশ্নে শ্রীসূত বলছেন—

এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্।
১।৩।২৮

অর্থ—পূর্ববর্ণিত অবতারগণের মধ্যে কেউ শ্রীহরির অংশ, কেউ বা শ্রীহরির অংশের অংশ, কিন্তু ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং পূর্ণতম ভগবান।

ব্রহ্মসংহিতা বলেন—

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্বকারণ-কারণম্ ॥ ৫।১

অর্থ—যিনি অনাদি অর্থাৎ উৎপত্তিহীন ও সকলের আদি, সেই সর্বকারণ-কারণ (অর্থাৎ মায়ার উৎপত্তিস্থল) সচ্চিদানন্দবিগ্রহ গোবিন্দ নামে খ্যাত শ্রীকৃষ্ণই পরমেশ্বর।

সমস্ত শাস্ত্রের ইহাই সিদ্ধান্ত যে, শ্রীকৃষ্ণই পূর্ণতম ব্রহ্ম। পূর্ণতমের ভজনা করলেই জীবের পরিপূর্ণতা আসে, পূর্ণতম ব্রহ্ম-জ্ঞানের উদয় হয় এবং পূর্ণানন্দ লাভ হয়। অন্য সব অবতার বা অন্যান্য দেবদেবী যেহেতু শ্রীকৃষ্ণের অংশাবতার বা শক্তিকলা মাত্র, সেহেতু তাঁদের ভজনায় জীবের পরিপূর্ণতা আসে না। শ্রীকৃষ্ণই যে পরমতত্ত্ব, পরমাত্মা তাঁর অংশ এবং ব্রহ্ম তাঁর অঙ্গজ্যোতি—এসব তত্ত্ব নানা শাস্ত্র কতসব বাক্যে যে প্রকাশ করেছেন তা বলে শেষ করা যায় না। যাদের গীতা-ভাগবতের মত অফুরন্ত অমৃত-

সিন্ধু আছে, তাদের অন্য শাস্ত্রের দোহাই পাড়া ভক্তিবিমুখতা ছাড়া আর কি হতে পারে! শ্রীভগবানের স্বমুখের বাণীকে শ্রদ্ধা-ভক্তি-বিশ্বাস করতে যাদের আজ অপরের মুখের পানে তাকাতে হয় তাদের, বোধহয়, বলার কিছুই নেই। যাদের ঘরের আঙ্গিনায় ব্রজের কানাই নিমাই সেজে খেলা করে তাদের বর্তমান দৈন্যদশার কি কারণ তা পণ্ডিতগণ অবশ্যই বিচার-বিহিত করবেন। একদিন যারা খোল-মাদলসহ কীর্তন-প্রবাহে রুষ্ট রাজশক্তিকে বশে এনেছিল, এই সেদিন যে দেশের এক অর্ধনগ্ন সত্যাগ্রহী (সত্যে আগ্রহ-আসক্তি) সন্ন্যাসীর তাড়া খেয়ে বৃটিশসিংহকে সাতসমুদ্র সাঁতরে আপন দ্বীপ-গুহাতে লুকাতে হয়েছে সে দেশের দেশবাসীর আজ এ হাল কেন? এর প্রধান কারণ রাজশক্তি (রাষ্ট্রশক্তি) থেকে ধর্মশক্তিকে আলাদা করার জন্য নয় কি? যেখানে ধর্মশক্তিই ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ এই চতুর্বিধ সম্পদ প্রদান করেন, সেখানে অর্থ ও কামের অধিকার থেকে ধর্মশক্তিকে বঞ্চিত করা হয় নাই কি? আর্যপ্রথা ছিল—রাজশক্তি চালিত হবে ব্রহ্মজ্ঞ ব্রাহ্মণের ধর্মশক্তি দ্বারা। আজ ব্রহ্মজ্ঞানী নিপীড়িত হচ্ছেন রাজশক্তির চক্রতলে। ফলও তেমনি বিপরীত ঘটছে। এই সর্ববিধ সমস্যা-সন্ত্রাসের মূল কারণ, আজ আমরা সর্বতোভাবে সত্যভ্রষ্ট। ক্ষুদ্রতম সমস্যা থেকে আরম্ভ করে বৃহত্তমের কার্য-কারণ পর্যালোচনা করলে একই উত্তর মিলবে—'সত্যম্ এব জয়তে, ন অনৃতং'—কেবল সত্যেরই জয় হয় (একমাত্র সত্যই স্থায়িত্ব লাভ করে, সুখ দান করে), অনৃতং বা অসত্যের জয় হয় না (অসত্য কভু সুখ দেয় না) (৫৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। ধৃষ্টতা পরিহার করেও বলা যাবে—যাঁরা ভাবেন, রাজনীতি তথা রাজ্যশাসনের সঙ্গে ধর্মনীতির কোনই সম্পর্ক নেই, তাঁদের জেনে রাখা ভাল যে তাঁরা রাজনীতি জানেন না। রাজনীতির ভিত্তি যে ধর্মনীতি সে কথা আর একবার

'মহাভারত' পড়ে জেনে নেওয়া তাঁদের পক্ষেও মঙ্গল দেশের পক্ষেও মঙ্গল।

বেদান্তে যিনি "রসো বৈ সঃ", তিনিই যে ব্রজেশতনয় রসিকেন্দ্র-চূড়ামণি কৃষ্ণচন্দ্র, এ তত্ত্বারূঢ় হয়ে যাঁরা ভগবদ্‌মুখী হন তাঁরা শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্যলীলায় ডুবে থাকেন। ভগবানের ঐশ্বর্যলীলায় তাঁদের বিন্দুমাত্র আকর্ষণ নেই। মুহুর্মুহু ভগবৎ রসমালয় পানরত ভাবনাচতুর রসিক ভক্তবৃন্দ ব্যক্ত করলেন —ব্রজের কৃষ্ণই পূর্ণতম, আর মথুরার কৃষ্ণ পূর্ণতর এবং দ্বারকার কৃষ্ণ পূর্ণ মাত্র ; যদুনন্দন কৃষ্ণ অন্য, যিনি গোপনন্দন তিনি বৃন্দাবন ত্যাগ করে অন্য কোথাও কখনো যান না। এ বিষয়ে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের মিলিতবিগ্রহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপাভিলাষ অতীব হৃদয়গ্রাহী ছন্দে ব্যক্ত করেছেন বিশ্ব-ভক্তের নাথ এবং ভক্তি-রস-চক্রের চক্রবর্তী বৈষ্ণবাচার্য শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী পাদ :—

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশতনয়ঃ তদ্ধাম বৃন্দাবনং
রম্যা কাচিদুপাসনা ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্‌ভাগবতং প্রমাণমমলং প্রেমা পুমর্থো মহান্
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং তত্রাদরো নঃ পরঃ ॥

বৃন্দাবনের ভজনই শ্রেষ্ঠ ভজন। "গোপ বেশ বেণুকর নবকিশোর নটবর"ই একমাত্র আরাধ্য। শ্রীমদ্ভাগবতের প্রদর্শিত পথই এক-মাত্র পথ। কৃষ্ণপ্রেমই একমাত্র কাম্য বস্তু। শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর এই সিদ্ধান্তের ওপর আর কোন তত্ত্ব নেই।

পরম প্রীতি উৎপাদন বা প্রিয়তম কার্যসাধনই শ্রেষ্ঠতম পূজা বা সাধনা। তাই পরমতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণের প্রীতি উৎপাদনই জীবের পরম সাধ্য। আর শুদ্ধাভক্তিই হচ্ছে একমাত্র বস্তু যাতে তাঁর আত্যন্তিক প্রীতি উৎপাদন হয়। সুতরাং শুদ্ধা ভক্তিই হচ্ছে জীবের পরম সাধন। কোন্ বস্তু কার কাছে কত প্রিয় বা কত সুখের সে

সংবাদ অপরের পক্ষে বলা কভু সম্ভব নয়। প্রীতির বিচারক আপন চিতি। গীতায় শ্রীভগবান আঠারটি অধ্যায়ে আঠার প্রকার যোগের পন্থা বলেছেন, যার কোন একটিকে অবলম্বন করেই তাঁর সঙ্গে যুক্ত হওয়া যায়। তাঁকে লাভ করা যায়। শ্রীমদ্‌ভাগবত এতসব যোগাদিকে সংক্ষেপ করে মাত্র পাঁচটি পন্থার কথা বললেন—বৈর (শত্রুভাব), ভক্তি, ভয়, স্নেহ এবং কাম। এর যে কোন একটি ভাব অবলম্বন করলেই তাঁতে যুক্ত হওয়া যায়। এত সব পন্থা-পদ্ধতির মধ্যে কোনটি ভগবানের সব চাইতে বেশী প্রীতি উৎপাদন করে—সে সংবাদ জানতে হলে তাঁর কাছথেকে জেনে নেওয়াই সর্বোত্তম। গীতায় শ্রীমুখ-বাণী থেকে পাই—

ক) জ্ঞানীও তাঁর অতীব প্রিয় (৭।১৭)।

খ) যার মন ও বুদ্ধি তাঁতে অর্পিত, সে তাঁর প্রিয় ভক্ত (১২।১৪)।

গ) হর্ষ-বিষাদ ও ভয়-উদ্বেগমুক্ত জন তাঁর প্রিয়ভক্ত (১২।১৫)।

ঘ) সব সকাম কর্মের অনুষ্ঠান-ত্যাগী তাঁর প্রিয় ভক্ত (১২।১৬)।

ঙ) যে ভক্তিমান শুভাশুভ কর্ম ত্যাগ করেছে সে তাঁর প্রিয়(১২।১৭)

চ) নির্দিষ্ট বাসস্থানহীন স্থিরবুদ্ধি ও ভক্তিমান ব্যক্তি তাঁর প্রিয় (১২।১৯)।

ছ) তন্মনা শ্রদ্ধাবান ভক্তগণ তাঁর অতীব প্রিয় (১২।২০)।

উল্লিখিত ভগবৎ বাক্যসমূহে দেখাযাবে ভক্তগণই ভগবানের সর্বাপেক্ষা প্রিয়। অর্থাৎ ভক্তিমার্গই সর্বশ্রেষ্ঠ। ভক্তিমার্গের শ্রেষ্ঠত্বের কারণও শ্রীভগবান তাঁর প্রিয়তম ভক্ত উদ্ধবকে বলেছেন

যৎ কর্ম্মভির্যৎ তপসা জ্ঞানবৈরাগ্যতশ্চ যৎ।
যোগেন দানধর্ম্মেণ শ্রেয়োভিরিতরৈরপি॥
সর্ব্বং মদ্ভক্তিযোগেন মদ্ভক্তো লভতেঽঞ্জসা।
স্বর্গাপবর্গং মদ্ধাম কথঞ্চিদ্‌যদি বাঞ্ছতি॥

—ভাগবত ১১।২০।৩২-৩৩

অর্থ—কর্মদ্বারা, তপস্যা—জ্ঞান—বৈরাগ্য দ্বারা, যোগ ও দান ধর্মাদিদ্বারা বা শ্রেয়ঃ সাধন অন্যান্য কর্মদ্বারা যা লাভ করা যায়, তৎ সমস্ত এবং স্বর্গ, মুক্তি এমনকি আমার বৈকুণ্ঠ লোকও যদি অভিলাষ করে, তবে আমার ভক্ত আমার প্রতি ভক্তিদ্বারা তা সবও তৎক্ষণাৎ লাভ করে থাকে।

ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাঙ্খ্যং ধর্ম উদ্ধব।
ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো যথা ভক্তির্মমোর্জ্জিতা॥

ভাগবত ১১।১৪।২০

অর্থ—হে উদ্ধব! আমার সাধনাত্মিকা ভক্তি যেরূপ আমাকে পাইয়ে দিতে পারে, অষ্টাঙ্গযোগ, সাংখ্য ও অন্য যোগশাস্ত্র, বেদাধ্যয়ন, তপস্যা ও ত্যাগ তদ্রূপ পারে না।

শুধু তাই নয়। ভগবান আরো অধিক গুরুত্বপূর্ণ বাক্য বলেছেন—**অহং ভক্তপরাধীনঃ হি অস্বতন্ত্র ইব দ্বিজ** —হে দ্বিজ, আমি ভক্তের অধীন এবং স্বাধীনতারহিত (ভাগবত ৯।৪।৬৩)।

ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ শ্রদ্ধয়াত্মা প্রিয়ঃ সতাম্।
ভক্তিঃ পুনাতি মন্নিষ্ঠা শ্বপাকানপি সম্ভবাৎ॥

ভাগবত ১১।১৪।২১

অর্থ—শ্রদ্ধাসহকারে কৃত একনিষ্ঠ ভক্তিদ্বারাই প্রিয় আত্মা আমাকে সজ্জনগণ প্রাপ্ত হয়। আমাতে দৃঢ়াভক্তি কুক্কুরমাংসভোজী নীচ জাতিকেও জাতিগত দোষ হতে পবিত্র করে।

যোগস্য তপসশ্চৈব ন্যাসস্য গতয়োঽমলাঃ।
মহর্জনস্তপঃ সত্যং ভক্তিযোগস্য মদ্গতিঃ॥

ভাগবত ১১।২৪।১৪

অর্থ—(শ্রীভগবান উদ্ধবকে বলছেন) যোগ, তপস্যা ও সন্ন্যাসের নির্মল গতি মহঃ জন তপঃ ও সত্যলোকে হয়। আর ভক্তিযোগের গতি হয় মদীয় বৈকুণ্ঠ লোকে।

ভক্তিলাভের উপায় সম্পর্কে শৌনকাদি ব্রাহ্মণগণের প্রশ্নে রোমহর্ষণপুত্র উগ্রশ্রবা সূত বললেন—

নষ্টপ্রায়েম্বভদ্রেষু নিত্যং ভাগবতসেবয়া।
ভগবত্যুত্তমঃশ্লোকে ভক্তির্ভবতি নৈষ্ঠিকী ॥

ভাগবত ১।২।১৮

অর্থ—সর্বক্ষণ বৈষ্ণব-পরিচর্যা ও ভাগবত শ্রবণ-কীর্তন করতে করতে অমঙ্গল অর্থাৎ ভক্তিবিরুদ্ধ বস্তু ধ্বংসপ্রায় হলে উত্তমকীর্তি শ্রীকৃষ্ণে মানবের অচলা ও বিক্ষেপরহিতা ভক্তির উদয় হয়।

নারদীয় ভক্তিসূত্রের সপ্তম সূত্র বলছেন—

ওঁ সা ন কাময়মানা নিরোধরূপত্বাৎ ॥ ৭ ॥

অর্থ—ভক্তি কামনার বিষয় নয়, কারণ ভক্তি নিরোধস্বরূপ। অর্থাৎ ভক্তিকে কামনা করে খুঁজতে হয় না। ভক্তি আমাদের ভিতরেই আছে। অন্তরের কামনা বাসনা প্রভৃতি কতগুলি প্রবৃত্তিকে নিরোধ (দমন) করলেই ভক্তি আপনা হতে ফুটে ওঠে।

এইসব শাস্ত্রবাক্যের ভিতরেই ভক্তির তারতম্যের ইঙ্গিত আছে। বস্তুতঃ আমাদের দৈহিক-মানসিক গঠনপ্রক্রিয়ায় সত্ত্ব-রজঃ-তমঃ গুণের ন্যূনাধিক্যবশতঃ এবং সাধন-ভজনের স্তরভেদে ভক্তির তারতম্য ঘটে। এ বিষয়ে বিস্তৃত তত্ত্ব পাওয়া যাবে গীতার ১৭।১-২২শ ও ১৮।১৯-৩৯শ শ্লোকাদিতে এবং ভাগবতের বিভিন্ন অংশে, বিশেষ করে একাদশ স্কন্ধের পঞ্চম অধ্যায় থেকে উনত্রিশ অধ্যায়ের শ্লোকাদিতে। ঐসব শাস্ত্রপ্রমাণাদির সার বক্তব্য হল—সালোক্য, সার্ষ্টি, সামীপ্য, সারূপ্য ও সাযুজ্য এই পঞ্চবিধ মুক্তি-বাঞ্ছারহিতা ও ফলাভিসন্ধানশূন্যা (অহৈতুকী) এবং ভেদদর্শনরহিতা (অব্যবহিতা) নির্গুণা ভক্তিই সর্বোত্তমা (ভাগবত ৩।২৯।১১-১৪)। এই অহৈতুকী নির্গুণা নিষ্কামা ভক্তি কেবলমাত্র কৃষ্ণপ্রীত্যর্থে হলেই তা প্রেম নামে অভিহিত হয়। প্রেমই পঞ্চম পুরুষার্থ। পরমতম সাধন।

ভক্তি শাস্ত্রের ব্যাখ্যাতাগণ বলেছেন, ভক্তি দুই প্রকার—বৈধীভক্তি এবং রাগানুগা ভক্তি। যাঁরা শাস্ত্রের নির্দেশে পুণ্য-লোভে ভজন করেন তাঁদের বৈধীভক্তি। আর যাঁরা শ্রীকৃষ্ণে প্রগাঢ় অনুরাগবশতঃ শাস্ত্রবিধি ভুলে পাপপুণ্য পরিহরি ভজন করেন তাঁদের রাগানুগাভক্তি। পাপপুণ্য উভয়ের নিবৃত্তি হলে তবেই রাগানুগায় প্রবেশাধিকার। রাগানুগা ভক্তি হতেই প্রেমের উদয়।

সর্বশাস্ত্র মন্থন করে প্রেমের বিকাশ এভাবে বর্ণন করেছেন শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—

কোন ভাগ্যে কোন জীবের শ্রদ্ধা যদি হয়।
তবে সেই জীব সাধুসঙ্গ করয় ॥
সাধুসঙ্গ হৈতে হয় শ্রবণ কীর্তন।
সাধনভক্ত্যে হয় সর্বানর্থ-নিবর্তন ॥
অনর্থ নিবৃত্তি হৈতে ভক্ত্যে (ভক্তিতে) নিষ্ঠা হয়।
নিষ্ঠা হৈতে শ্রবণাদ্যে রুচি উপজয় ॥
রুচি হৈতে হয় তবে আসক্তি প্রচুর।
আসক্তি হৈতে চিত্তে জন্মে প্রীত্যঙ্কুর (ভাব, রতি)।
সেই ভাব গাঢ় হৈলে ধরে প্রেম নাম।
সেই প্রেম প্রয়োজন সর্বানন্দ ধাম ॥

— মধ্যলীলা, ২৩ পরিচ্ছেদ

প্রেমের স্বরূপ বা প্রেমতত্ত্ব নির্ণয় করা কোন বাক্য বা ভাষাদ্বারা সম্ভব নয়। দেবর্ষি নারদ বলেছেন—

ওঁ অনির্বচনীয়ং প্রেমস্বরূপম্ ॥
ওঁ মূকাস্বাদনবৎ ॥

—নারদীয় ভক্তিসূত্র-৫১, ৫২

অর্থ—প্রেম যে কিরূপ বস্তু তা মুখে বলা যায় না। অনুভবের

বিষয় ॥ বোবা যেমন কোন বস্তু আস্বাদন করে কিরকম রস আস্বাদন করল তার কিছুই বলতে পারে না, শুধু নিজে নিজে অনুভব করে, তেমনি প্রেমিক প্রেমরস আস্বাদন করে কাউকে সে রসের পরিচয় দিতে পারে না।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলছেন—প্রেমতত্ত্ব এবং রাধাতত্ত্বরূপ একই বস্তু। যথা—

*　　*　　*　　*　　*

হ্লাদিনীর সারাংশ তার প্রেম নাম।
আনন্দ-চিন্ময় রস প্রেমের আখ্যান॥
প্রেমের পরম সার মহাভাব জানি।
সেই মহাভাবরূপা রাধা ঠাকুরাণী॥
সেই মহাভাব হয় চিন্তামণি সার।
কৃষ্ণবাঞ্ছা পূর্ণ করে এই কার্য্য যার॥

মধ্য—৮ম পরিচ্ছেদ।

*　　*　　*　　*　　*

আত্মেন্দ্রিয় প্রীত বাঞ্ছা তারে বলি কাম।
কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীত ইচ্ছা ধরে প্রেম নাম॥
কামের তাৎপর্য্য নিজ সম্ভোগ কেবল।
কৃষ্ণ-সুখ তাৎপর্য্য হয় প্রেম মহাবল॥ আদি, ৪র্থ পরিচ্ছেদ।

প্রেমের রূপ-কলা প্রভৃতি বিস্তৃত প্রামাণ্য প্রকরণ-বিধি জানবার কৌতূহল মেটাতে শ্রীপাদ শ্রীরূপ গোস্বামিকৃত, "শ্রীশ্রীউজ্জ্বলনীল-মণির" আশ্রয় ভিন্ন অন্য উপায় নেই। নায়ক-নায়িকার বিভিন্ন রসস্তরের প্রকার-প্রকরণ ভেদ থেকে শুরু করে প্রেমরসের যত প্রকার ভিন্নান-বিভাগ সম্ভব তার সব বৈচিত্র এই শ্রীগ্রন্থে বিধৃত।

প্রেমভক্তি লাভের একটি গুপ্ত পথ বা কৌশল হচ্ছে সাধুসঙ্গ

বা মহতের কৃপা। ভাগবত থেকে আরম্ভ করে সমস্ত ভক্তিশাস্ত্র এই বিষয়টির উপর সর্বাপেক্ষা বেশী গুরুত্ব আরোপ করেছেন। এ বিষয়ে ভাগবতের ভাষাকে সাবধান-বাণী বললে এতটুকু অধিক বলা হবে না। যথা—

শ্রীমদ্‌ভাগবতে—

(১) রহূগণৈতৎ তপসা ন যাতি,
ন চেজ্যয়া নির্বপণাদ্ গৃহাদ্ বা।
নচ্ছন্দসা নৈব জলাগ্নিসূর্যৈঃ,
বিনা মহৎপাদরজোঽভিষেকম্ ॥ ৫।১২।১২

অর্থ—হে রহূগণ, মহাজনের পদধূলিদ্বারা অভিষেক ভিন্ন তপস্যা, বৈদিক যজ্ঞক্রিয়াদি, অন্নাদি দান, গৃহনিমিত্ত পরোপকার, বেদপাঠ ইত্যাদি দ্বারা এবং জল, অগ্নি ও সূর্যের উপাসনা দ্বারা এই তত্ত্ব-জ্ঞান বা ব্রহ্মলাভ হতে পারে না।

(২) নৈষাং মতিস্তাবদুরুক্রমাঙ্ঘ্রিং
স্পৃশত্যনর্থাপগমো যদর্থঃ।
মহীয়সাং পাদরজোঽভিষেকং
নিষ্কিঞ্চনানাং ন বৃণীত যাবৎ॥ ৭।৫।৩২

অর্থ—(প্রহ্লাদ-বচন) বিষয়াভিমানরহিত মহত্তমদিগের চরণরেণুদ্বারা যাবৎ অভিষেক না হয়, তাবৎ এদের মতি ভগবৎ চরণ স্পর্শ করতে পারে না। এইরূপ মতি হলে ভববন্ধন নাশ হয়।

(৩) লভতে ময়ি সদ্‌ভক্তিং মৎস্মৃতিঃ সাধুসেবয়া॥
১১।১১।৪৭

অর্থ—(শ্রীভগবান উদ্ধবকে বলছেন)** আর কেবলমাত্র সাধুসেবা দ্বারা আমাতে জ্ঞান লাভ হয়ে থাকে।

(৪) প্রায়েণ ভক্তিযোগেন সৎসঙ্গেন বিনোদ্ধব।
নোপায়ো বিদ্যতে সধ্র্যঙ্, প্রায়ণং হি সতামহম্॥
১১।১১।৪৮

অর্থ—হে উদ্ধব! সৎসঙ্গজাত ভক্তিব্যতীত সম্যক্ সংসারতরণের অন্য উপায় নেই, কেননা আমি একমাত্র সাধুগণেরই আশ্রয়।

(৫) **ব্রতানি যজ্ঞশ্ছন্দাংসি তীর্থানি নিয়মা যমাঃ।**
যথাবরুন্ধে সৎসঙ্গঃ সর্ব্বসঙ্গাপহো হি মাম্॥

১১।১২।২

অর্থ—(শ্রীভগবান উদ্ধবকে বলছেন) সর্বসঙ্গনাশক সৎসঙ্গ আমাকে যেরূপ বশ করতে পারে, বেদ ব্রত যজ্ঞ তীর্থ নিয়ম যম—কেউই আমাকে তাদৃশরূপে বশীভূত করতে পারে না।

(৬) **বহবো মৎপদপ্রাপ্তাস্ত্বাষ্ট্রকায়াধবাদয়ঃ।**
বৃষপর্ব্বা বলির্বাণো ময়শ্চাথ বিভীষণঃ॥
সুগ্রীবো হনুমানৃক্ষো গজো গৃধ্রো বণিক্পথঃ।
ব্যাধঃ কুব্জা ব্রজে গোপ্যো যজ্ঞপত্ন্যস্তথাপরে॥
তে নাধীতশ্রুতিগণা নোপাসিতমহত্তমাঃ।
অব্রতাতপ্ততপসঃ সৎসঙ্গান্মামুপাগতাঃ॥

১২।১২।৫-৭

অর্থ—বৃত্র প্রহ্লাদ বৃষপর্বা বাণ ময় সুগ্রীব হনুমান জাম্ববান গজ জটায়ু বৈশ্য তুলাধার ধর্মব্যাধ ব্রজের কুব্জা গোপীগণ যজ্ঞপত্নীগণ এবং অপরাপর অনেকে আমার পদ প্রাপ্ত হয়েছে। তারা বেদ পড়ে নাই, মহতের সেবা করে নাই, ব্রত তপস্যাদির আচরণও তাদের নেই; তথাপি মাত্র সৎসঙ্গে আমাকে প্রাপ্ত হয়েছে।

এই সব শাস্ত্রবচন এবং ভগবৎ বচন থেকে সাধুর অপার মহিমা যেমন জানা যায় তেমনি ভগবদ্দর্শনের মত সাধুদর্শনের দুষ্প্রাপ্যতাও সহজে অনুমান করা যায়। সুতরাং আমরা যখন তখন সাধুদর্শন আশা করতে পারি না। আর যদিবা ভাগ্যগুণে দর্শন হয়, তাঁকে কি উপায়ে চিনতে বুঝতে হয় সে জ্ঞানই বা আমাদের কোথায়! এই জটিল প্রশ্নের সহজ সমাধান করে দিয়েছেন শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বয়ং এই বচনদ্বারা—

"যাঁহার দর্শনে মুখে আইসে কৃষ্ণনাম।
তাঁহারে জানিহ তুমি বৈষ্ণব প্রধান ॥"

—চৈতন্যচরিতামৃত, মধ্য—১৬ পরিচ্ছেদ।

এমন সুদুর্লভ দর্শন জীবের ভাগ্যে কতক্ষণের জন্য আবশ্যক, অথবা কতটুকু সময়ের সাধুসঙ্গে জীবের পরম মঙ্গল লাভ হয়? তার উত্তরে—

(১) সংসারেঽস্মিন্ ক্ষণার্দ্ধোঽপি সৎসঙ্গঃ শেবধির্নৃণাম্।

ভাগবত ১১।২।৩০

অর্থ—* * এই সংসারে ক্ষণার্দ্ধের জন্যও সাধুসঙ্গ নিধিস্বরূপ।

(২) ক্ষণমপি সজ্জনসঙ্গতিরেকা,
ভবতি ভবার্ণবতরণে নৌকা। —শ্রীমৎ শংকরাচার্য

অর্থ—ক্ষণকালের জন্যও সাধুসঙ্গই কেবল সংসারসাগর উত্তীর্ণ হবার একমাত্র নৌকাস্বরূপ।

(৩) সাধুসঙ্গ সাধুসঙ্গ সর্বশাস্ত্রে কয়।
লবমাত্র (ক্ষণমাত্র) সাধুসঙ্গে সর্বসিদ্ধি হয় ॥

* * * *

কৃষ্ণভক্তিজন্মমূল হয় সাধুসঙ্গ।
কৃষ্ণপ্রেম জন্মে, পুনঃ তিহো মুখ্য অঙ্গ ॥

প্রেয় বস্তু প্রেমধন প্রাপ্তির জন্য জীবের পক্ষে শ্রেয় কর্তব্য নির্দেশ করেছেন শ্রীশ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু—

সাধুসঙ্গ, নামকীর্তন, ভাগবত শ্রবণ।
মথুরাবাস, শ্রীমূর্ত্তির শ্রদ্ধায়ে সেবন ॥
সকল সাধনশ্রেষ্ঠ এই পঞ্চ অঙ্গ।
কৃষ্ণপ্রেম জন্মায় এই পাঁচের অল্প সঙ্গ ॥

—চৈঃ চরিতামৃত মধ্য—২২ পরিচ্ছেদ।

বেদ-শাস্ত্রোক্ত সর্বপ্রকার তত্ত্ব-নীতির ব্যাখ্যান এবং সকল পুরাণ-শাস্ত্রাদির সারসংকলন 'শ্রীমহাভারতম্' নিজগুণে পঞ্চম বেদের মর্যাদাপ্রাপ্ত। মহাভারতের আর এক নাম মহাপুরাণ। যে সব সত্য সূত্রাকারে বেদাদিতে বিধৃত সেই সব সত্য উপাখ্যান আকারে মহাভারতে লিপিবদ্ধ। মহাভারত ভারতের অধ্যাত্ম-কাননে বেদরূপ বীজ হতে উৎপন্ন পত্র-পুষ্প-ফল শোভিত বিরাট-তম মহীরূহ। পণ্ডিতগণ বলেন—'যা নেই ভারতে, তা নেই ভারতে।' অর্থাৎ মহাভারত মহাপুরাণে যে বিষয়ের অবতারণা করা হয় নি, বা যে তত্ত্বের পরিবেশন হয় নি, তেমন তত্ত্ব নীতি বা আদর্শের উদাহরণ সারা ভারতবর্ষেও নেই। মহাভারতের তত্ত্ব-নির্যাস হচ্ছেন 'শ্রীমদ্‌ভগবদ্ গীতা উপনিষদ্।' লক্ষশ্লোকাত্মক সংহিতা মহাভারত প্রধানতঃ আঠারটি মূল পর্বে বিভক্ত। আবার প্রতিটি প্রধান পর্বের ভিতর অনেক ছোট ছোট পর্ব বা অনুপর্ব আছে। ভীষ্মপর্বের তেমন একটি অনুপর্বের নাম হচ্ছে "শ্রীমদ্ ভগবদ্‌গীতাপর্ব", যা আরম্ভ হয়েছে মূল পর্বের ১৩শ অধ্যায় থেকে। তারও অনেক পরে—পঁচিশ অধ্যায় থেকে বিয়াল্লিশ অধ্যায়মধ্যে শ্রীগীতা উপনিষদ্ গীত হয়েছেন বা কীর্তিত হয়েছেন। যদিও এই যোগশাস্ত্র উক্ত অনুপর্বের নাম অনুসারে "শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা" বলেই সর্বত্র পরিচিত, কিন্তু এঁর প্রকৃত নাম—শ্রীমদ্‌ভগবদ্ গীতা উপনিষদ।" তার প্রমাণ লেখা আছে এঁর প্রতি অধ্যায়ের শেষে; যথা—শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়া-সিক্যাং ভীষ্মপর্বণি শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতাপর্বণি শ্রীমদ্‌ভগবদ্ গীতা-সূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে * * প্রভৃতি বাক্যে। 'উপনি-ষৎ' শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ বলেই 'গীত' শব্দ 'গীতা' হয়েছে। আর সেই ব্রহ্মবিদ্যা প্রকাশক 'উপনিষৎ' শব্দ বাদ দিয়েই আমরা শ্রীমুকুন্দ-মুখারবিন্দ বিনিঃসৃত সর্বোত্তম উপনিষদ্‌কে শুধু "ভগবদ্‌গীতা"

বলছি। ভগবদ্‌গীতা বললে যেমন ভগবৎ বিষয়ক যে কোন সঙ্গীত বুঝাতে পারে, তেমনি আবার এই অনুপর্বের ১৩শ থেকে ২৪শ অধ্যায়ের মধ্যে যে কোন আখ্যানকেও বুঝাতে পারে। শিরোনাম থেকে 'উপনিষদ্' শব্দকে বাদ দেওয়ার যুক্তি বুঝা শক্ত। 'উপনিষদ্' শব্দ বাদ পড়লে এই শাস্ত্রের মূল অভিপ্রায় যে ব্রহ্মবিদ্যা কীর্তন তা অস্পষ্ট থাকে। আবার 'উপনিষদ্' শব্দ যুক্ত হলে এ'র আধ্যাত্মিক মহিমা-মর্যাদা অবশ্যই অনেকগুণে বৃদ্ধি পায়।

"সর্ব্বোপনিষদঃ গাবো...... দুগ্ধংগীতামৃতং মহৎ" এর ক্ষীরস্বরূপ হল— "**সর্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ**"— সকল ধর্ম পরিত্যাগ করে তুমি একমাত্র আমারই শরণ লও (১৮।৬৬)। এই ভগবদ্‌বাক্যের ব্যাবহারিক ভাষ্য হচ্ছেন "শ্রীমদ্‌ ভাগবতম্"। ভাগবতের রস-নির্যাস হচ্ছে—

ন পারয়েঽহং নিরবদ্যসংযুজাং
স্বসাধুকৃত্যং বিবুধায়ুষাপি বঃ।
যা মাভজন্ দুর্জ্জরগেহশৃঙ্খলাঃ
সংবৃশ্চ্য তদ্বঃ প্রতিযাতু সাধুনা॥ ১০।৩২।২২

অর্থ—(কেহ কেহ ভজনাকারীর অনুভজন করে, কেহ এর বিপরীত-ভাবে ভজনা করে, আবার কোন কোন জন উভয়ের কাউকেই ভজনা করে না—তাঁরা কি রকম ব্যক্তি? রাসক্রীড়ার ঠিক পূর্বলগ্নে গোপীগণের এই সব প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন গোপীমনচোর শ্রীকৃষ্ণ) আমার সাথে তোমাদের যে সংযোগ তা কামময়ত্বরূপে প্রতীয়মান হলেও বস্তুতঃ নির্মল প্রেমবিশেষময়ত্ব হেতু দোষবিবর্জিত হয়েছে। এবং কুলবধূত্বপ্রযুক্ত যা পরিত্যাগে অসমর্থা, তোমরা সেই গৃহ-সম্বন্ধি ঐহিক ও পারলৌকিক সুখকর লোকধর্ম- মর্যাদা নিঃশেষরূপে ছেদন করত আমাকে ভজনা করেছ। সুতরাং দেবপরিমিত আয়ুর দ্বারাও তোমাদের প্রতি আমার প্রত্যুপকার কৃত্য সম্পাদনে

সমর্থ হব না। অতএব তোমাদের সাধুত্ব দ্বারাই তোমাদের কৃত সাধুকৃত্য প্রত্যুপকৃত হোক। (অর্থাৎ তোমাদের প্রেমের প্রতিদান দিতে আমি অপারগ।)

ব্রজগোপীগণের যে প্রেমের কাছে প্রেমসিন্ধু শ্যামবঁধু হেরে গিয়ে ঐরূপ প্রেমলোলুপ উত্তর দিয়েছেন, ব্রজের সেই অনর্পিত প্রেমের স্বাদ জীবকে আস্বাদন করাতেই "শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের" আবির্ভাব, যাঁর উপদেশসার হল—

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥

—বৃহন্নারদীয় পুরাণ ৩৮।১২৬

এই শ্লোকের মূল শিকড় রয়েছে ভাগবতের ১২।৩।৫২শ শ্লোকে। যথা—**কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ।**
দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্ত্তনাৎ॥

অর্থ—সত্যযুগে বিষ্ণুর ধ্যানে, ত্রেতায় যজ্ঞদ্বারা এবং দ্বাপরে সেবা-পরিচর্যা দ্বারা যা লাভ হয়, সে সমস্তই কলিতে কেবল নামসংকীর্তন দ্বারাই লাভ হয়ে থাকে।

যদিও এই শ্লোকে এমন কোন ভাব নেই যে, কলিতে ধ্যান যজ্ঞ বা সেবা-পূজাদি নিষিদ্ধ, তবু এ বিষয়ে কোন কোন মহলে একটা ধারণা আছে যে, কলিতে শ্রীনামসংকীর্তন ভিন্ন অন্য কোন প্রকার সাধ্য-সাধন নেই, এবং অন্য কোন যুগেও নামকীর্তনাদির ব্যবস্থা ছিল না। ঐ শ্লোকের যদি এরূপ অর্থ গ্রহণ করা হয় যে, কলিতে ধ্যান নেই, সেবাপরিচর্যা নেই, যজ্ঞ নেই; শুধু নাম-কীর্তনের বিধি আছে; তা হলে বহু ক্ষেত্রে শাস্ত্র-বিরোধ দেখা দেবে না কি! সাধন-ভজন স্থাণুবৎ হয়ে পড়বে না কি! যেমন—

(ক) ভাগবতের ৭।৫।২৩শ শ্লোকে শ্রবণ কীর্তন বিষ্ণুস্মরণ

পাদসেবন অর্চনা বন্দনা দাস্য সখ্য ও আত্মনিবেদন এই নববিধা ভক্তি-অঙ্গ সাধনের কথা বলা আছে। যদি কীর্তন শ্রবণ এবং কীর্তন করণ—শুধু এদুটি অঙ্গকে স্বীকার করা হয় তবে ভক্তিধর্ম ব্যাহত হবে না কি!

ভক্তির অপর সাতটি অঙ্গের আচরণ-অনুষ্ঠান কলিতে নিষিদ্ধ হতে পারে কি!

(খ) ভাগবতের ৮।২৩।১৬শ শ্লোকে বলা হয়েছে—ক্রিয়া-কর্মাদিতে স্বরাদির ভ্রংশ এবং অনুষ্ঠানাদির ব্যতিক্রমহেতু দেশ কাল পাত্র এবং দক্ষিণাদি দ্বারা যা অসম্পূর্ণ থাকে, সেই সকল একমাত্র ভগবৎ নাম কীর্তনেই পরিপূর্ণ হয়। এখানে ক্রিয়াকর্ম অনুষ্ঠানাদিতে নিশ্চয়ই সেবা পূজা যাগযজ্ঞাদি বুঝাচ্ছে। যদি এসব বস্তু কলিতে অবিধেয় তবে নামকীর্তন কোন্ সব অনুষ্ঠানের ত্রুটিবিচ্যুতি ক্ষালন করবে? অপর পক্ষে, ভাগবতের এই শ্লোকেই কলিতে ধ্যানধারণা সেবাপূজা যাগযজ্ঞাদিকে স্বীকার করে নেয় নাই কি?

(গ) শ্রীগৌরসুন্দর স্বয়ং অন্যত্র (১১৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) সাধুসঙ্গ, নামকীর্তন, ভাগবত শ্রবণ, মথুরাবাস এবং শ্রীমূর্তি-সেবন এই পঞ্চ অঙ্গ সাধনের নির্দেশ দিয়েছেন। শুধু নামকীর্তন স্বীকার করলে তা মহাপ্রভুর এই নির্দেশের পরিপন্থী হবে না কি! রসের ভজন ব্যাহত হবে না কি?

(ঘ) ধ্যান তপস্যা যজ্ঞাদিকে কলিতে স্বীকার না করা হলে উপনিষদ্-কথিত ব্রহ্মজ্ঞান লাভে যেমন বিঘ্ন আসবে তেমনি বেদ-উপনিষদের সঙ্গে ভাগবতের বিরোধ দেখা দেবে। অথচ এঁদের মধ্যে কোন প্রকার বিরোধ নেই। উপনিষদীয় ব্রহ্মজ্ঞানের এবং ভাগবতীয় ভক্তিধর্মের যে একই ভাব-ভাষা-সুর তার একটি প্রমাণ দিচ্ছি:—

ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিঃ ছিদ্যন্তে সর্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে॥

মুণ্ডক উপনিষদ্ ২।২।৯

অর্থ—সেই পরাবর (কারণরূপে শ্রেষ্ঠ এবং কার্যরূপে অশ্রেষ্ঠ) ব্রহ্মকে আত্মারূপে দর্শন করলে হৃদয়গ্রন্থি (অবিদ্যাজনিত অহংজ্ঞান) বিনষ্ট হয়ে সমুদয় সংশয় ছিন্ন হয়। ফলে এই দ্রষ্টার মোক্ষ-বিরোধী কর্মসমূহ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়।

ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিঃ ছিদ্যন্তে সর্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্মাণি ময়ি দৃষ্টেঽখিলাত্মনি॥

ভাগবত ১১।২০।৩০

অর্থ—(উদ্ধবকে ভক্তিযোগের কথা বলছেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ) আমি অখিলাত্মা, আমাকে যিনি দর্শন করেন তাঁর হৃদয়গ্রন্থি ছিন্ন হয়, সকল সংশয় ছিন্ন হয় এবং সমস্ত কর্মের ক্ষয় হয়ে থাকে।

সুতরাং কলিতে নামকীর্তন ভিন্ন অন্য কোন সাধন নেই, এ কথা বললে তা শাস্ত্রবিরোধী হবে না কি! কোন শাস্ত্রেই বিশেষ করে ভাগবতে এমন কোন ভাব থাকতে পারে না যা বেদবিধি বিরোধী। ভাগবতে কোন স্ববিরোধী বাক্যও কল্পনাতীত। তাঁর ১২।৩।৫২শ শ্লোকের সঙ্গে ৭।৫।২৩শ এবং ৮।২৩।১৬শ শ্লোকদ্বয়ের মূলতঃ কোন প্রকার বিরোধ নেই। বিরোধ যদি কিছু মনে হয় তা আমাদের জ্ঞান-অজ্ঞানের দ্বন্দ্ব। শাস্ত্রের সঠিক ভাব গ্রহণ করতে পারি না বলেই এরূপ দ্বন্দ্ব-বিরোধের কল্পনা করি।

আমরা আর এক ভাবে এ বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করতে পারি বহুজনগ্রাহ্য কোন সমাধানের আশায়। সত্য ত্রেতা দ্বাপর ও কলি—শাস্ত্রানুযায়ী এই চার যুগের কালবিভাগ আছে এবং চক্রাকারে যুগগুলি একের পর এক ঘুরে আসে। বর্তমানে ২৮তম

কলিযুগ চলছে। ইহা নৈসর্গিক জগতের কালবিভাগ। কিন্তু একটু লক্ষ করলেই বুঝা যাবে যে, সাধক-জীবনে যেমন, আমাদের সাধারণ জীবনেও তেমনি সকলকেই এক জনমেই এই চারটি যুগকে অতিক্রম করতে হয়। তবে সাধারণ সংসারীর পরিক্রমা শুরু হয় সত্যযুগ থেকে, আর সাধকের পরিক্রমা শেষ হয় সত্য-যুগে, এই যা পার্থক্য। সাধারণের শৈশব-পৌগণ্ড সত্যযুগ। তখন চিত্তক্ষেত্রে সত্য পূর্ণমাত্রায় বিরাজ করে। তাই শিশুর মুখে স্বর্গীয় লাবণ্য, যা সকলকেই আকর্ষণ করে। স্বভাব-ক্রূর সর্প এসে শিশুর সঙ্গে খেলা করেছে, এমন কাহিনীও জানা আছে। কৈশোর ত্রেতা যুগ। এ সময়ে মনে শ্রীরামের মত সত্যনিষ্ঠা ও দৃঢ়তা। যৌবনে দ্বাপরসম লাস্যলীলাচঞ্চল মন। বার্দ্ধক্য চিন্তা-জরাগ্রস্ত কলি।

সাধন-জগতের উলটো গতি। সাধনার পূর্বে চিত্তক্ষেত্র যখন কলুষ-কালিমায় মাখামাখি তখনই ঘোর কলিকাল। এই কলিকালে ভগবৎ নামকীর্তনাদি শ্রবণে-কীর্তনে অথবা সাধু-ভক্ত সঙ্গে ভগবৎপ্রসঙ্গ শ্রবণে-কীর্তনে সংসার যন্ত্রণা হতে মুক্তিপেতে একটা লোভ যদি কোন পুণ্যে জন্মে তখনই ভজনের ইচ্ছা জাগে। ভগবানের নামকীর্তন শ্রবণ-গ্রহণ বিনা কলিহত জীবের ভজনে মতিগতি-প্রবৃত্তির উদয় কখনই হয় না। ইহাই "কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা।" নামের আকর্ষণেই জীব নামীর পিছে ছোটে। ভজন আরম্ভ হলে যখন ভগবৎ লীলাদিতে আকর্ষণ জন্মে তখন সাধকের দ্বাপর যুগ। সংসারে তখনও মনের খানিকটা পড়ে আছে, আবার ভগবৎ রসেও মন টানছে। জীবন-নদীর দুপারেই মন দ্বিধা হয়ে আছে—ইহাই দ্বাপর। দ্বাপর যুগের দ্বিধা-দ্বন্দ্ব কাটিয়ে ওঠার প্রধান শক্তি-প্রেরণা লাভ হয় গুরু-বৈষ্ণব-ভাগবতের সেবা-পরিচর্যা দ্বারা। ইহাই দ্বাপরের "পরিচর্যায়াং"। সংসারমায়া

থেকে মনের আধখানা তুলে এনে ভজনে লাগাতে পারলেই ত্রেতা যুগের শুরু। তখন ভজনে নিষ্ঠা দৃঢ়তা বাড়ে, তৃতীয় নয়ন তৈরী হতে থাকে। অর্থাৎ শুদ্ধজ্ঞান লাভ হতে থাকে। ঐ জ্ঞানচক্ষুর বিকাশার্থ আবশ্যক সাধকের তরল পার্থিব জ্ঞানকে পঞ্চযজ্ঞের—ঋষি-যজ্ঞ (বেদ অধ্যয়ন), ভূতযজ্ঞ (জীবদিগকে খাদ্যদান), পিতৃযজ্ঞ (শ্রাদ্ধ, তর্পণাদি), নৃযজ্ঞ (নরনারায়ণের সেবা) ও দেব যজ্ঞের (দেবদেবীর পূজা হোমাদির) কর্মাগ্নিতে ফুটিয়ে শুদ্ধ-শোধন করে চিত্তক্ষেত্র পাপমুক্ত করত দ্রব্যযজ্ঞ থেকে জ্ঞানযজ্ঞে উন্নীত হওয়া। 'যজ্ঞক্ষপিতকল্মষাঃ'—যজ্ঞ দ্বারা নিষ্পাপ হন (গীতা ৪।৩০)। জ্ঞান-যজ্ঞের পরিপূর্ণতায় সম্যগ্ দৃষ্টি লাভ। ইহাই ত্রেতাযুগের "যজতো মখৈঃ"। তৃতীয় নয়ন খুলে গেলে, অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হলে পর সাধকের সদা সত্যযুগে অবস্থিতি। তখন সত্যভিন্ন দ্বিতীয় কোন বস্তুর অস্তিত্ব নেই। সাধক তখন পূর্ণকাম। সদাই ব্রহ্মভাবনায় ডুবে থাকেন। ইহাই "কৃতে (সত্যযুগে) যৎ ধ্যায়তো বিষ্ণুং"।

এভাবে যদি জীবনটাকে চতুর্যুগে ভাগ করা যায় তবে আর "কলৌ তৎ হরিকীর্ত্তনাৎ" বলতে কোন প্রকার বিরোধের গন্ধ থাকে না এবং ভজনের ক্রমোন্নতি স্বীকৃতি পেয়ে তা রসোত্তীর্ণ হতে পারে।

দ্বিতীয়তঃ। হরিকীর্তনের আক্ষরিক অর্থ হচ্ছে হরির গুণকীর্তন বা লীলা কীর্তন। শাস্ত্রমতে কলিযুগের সঞ্চার হয় শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্ধানের লগ্ন থেকে। কিন্তু তার বহু পূর্বে এমনকি সত্য-ত্রেতাতেও যে ইষ্টোপাসনায় কীর্তনাঙ্গ ছিল তার অনেক প্রমাণ আছে। বরং তখন কীর্তনের প্রচলন আরো বেশী ছিল। প্রাচীন বৈদিক যুগে যখন বেদ-বিভাগ হয়নি তখনই ঋষিরা জেনেছিলেন যে, ধ্যান-আসন প্রভৃতিতে যতনা শীঘ্র মন ইষ্টে নিবদ্ধ হয়, ব্রহ্মবিষয়ক গীতে

ব্রহ্মগুণগানে তার চেয়ে অতি শীঘ্র মন ইষ্টে নিবদ্ধ হয়। একারণে তখন থেকেই যজ্ঞ-হোমাদিতে সমবেত কীর্তনের প্রচলন। তার প্রমাণ সামবেদ। সামবেদ সঙ্গীতগ্রন্থ। ত্রেতায় শ্রীরামচন্দ্রের রাজসভায় বাল্মীকিমুনির অধ্যক্ষতায় লব কুশ পুরো রামায়ণখানা গেয়েছিলেন। পৌরাণিক যুগে অজামিল মৃত্যুসময়ে "হরের্নাম গৃণন্" (ভাগবত ৬।২।৪৯)—হরির নাম উচ্চারণ করে বৈকুণ্ঠলোক প্রাপ্ত হন। এবং রাজা অম্বরীষ শ্রীকৃষ্ণের চরণ-চিন্তায় মন (ধ্যানাদির কথা), বৈকুণ্ঠ ও বৈকুণ্ঠনাথের গুণবর্ণনে বাক্য (কীর্তনের কথা), শ্রীহরির মন্দির মার্জনাদি কার্যে হস্তযুগল (সেবা-পরিচর্যার কথা) এবং শ্রীহরির কীর্তনাদি শ্রবণে শ্রুতি-যুগল নিয়োজিত করেছিলেন (ভাগবত ৯।৪।১৮)। এসব যে দ্বাপর যুগের অনেক পূর্বের কাহিনী তা নিশ্চয় করে বলা যায়। এবার দ্বাপর যুগের কথায় আসি। যজ্ঞ যদি শুধু ত্রেতারই ধর্ম হবে, তবে দ্বাপরে শ্রীকৃষ্ণের উপস্থিতিতে কি ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির যজ্ঞানুষ্ঠান করেন নি? আজ কলিকালেও আমাদের বিবাহাদিতে, নারায়ণ পূজায় এবং দেবী পূজায় যজ্ঞক্রিয়া অপরিহার্য। কলিতে সেবা-পূজা-পরিচর্যা নেই বললে গুরু-সেবাও বাদ পড়বে না কি!

সর্বশাস্ত্রকে সামগ্র্যভাবে গ্রহণ করলে দেখা যাবে, সর্বযুগেই ধ্যান যজ্ঞ সেবা ও কীর্তন দ্বারা ভগবৎ আরাধনা চলে আসছে এবং কলিতে নামের অপার মহিমা কীর্তিত হয়েছে। ভাগবতের ১২।৩।৫২শ শ্লোকের গভীরে প্রবেশ করলে বুঝা যাবে—সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি এই চার যুগে যুগ-বিবর্তনের সঙ্গে ভজনেরও ক্রম-বিকাশ ঘটেছে। সত্যযুগে যাঁ ছিল শুধুই ধ্যানের বস্তু, ত্রেতা যুগে তা ধ্যানীর আরো নিকটবর্তী হয়ে হলেন যজনীয় বস্তু বা পূজ্য বস্তু। আবার যজনের ক্রমোন্নতির ফলস্বরূপ দ্বাপরে সেই বস্তুই যজনশীলের হৃদয়ের আরো কাছে এসে হলেন সেবা-

পরিচর্যার বস্তু। কলিতে সেই বস্তু ভক্তের প্রেমাকর্ষণে নামরূপ পরিগ্রহ করে ভজনশীলের হৃদয়াসনে আসীন। ধ্যানের বস্তুই যুগপরিক্রমা করে শ্রীনাম-রূপ ধারণ করেছেন। ধ্যান, যজ্ঞ-পূজাদি এবং সেবা-পরিচর্যাদির মিলিত তত্ত্ব নিয়ে শ্রীনামের স্বরূপ। ধ্যান-যজ্ঞ-পরিচর্যা না হলে শ্রীনামের পূর্ণাঙ্গ সেবা হয় না।

এভাবে যুগপরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ভজন-রসেরও ক্রমবিবর্তন ঘটেছে। কাল-কটাহে ধ্যান-জপ-যজ্ঞ-পরিচর্যা রূপ জ্বালে জারিত হয়ে সত্যযুগের তরল শান্তরস দ্বাপরে ঘন মধুররসে রূপান্বিত হয়ে পরিপূর্ণতা প্রাপ্ত হয়েছে। রসের উত্তরণ ঘটেছে। শান্তরসের ভজন একটু পরিপক্ক হয়ে ত্রেতায় দাস্যরসে পরিণত হল। যেমন ভক্তবর হনুমান, বিভীষণ প্রভৃতি দাস্যরসের সেবকগণ। দাস্যের ভাব ঘনীভূত এবং অন্তরস্থ হয়ে দ্বাপরে সখ্যরসের রূপ নিল। ভাগবতের ৭।৫।২৩শ শ্লোকে নববিধা ভক্তির উল্লেখে দাস্য এবং সখ্যের পর আত্মনিবেদনের স্তর নির্ধারণ করা হয়েছে। অর্থাৎ ভক্তি-রসতত্ত্বে বাৎসল্য এবং মধুর রসের জন্য আলাদা কোন স্তর নির্ধারিত নেই। সখ্যরসের অধিকারকালে আত্মনিবেদনের বৈশিষ্ট্যে পাত্রভেদে শান্ত দাস্য সখ্য একত্রিত হয়ে বাৎসল্য রসের সৃষ্টি করল। এবং কৃষ্ণগৃহীতমানসা ব্রজস্ত্রীগণ উক্ত চতুর্বিধ রস, একত্র মন্থন করে নবনীত পঞ্চম রস প্রস্তুত করে প্রেম আস্বাদন করল। দ্বাপরের সেই নিভৃত নিকুঞ্জের নিগূঢ় প্রেম আস্বাদন করে আপামর ধন্য হল এই কলিতে।

"পূর্ব পূর্ব রসের গুণ পরে পরে হয়।
দুই তিন গণনে পঞ্চম পর্যন্ত বাড়য়॥
গুণাধিক্যে স্বাদাধিক্য বাড়ে প্রতি রসে।
শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্যগুণ মধুরেতে বৈসে॥

চৈতন্যচরিতামৃত মধ্য—৮ম পরিচ্ছেদ।

মধুর রসের ভজনে শান্ত দাস্য সখ্য ও বাৎসল্য পূর্ববর্তী এই চার প্রকার রসেরও গুণ-আচরণ আছে। অর্থাৎ মধুর রসের ভজনে দাস্যরসের সেবা আছে এবং সখ্য-বাৎসল্যের ভাব-আচরণও আছে। একই তত্ত্বানুযায়ী কলিতে নামকীর্তনে সত্যের ধ্যান, ত্রেতার যজ্ঞ এবং দ্বাপরের পরিচর্যা ক্রিয়াদি এসে যুক্ত হয়েছে। এবং নাম-কীর্তনের পরিপূর্ণতার জন্য অবশ্যই ধ্যান-যজ্ঞ-সেবার প্রয়োজন আছে।

ঈশ্বর-ভজনের সঙ্গে সঙ্গে তদীয় শুভনামেরও ভজন চলে আসছে সত্যযুগ থেকে। যুগযুগ ধরে চিৎ-কটাহে শ্রদ্ধাভক্তি-জ্বালে নাম-রস ঘনীভূত হয়ে কলিতে "যেই নাম সেই কৃষ্ণ" রূপ পরিগ্রহ করেছেন। এর সূচনা শ্রীবৃন্দাবনে। নামের ভিতর নামীর রূপরেখা ফুটিয়ে তুলতে, সেই সঙ্গে নাম-অঙ্গে প্রেমের প্রলেপ দিতেও কৃতবিদ্য রসের একমাত্র কারিগর সেই বিরহকাতরা ব্রজবনিতাগণ। কৃষ্ণ-বিরহের কঠিন বেদনায় হৃদয়ের সবটুকু প্রেমপ্রীতি নিঙাড়ি তাঁরা তাঁদের প্রাণবঁধুর নামরূপ এই নবকলেবর তৈরী করেছেন। সমস্ত শাস্ত্র যেমন ব্যাসদেবের উচ্ছিষ্ট, তেমনি সমস্ত প্রেমতত্ত্বও ব্রজবালার উচ্ছিষ্ট। না, ভাবটি ঠিক হল না। উচ্ছিষ্ট নয়, মহা-প্রসাদ বলাই উত্তম। ভগবানের ভুক্তাবশেষ হয় প্রসাদ। সেই প্রসাদ ভক্তজন গ্রহণ করে যা অবশিষ্ট রাখেন তা হয় মহাপ্রসাদ, প্রসাদ থেকেও মহাশক্তিশালী। প্রেমঘন কৃষ্ণে অর্পিত ও প্রেমের পুত্তলি ব্রজাঙ্গনাদের আস্বাদিত মধুররস জীবের কাছে মহাপ্রসাদ।

কৃষ্ণ মথুরাগমনকালে বিরহাতুরা রোরুদ্যমানা ব্রজস্ত্রীদের "সত্বর ফিরে আসব" এরূপ সপ্রেম প্রবোধবাক্যে সান্ত্বনা দিয়ে-ছিলেন। কিন্তু লীলাময়ের আর আসা হয় নাই। সত্যস্বরূপ শ্রীগোবিন্দ আপন প্রতিজ্ঞা পূরণ করে ছিলেন বিরহকাতরা ব্রজ-বালাদের চিত্তমঞ্জিলে সর্বদা বিশেষভাবে অবস্থান পূর্বক। 'বিরহ"

অর্থে বিশেষ ভাবে বা বিশেষ রূপে রহা বা অবস্থান করা। প্রত্যক্ষ মিলনে যে জাগ্রত রূপের সাক্ষাৎ হয় তাতে অন্ততঃ তিলেকের জন্য হলেও বিচ্ছেদ বা অদর্শন আছে। কিন্তু বিরহে তন্ময়তাপ্রযুক্ত যে ভাবসম্মিলন ঘটে তাতে তিলার্ধের জন্যও বিচ্ছেদ বা অদর্শন নেই। তাই বিরহেই মহামিলন, নিবিড় বা বিচ্ছেদবিহীন মিলন। বিরহ-কাতরা গোপিনীদের এই তন্মনস্কা অবস্থাতেই নামে প্রেম সঞ্চার তথা রূপরেখার বিকাশ বিস্তার। নামের ভিতর প্রেমময় নামীকে সম্পুটিত করেছেন তপ্যমানা গোপীগণ। তাই নামে এত প্রেম, এত পাবনীশক্তি।

এক তিলের অদর্শনও যাঁদের কাছে শতযুগ মনে হয়, তাঁদের আজ শুধু নামই সম্বল। বঁধুয়া ব্রজ ছেড়ে চলে গেছেন বহুদিন। ফিরে তাঁর দর্শন পাওয়া যাবে কি যাবে না, একথা ভাববার অবসরটুকুও যাঁদের নেই, অর্থাৎ শ্যামবঁধু সম্মুখে নেই একথা ভাবতেও যাঁরা জানেন না, তাঁদের অহৈতুকী প্রেমের কাছে চতুরচূড়ামণি আর একবার হেরে গেলেন। গোপিনীরা আপন ভাবনামৃতে তৈরী করে নিয়েছেন প্রাণবঁধুকে। শ্যাম সর্বদাই তাঁদের সম্মুখে। এক সখী অন্য সখীকে শ্যামরূপে দেখেন। শুধু তাই নয়, কৃষ্ণভ্রমরকেও কৃষ্ণঘন শ্যামের গুপ্তচর মনে করেন। এমনি তাঁদের তন্মনস্কাভাব। ভক্তাধীন ভগবানের উপায় ছিলনা তাঁদের এই কল্পিত রূপের মাঝে ধরা না দিয়ে। "...ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা...।"

ভগবানের কোন শক্তিরই কণামাত্র জীব কল্পনা করতে পারে না। তাঁর ভক্তাধীনতাও যে কত গভীর তাও জীবের অগোচর। নইলে একটি শিশুভক্তের ইচ্ছা পূরণ করতে তাঁকে কাঁচের থাম্বার ভিতর থেকে এক অভিনবরূপে আত্মপ্রকাশ করতে কে কোথায় পূর্বে দেখেছে বা শুনেছে! তাঁর ভক্তবৎসলতা এতই

অকল্পনীয় যে ভক্তের অসম্ভব ইচ্ছাকেও সম্ভব করতে তাঁর তিল-মাত্র দেরি নেই। এমন ভক্তাধীন ভগবান বহু গোপীর কামনা পূরণার্থে আজ ব্রজে সর্বদা নামরূপে বিরাজমান। কৃষ্ণগৃহীতমানসা গোপীকর্তৃক আজ কৃষ্ণ অন্তরে বাহিরে উভয় ক্ষেত্রেই বিশেষভাবে ধৃত।

নামের মধু-মাহাত্ম্য যুগযুগান্তরের সাধন-আবর্তে পরিণত হয়েছে নামামৃতে। দ্রব্যযজ্ঞ উন্নীত হয়েছে জ্ঞানযজ্ঞে। আবার জ্ঞানযজ্ঞের পরিপকরূপ নাম-যজ্ঞ। কলিযুগ তিনটি পরিণত অপ্রাকৃত বস্তুর অধিকারী—(১) সাধনভজনের পরিপক্ক পদ্ধতি (শ্রীনাম সেবা), (২) রসের ঘনীভূতরূপ (প্রেম) এবং (৩)শ্রীনামবিগ্রহ (যেই নাম সেই কৃষ্ণ)। অন্যসব যুগ এ অমূল্য সম্পদ থেকে বঞ্চিত। তাই কলির এত মহিমা। কলি দোষনিধি হয়েও সাধন-ভজনের জন্য মহান্ গুণ-বারিধি, অর্থাৎ শ্রেষ্ঠতম যুগ (ভাগবত ১২।৩।৫১)। তাই কলিতে অল্প সাধনেই ঋদ্ধি-সিদ্ধি।

অতএব "হরের্নামৈব কেবলম্" বাক্যের তাৎপর্য হবে—কলিতে যে কোন ধর্মানুষ্ঠান যাগ-যজ্ঞ-ব্রতাদির আচরণ করা হোক তা হরিকীর্তন ভিন্ন শুদ্ধ-সম্পূর্ণ হবে না। অর্থাৎ যে কোন শুভ কর্মের ফল পেতে হলে হরিকীর্তন ভিন্ন গতি নেই। কলিতে শ্রীভগবান শ্রীনামরূপে বিরাজমান। তাই ধ্যান যজ্ঞ সেবা-পরিচর্যা সর্ব অনুষ্ঠান-আচরণে শ্রীনাম-যজ্ঞ দ্বারা শ্রীনাম-বিগ্রহের সেবা অপরিহার্য।

সত্যদ্রষ্টা ঋষি বলছেন—

বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্
আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।
তমেব বিদিত্বাঽতি মৃত্যুমেতি
নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায় ॥

—শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্ ৩।৮

অর্থ—অজ্ঞানের অতীত, সূর্যের ন্যায় স্ব-প্রকাশ, মহান পুরুষকে আমি জানি। তাঁকে জেনেই সাধক মৃত্যুকে অতিক্রম করেন; পরমপদ প্রাপ্তির অন্য কোনও পথ নাই।

* * *

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে

হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে

* * *

ওঁ অসতো মা সদ্গময়

তমসো মা জ্যোতির্গময়

মৃত্যোর্মামৃতং গময় ॥

বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ ১।৩।২৮

হে দয়াময় প্রভো!

অসত্য থেকে আমায় সত্যে নিয়ে যাও,

অন্ধকার থেকে আমায় জ্যোতিতে নিয়ে যাও,

মৃত্যু থেকে আমায় অমৃতে নিয়ে যাও।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ॥

শ্রীধাম শ্রীপুরীক্ষেত্র
শ্রীশ্রী শ্যামাপূজাতিথি
(আলোকামাবস্যা)
২রা কার্তিক, শনিবার
১৩৮৬ সাল।

গুরুকৃপা প্রার্থী
শ্রীযাদব চন্দ্র সোমদ্দার
ভক্তি শাস্ত্রী

পরমারাধ্যা শ্রীগুরু

শ্রীশ্রীমা শ্রীমতী সরোজিনী দেবীর

উপদেশামৃত

তব কথামৃতং তপ্তজীবনং
কবিভিরীড়িতং কল্মষাপহম্।
শ্রবণমঙ্গলং শ্রীমদাততং
ভুবি গৃণন্তি তে ভূরিদা জনাঃ॥

ভাগবত ১০।৩১।৯

তোমার কথামৃত সংসারতপ্তজনের জীবনপ্রদ, ব্রহ্মা-নারদাদি কবিগণ কর্তৃক স্তুত, পাপনাশকারী, শ্রবণমাত্রেই মঙ্গলপ্রদ, শান্তিদায়ক। পৃথিবীতে যাঁরা তোমার সেই কথামৃত বিস্তার-নিমিত্ত কীর্তন করেন, তাঁরাই ভূরিদাতা অর্থাৎ বহুদাতা বা সর্বার্থপ্রদ।
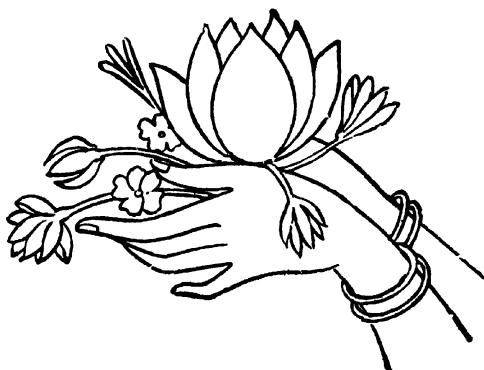
যার আছে জ্ঞান
সে-ই করে সন্ধান।
যে জন বুদ্ধিমান
সে-ই হয় সাবধান॥

সে-ই পড়ে শাস্ত্র
যে জন তত্ত্বজ্ঞ।
সে জন অজ্ঞান
যে সাজে বিজ্ঞ॥

যে জানে সাধন
সে করে ভজন।
যে তমসায় নিমগন
তত্ত্বে কি তার প্রয়োজন!॥

যে বুঝে না হিতাহিত
চলা-বলা তার বিপরীত।
গুরুতে যে রাখে চিত
সে-ই মানে নিয়ম-নীত॥

শাস্ত্র মানলে স্বস্তি
না মান ত শাস্তি।
গাও কৃষ্ণ-প্রশস্তি
ইহ বিনা সুখ নাস্তি॥

২। শ্রীশ্রীরথযাত্রা উৎসব আজ। জগতের নাথ শ্রীনাথ শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীবলভদ্র, শ্রীভদ্রা নিজ নিজ শ্রীরথে যাত্রা করবেন। শাস্ত্রে আছে, রথের উপর শ্রীভগবানকে দর্শন করলে আবার জন্ম নিয়ে দুঃখের ধরায় আসতে হয় না। "রথে তু বামনং দৃষ্টা পুনর্জন্মঃ ন ভবিষ্যতি।"

উৎসবের এই শ্রীরথ দর্শন করতে করতে দৃষ্টি অন্তর্মুখী হয়ে যখন আপন দেহরথে শ্রীভগবানকে দর্শন করবে, যখন আত্মদর্শন হবে, তখন আর পুনর্জন্ম হবে না। পুরীধামের অপর নাম শ্রীক্ষেত্র। জীবিত লোকের নামের আগে "শ্রী" বসে। মৃত হলে ৺(ঈশ্বর) বসে। তা হলে "শ্রী" অর্থে দেহ বুঝা গেল। এই দেহ-ক্ষেত্রে অর্থাৎ হৃদয়-ক্ষেত্রে ভগবান বিরাজ করেন। "ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশে অর্জন তিষ্ঠতি।" দেহরূপ শ্রীক্ষেত্রে শ্রীনাথ বিরাজ করেন। শ্রীজগন্নাথদেবের হস্ত-পদ নেই। ইঁহা শাস্ত্রের "অপাণিপাদঃ" পরব্রহ্মেরই রূপ। হৃদিস্থিত হস্তপদহীন ঈশ্বরের রূপ। রথ-উৎসবে গিয়ে রথ টানার সৌভাগ্য না হলেও অন্ততঃ রথের দড়ি স্পর্শ করা একটি পরম ধর্ম। শুদ্ধা ভক্তিই রথের রজ্জু। রজ্জুর স্পর্শই ভক্তির স্পর্শ। দেহ-রথকে ভক্তি-দড়ি দ্বারা ভগবানের কাছে টেনে নেওয়া। এই ভক্তিরজ্জুই প্রতি বৎসর লক্ষ লক্ষ ভক্তকে বহু দূরদূরান্ত থেকে টেনে আনে শ্রীক্ষেত্রপতির রথোৎসবে। আবার এই রজ্জুতেই ভক্ত বেঁধে রাখে ভগবানকে। এ রজ্জু এত সূক্ষ্ম যা চোখে দেখা যায় না, কিন্তু এর এত শক্তি যা কল্পনা করাও যায় না।

আর একটি কথা। বৎসরের পূজাপার্বণাদি উৎসবসমূহ তাদের যাত্রা শুরু করে রথযাত্রা-উৎসব দিয়ে। রথযাত্রাই বৎসরের প্রথম উৎসব। তারপর অন্যান্য সব পূজা অনুষ্ঠানাদির লগ্ন আসতে থাকে। এর তাৎপর্য বোধহয় এই, প্রথমে দেহরথে ভগবানের আসন কল্পনা, তারপর ভজনের অন্যান্য অনুষ্ঠানাদি। ইহা রথযাত্রার আর একটি

বৈশিষ্ট্য। পুর শব্দের অর্থ তোমরা জান। পুর মানে আলয় বা বাসস্থান। পুর এবং পুরীর একই অর্থ। ভগবানকে বেদ-উপ-নিষদে পুরুষ বলা হয়েছে। দেহপুরীতে যিনি শয়ন করে আছেন তিনিই পুরুষ। পরম পুরুষ বিরাজ করেন পরম রমণীয় ক্ষেত্রে। তাই শ্রীজগন্নাথক্ষেত্র পুরী নামে প্রসিদ্ধ।

শ্রীক্ষেত্রে শ্রীরথযাত্রা দর্শন করেও যার দৃষ্টি হৃদয়-ক্ষেত্রে না পড়ে, তার রথের মেলায় ঠেলা খাওয়াই সার হয়। আশার (আষাঢ়) মাসেই তার নিরাশার দাবদাহ শুরু হয়। প্রার্থনা করি: এই রথ-যাত্রার শুভলগনে সাধনপথে তোমাদের শুভযাত্রা শুরু হোক। তোমাদের জয় হোক।

৩। কত লোক কত কষ্ট করে দূরদূরান্তে বনে পাহাড়ে সাধু সন্ন্যাসীর কাছে ছুটে যায় তাঁদের একটু কৃপা পাবার জন্য। কেউবা বহু দিন ধরে সাধুর সেবা করছে তার জন্য। এ জন্য কতই না কষ্ট ও ত্যাগ স্বীকার করতে হয়। কিন্তু আপন মনের গহন বনে যে মহাজন মৌনী হয়ে আছে তার খবর নিলে, তাকে জাগাবার চেষ্টা করলে, তার সেবা করলে কৃপার বন্যা বয়ে যেত। বাইরের চেষ্টায় সীমিত এবং সাময়িক লাভ, অন্তরের চেষ্টায় অনন্ত ও স্থায়ী লাভ। "বাইরে ঘুরে বার, ঘরে বসে তের।" তোমার ভিতরের 'আমি'ই মহা মহাজন, মহানায়ক, মহাসন্ন্যাসী। কাঁধে গামছা রেখে গামছা খুঁজে মরার মত তাকে ভুলে ছুটে মরছ।

৪। গুরু, বৈষ্ণব, অবতার ও ভাগবত শাস্ত্রাদির মাধ্যমে সর্বদাই ভগবান প্রতি জীবকে শিক্ষা দিচ্ছেন, ভজন করিয়ে নিচ্ছেন। জীব সর্বদাই উন্নততর পথের মুখে, উচ্চতর স্তরে আরোহণের অপেক্ষায়। যিনি জ্ঞানী তত্ত্বদর্শী তিনি ঠিক পথ বেছে নিয়ে জীবন ধন্য করেন। যিনি নিজের অভাব অপূর্ণতা জানেন তিনিই জ্ঞানী। যিনি সেই অভাব অপূর্ণতাকে পূরণ করেন তিনি মহাজ্ঞানী।

৫। সব ধর্মে সব শাস্ত্রেই ভগবানকে সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান, সর্বত্র-বিদ্যমান ইত্যাদি বলা হয়েছে। তাঁর কাছে যা কিছুই নিবেদন কর, প্রার্থনা কর সবই তিনি শুনতে পান। কিন্তু তোমারই মনে সেই দৃঢ় বিশ্বাস নেই যে তিনি তোমার সব কথা শুনছেন। যদি সেরূপ গভীর প্রত্যয় তোমার থাকৃত, তবে তোমার সব চাওয়া পাওয়ার ফল অবশ্যই পেতে। তোমার বিশ্বাস নেই, তাই প্রার্থনারও ফল নেই। তিনি তোমায় সর্বদা দেখছেন—একথা মনে রাখলে কি তুমি অসত্য বলতে পারতে, না অসৎ কাজ করতে পারতে!

৬। ঈশ্বর আছেন কি নেই—এর সমাধানে পৌঁছতেই যদি জীবন কেটে যায়, তবে তাঁর ভজন করবে কখন?

বর্ণপরিচয়-ভোলা ছাত্রের মত ঈশ্বর-পরিচয় জানতেই যদি সারাটা জীবন কাটাবে তবে তাঁর সঙ্গে প্রেম ভালবাসা জমাবে কখন?

৭। সত্ত্বগুণে যে ভরপুর সে-ই তো সাধু। সৎবস্তুকে যিনি ধারণ করে আছেন তিনি-ই সাধু। সত্ত্বগুণে না পৌঁছলে সত্যস্বরূপ ভগবানের ভজন বা উপলব্ধি কিছুই হবার নয় কারণ, সত্ত্বগুণ ছাড়া 'সৎ' কে জানা যায় না। সত্ত্বগুণে পৌঁছবার আগে যা কিছু করা হয় তা দেহ-মন-বাক্য শুদ্ধির সাধনা, ভজনের প্রস্তুতি পর্ব মাত্র। সত্ত্বগুণে পৌঁছে ভগবৎজ্ঞান, আর সত্ত্বগুণ পেরিয়ে ভগবৎ সাক্ষাৎ।

৮। সৎসঙ্গ বলেন—সাধুর দরশে খণ্ডে পাপ, পরশে মুক্তি। সাধুর দরশেপরশে মঙ্গল হয় কেন?

সাধু সত্ত্বগুণময় আলোক-স্বরূপ, তাই তাঁর স্পর্শে বা দর্শনে অন্ধকাররূপ রজঃ বা তমঃ গুণসকল পলায়ন করে। ভজন-ক্ষেত্রে

সাধু এবং গুরু উভয়ের কৃপাই প্রয়োজন। কখন সাধুর কৃপায় গুরুকৃপা লাভ হয়, আবার কখন গুরু-কৃপায় সাধু-কৃপা লাভ হয়। তবেই ভজনে পূর্ণতা আসে।

৯। ঈশ্বর অনন্ত, জীব অণু। অণুর পক্ষে অনন্তকে জানা অসম্ভব। কিন্তু একটা কৌশলে অণু অনন্তকে জানতে পারে, ধরতে পারে।

গুরুকে জানতে পারলেই ঈশ্বরকে জানা যায়। গুরু-শক্তি আতশী কাঁচের মত। ঈশ্বর-শক্তি সূর্যের মত। সূর্যের তেজ এমনিতে ধরা যায় না, কিন্তু আতশী কাঁচের মাধ্যমে সহজেই সূর্যকিরণ ধরে আগুন জ্বালান চলে। তেমনি ঈশ্বররূপ সূর্যকে গুরুরূপ আতশী কাঁচের মাধ্যমে ধরা যায়। অসীম অনন্ত বিভুর সসীম সান্ত রূপ হলেন শ্রীগুরুদেব।

১০। স্থাবর জঙ্গম চরাচর সবই ব্রহ্মময়। ব্রহ্মে সব ডুবে আছে। আমরা ব্রহ্মময় হয়েও কেন ব্রহ্মানন্দ পাচ্ছি না! তার কারণ আমাদের অজ্ঞানতা। আমরা ভুলে গেছি আমাদের স্বরূপ। আমরা ভুলে গেছি যে আমরা ব্রহ্মের সন্তান, আনন্দের সন্তান, অমৃতের সন্তান। বাঘের বাচ্চা ছোট থেকে ভেড়ার পালে বাসকরে সে যেমন ভেড়ার মত আচরণ করে, আমরাও তেমনি সংস্কারের ভিতর থেকে থেকে নিজের তেজ বীর্য ভুলে গেছি। জীয়ন্তে মড়া হয়ে আছি। অজ্ঞানতাই মৃত্যু বা দুঃখ, আর জ্ঞানই অমৃত বা আনন্দ।

একমাত্র গুরুই এই অজ্ঞান-অন্ধকার দূর করে জীবকে আনন্দের সন্ধান দিতে পারেন। তিনিই জীবকে অমৃত পান করাতে পারেন, ভগবানের কাছে পৌঁছে দিতে পারেন।'

১১। পিতা যেমন কন্যাকে লালনপালন করে শিখিয়ে পড়িয়ে উপযুক্ত সময়ে সৎপাত্রে অর্পণ করেন, গুরুও তেমনি শিষ্যকে শিক্ষা-দীক্ষা দিয়ে উপযুক্ত করে সদ্‌বস্তুকে (ঈশ্বরে) অর্পণ করেন। গুরু

একজন ঘটক, জীবের সহিত ঈশ্বরের মিলন ঘটিয়ে দেন। বিবাহ-কালে ঘটকের অনুমতি নিতে হয়। ঈশ্বর-আরাধনায়ও গুরুর আজ্ঞা নিতে হয়। তিনি হচ্ছেন অঘটনঘটনকুশল ঘটক।

১২। সকল প্রাণীই নিজে না খেয়েও তার বাচ্চাকে খাওয়ায়। মাতা নিজে না খেয়ে ভাল বস্তু তাঁর সন্তানকে দেন। আপন প্রাণকে বঞ্চনা করে সন্তানের প্রাণ বাঁচান। নিজে খেলে যত তৃপ্তি সন্তান খেলে তার চেয়ে অধিক তৃপ্তি। নিজ প্রাণ অপেক্ষা সন্তানের প্রাণ বেশী আপন। মাতার এই মমত্ববোধ ও আত্মত্যাগ স্বর্গীয় সম্পদ। ইহাই মাতার মাতৃত্ব ও দেবত্ব। মঙ্গলময় ভগবান মাতৃহৃদয়ে করুণারূপে প্রকটিত হয়ে সন্তান পালন করত আপন সৃষ্টি রক্ষা করছেন। মাতৃহৃদয়ের এই ঐশ্বরিক সম্পদ যদি ঈশ্বরে অর্পিত হয় তবেই মাতৃমহিমার পূর্ণ বিকাশ। নিজ সন্তানকে ঈশ্বরের সন্তান ভাবা, বা তাকে বালগোপালরূপে দেখা-ই মাতৃ-প্রেমের পরিপূর্ণতা। মাতৃ অন্তরে দৈবীভাব এলেই সন্তান দেবশিশু হয়ে ওঠে। তখন সকল শিশুকেই আপন সন্তান মনে হয়। এটাই মায়েদের সহজাত সহজতম সাধন পথ। পুরুষদের এ ভাব নেই। এখানেই নারীর শ্রেষ্ঠত্ব।

১৩। গুরুর একমাত্র কাজ শিষ্যের মঙ্গল করা, তা পার্থিবই হোক বা অপার্থিবই হোক। শিষ্যের হিতের জন্য নিজের যা কিছু গুরু সবই দিতে প্রস্তুত। শিষ্যের সম্পদ গ্রহণ করা গুরুর কাছে আদর্শহীনতা। মা যেমন নিজে না খেয়ে সন্তান খেলে বেশী তৃপ্তি পান, গুরুও তেমন শিষ্যের সুখে অধিক সুখী হন। শিষ্য যে গুরুর সেবায় নিজকে উৎসর্গ করে, সেই আত্মোৎসর্গের উৎস হচ্ছেন গুরু। আগে গুরু শিষ্যের মঙ্গলের জন্য নিজকে উৎসর্গ করেন। মহতের এই মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা থেকেই শিষ্যের নিবেদিত-ভাবের জন্ম।

১৪। আমার মনে যত ব্যথা তোমাদের তেমন ব্যথা না থাকলে আমার কথায় তোমাদের মনে দাগ কাটবে না। আর দাগ না কাটলে সে কথা শুনে কি লাভ! আগে মনকে তৈরী কর, তার পর যাই কর তাতেই ফল দেবে। মন প্রস্তুত না করে হরিকথা শত জনমভর শুনলেও ফুটো পাত্রে জল ভরার সমান হবে। রাজা পরীক্ষিত চরম দুঃখে মনকে প্রস্তুত করে হরিকথা শুনতে বসে-ছিলেন বলে মাত্র সাত দিন শ্রবণেই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করেছিলেন। একমাত্র মহাদুঃখের ভিতরই মনকে এরূপ ভাবে প্রস্তুত করা যায়। মহাদুঃখের এই মহাসুযোগ হেলায় হারিও না।

১৫। সন্ন্যাসী কাকে বলে জান?
যার সব নাশ হয়েছে, অর্থাৎ যার সর্বনাশ হয়েছে সে-ই সন্ন্যাসী। এই সর্বনাশটা কতখানি ব্যাপক তাই বলছি। যে তার বিষয় আশয় মান-মর্যাদা সবই নাশ করেছে; এমনকি তার স্বজন, আত্মীয় কুটুম্বদেরও খেয়েছে সে-ই সন্ন্যাসী। বিষয় থাকতে হয়না মনন, স্বজন থাকতে হয়না ভজন।

১৬। তোমরা সকলেই জান, জগত-উদ্ধারক রঘুপতি রাম আপন প্যারীকে নিজ চেষ্টায় রাবণপুরী হতে উদ্ধার করতে পারেন নি। তার জন্য তাঁকে বানর ভালুকের সাহায্য নিতে হয়েছিল। তোমাদের মনের সমস্ত সদ্‌বৃত্তি দিয়েও সেই আত্ম-প্যারীকে সংস্কারান্ধ দশেন্দ্রিয়ের মদপুরী হতে উদ্ধার করতে পারবে না, যদি না মনের বানর-ভালুকরূপী চঞ্চল অস্থির বৃত্তিগুলিকেও নিয়ন্ত্রিত করে সদ্‌বৃত্তির সঙ্গে আত্মানুসন্ধানে নিয়োজিত কর। আগে মন-বানরকে শিষ্য করে বশ কর। তখন সে বীর হনুমানের রূপ নেবে, আর এক লম্ফে মায়াসমুদ্র উল্লম্ফন করে দশবিধ সংস্কারে কলঙ্কিত লঙ্কা পুড়িয়ে ছারখার করে শুদ্ধ সত্ত্বস্বরূপ সীতার সন্ধান নিয়ে আসবে। শুধু কিষ্কিন্ধার বানর-ভালুকের হিসেব না রেখে

তৎসঙ্গে মনের বাঁদরগুলিরও হিসেব রাখলে রামায়ণ পড়া সার্থক হবে, রামের কৃপা লাভ হবে।

১৭। সবাই আমরা ভগবানের সন্তান, অমৃতের সন্তান, আনন্দের সন্তান। ঈশ্বরীয় এই আনন্দরস মাতাপিতার মাধ্যমে প্রচালিত হয়ে আমাদের জন্ম হয়েছে। ব্রহ্মাণ্ডের সকল জীব বস্তু পদার্থের সৃষ্টির মূলে আছে এই তথ্য এই সত্য। এই আনন্দই অমৃত, আর অমৃতই ভগবান। আমাদের দেহের উপাদান অণু-আনন্দকে চুম্বকের মত সর্বদা আকর্ষণ করছে ভূমানন্দ। অণু-আনন্দের উৎস ভূমানন্দ। এ জন্য তার একটা স্বাভাবিক গতি রয়েছে ভূমানন্দে মিলিত হবার। ফলে অণু-আনন্দ আমাদের টেনে নিতে চাইছে ভূমানন্দের কাছে। আমরা তাই আনন্দ-পিয়াসী। এই আনন্দ-পিপাসা আমাদের থাকবে যতদিন না আমরা আনন্দ-সাগরে ডুবে যাব। অমৃতে উৎপত্তি, অমৃতে লয়। আবার উৎপত্তি আবার লয়। রসঘন শ্যামের ইচ্ছায় জীব এভাবে অমৃত হতে অবতরণ করে, পুনরায় অমৃতে মিলয়। এভাবে চক্রাকারে চলছে অনাদি অনন্ত রাসলীলা। এই পরম রসের সন্ধান দেবার জন্যই ব্রজে রাসলীলার অবতারণা।

এ রাসকে অনন্ত বলার কারণ, ইহা সর্বত্র পরিব্যাপ্ত সর্বকালের জন্য। পৃথিবী সূর্যকে ঘিরে এবং চন্দ্র পৃথিবীকে ঘিরে সর্বদা রাসলীলা করছে। এমনও হতে পারে যে, সূর্য তার গ্রহাদি নিয়ে আর এক বিরাট সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে চলেছে। আমরাও জন্ম-মৃত্যুরূপ সংসারচক্রে ঘুরপাক খাচ্ছি। পরমাণুও অণুকে ঘিরে ঘুরছে। রাসচক্র সর্বত্র। এই অনাদি অনন্ত মহারাসের সঙ্গে আমাদের মধুর রাসের সম্পর্ক আছে—এই টুকুই কেবল মানব অনুভব করতে পারে। এই অনন্ত রাসের অনন্ত রসের সম্যক্ আস্বাদক একমাত্র পূর্ণ ব্রহ্ম ভগবান শ্রীকৃষ্ণ।

১৮। ধনী লোকের যদি কৃপণ স্বভাব থাকে, তাকে ধনী বলা যায় না। প্রকৃত ধনী ছিলেন জনক রাজা। তাঁর ধন বিলিয়ে দিতেও কুণ্ঠা ছিল না, সব রাজৈশ্বর্য পুড়ে ছাই হলেও তাঁর ক্ষোভ ছিল না। এই সাম্যভাবই তাঁর ব্রহ্মজ্ঞানের মূল। পরম ব্রহ্মেরও সাম্য ভাব। তুমি তাঁকে ডাকলেও জল আলো বাতাস পাবে, আর না ডাকলেও তা পাবে। ব্রহ্মে ভেদভাব নেই। ব্রহ্মজ্ঞানীরও ভেদজ্ঞান নেই।

১৯। মনের ত্যাগ-ভাবই আসল ত্যাগ। মনের কোণে সুপ্ত বাসনা রেখে বাইরে ত্যাগের ভাব আত্মপ্রবঞ্চনা। সন্ন্যাসী সেজে যদি আত্মীয় বিষয়ের প্রতি বিন্দুমাত্র টান থাকে তার ভজন বৃথা। প্রকৃত সন্ন্যাসীর অযাচক বৃত্তি। ভিক্ষাও করে না, চেয়েও খায় না। আবার সকলের দেওয়া জিনিষও গ্রহণ করে না। এতখানি যার নিষ্কিঞ্চন ভাব তার আহার ভগবান নিজে বয়ে নিয়ে আসেন। তার মন তখন শুদ্ধ ব্রহ্মময়। এমন সন্ন্যাসীর সেবা করা আর সাক্ষাৎ ভগবানের সেবা করা একই বস্তু। তাদের সঙ্গে ক্ষণকাল সঙ্গ করলেই বৈকুণ্ঠে বাস। যার মনে কোন প্রকার কুণ্ঠা নেই তার সঙ্গ-সাহচর্যেই কেবল আমাদের মনের কুণ্ঠা দূর হতে পারে।

২০। বিচার করলে আর প্রেম বাঁচে না। বিচারক কখনই প্রেমিক নয়, তখন সে নিঠুর নিয়ামক। প্রেম বিচারের ঊর্ধ্বে। তাই প্রেম অন্ধ। এ অন্ধতা বিচারের অন্ধতা, আপন-পর বোধের অন্ধতা, পাপপুণ্য জ্ঞানের অন্ধতা। জ্ঞান-বিচার এলেই প্রেমের মৃত্যু।

২১। বাসনাই ভবব্যাধি। এ ব্যাধির মূল মনের গভীরতম কোণে, যেখানে ভগবৎ নামরূপ মহৌষধি ছাড়া অন্য কোন ঔষধ

পৌঁছায় না। যদি এই ব্যাধি হতে মুক্তি পেতে চাও তবে ভগবানের শরণ নিয়ে সব সময়ে ইষ্টনাম জপ করে যাও। দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে জপ করে যাও, অবশ্যই মুক্তি পাবে। কঠিন ব্যাধিতে ছ-একদিন ঔষধ খেলেই যেমন ফল পাওয়া যায় না, তেমনি ছচার দিন জপ করতেই ভবব্যাধি দূর হয় না। নাম নিতে নিতে একটু একটু করে আনন্দ অনুভব হবে। এভাবে নামরসে যখন ডুবে যাবে, বাসনাবীজও তখন পঁচে যাবে।

২২। নিরাকার ব্রহ্মের প্রথম সাকার রূপ প্রণবমন্ত্র "ওঁ"। সুতরাং ওঁ হতেই সব পদার্থ প্রপঞ্চের উৎপত্তি। আবার একদিন সব কিছু 'ওঁ' এ লয় হবে। আমরা যে শব্দটি করছি, যে কথাটি বলছি তা 'ওঁ' হতে উৎপন্ন হয়ে আমার এই দেহযন্ত্রের ভিতর দিয়ে প্রকাশিত হচ্ছে। 'ও' ব্রহ্মের প্রতীক, সৃষ্টির প্রতীক এবং লয়েরও প্রতীক। আমাদের দেহযন্ত্র সগুণ বলে আমাদের কোন ভাব-ভাবনা নির্গুণে পৌঁছায় না, ওঁ পর্যন্ত পৌঁছতে পারে। তাই জীবের পক্ষে সরাসরি নির্গুণ-উপাসনা সম্ভব নয়। পর-ব্রহ্মের উপাসনা করতে হলে 'ওঁ' এর মাধ্যমে করতে হবে। ওঁ আমাদের জৈব ভাবনাকে পরিশুদ্ধ করে পরব্রহ্মে পৌঁছে দেবেন। পরব্রহ্ম ছাড়া আর সব সগুণ ব্রহ্ম। সগুণ ব্রহ্মের উপাসনায় পরি-নির্বাণ বা ব্রহ্মলাভ হয় না, সগুণ বস্তুই লাভ হয়। একমাত্র ওঁ এর উপাসনায় ব্রহ্মমুখী হওয়া যায়। গ্রাম্য কথা বা বিষয়ের কথা বলা হলে মন সেই বিষয়মুখী হয়। ফলে আমরা ইষ্ট হতে দূরে সরে যাই, বিষয়ে জড়িয়ে পড়ি। যদিও গ্রাম্য কথা এবং বিষয় উভয়ই ব্রহ্ম হতে উৎপন্ন, উভয়ই ব্রহ্ম, তবু এরা অসৎ, নশ্বর ব্রহ্ম; সৎ বা অবিনাশী ব্রহ্ম নয়। ব্রহ্ম 'সৎ'ও বটে, আবার 'অসৎ'ও বটে (গীতা ৯।১৯)। অসৎ ব্রহ্ম অস্থায়ী বলে স্থায়ী সুখ দিতে পারে না। তাই গ্রাম্য কথার পরিণাম দুঃখ।

২৩। যা কিছু শুনছ সবই পুরাতন কথা। পুরাণে সবই আছে। ঈশ্বর চিরপুরাতনও বটে, আবার নিত্যনূতনও বটে। আমরা সেই চিরপুরাতনের কথা নিত্য নূতন করে শুনছি। নূতন করে সঞ্জীবিত হচ্ছি। ঈশ্বরের অমৃতকথা প্রত্যহ আমাদের মৃত্যুর গহ্বর থেকে টেনে তুলছে। এ-ই অমৃতের মহিমা। ঈশ্বর তাঁর অমৃতসম্পদ তাঁর প্রিয়তম ভক্তদের কাছে গচ্ছিত রেখেছেন সুপাত্রে দানের জন্য। সেই ভক্তরা যেন এক-একটি অমৃতকলস। তুমি তাঁদের কাছে যাও, ইচ্ছামত ঢাল আর পান কর। এ সম্পদের দাতা ও গ্রহীতা উভয়ই ধন্য। এ ধন দান করাও সাধনা, গ্রহণ করাও সাধনা।

২৪। শ্রীরাম আছেন তো বৈরী রাবণও আছে। শ্রীকৃষ্ণ আছেন তো বৈরী কংসও আছে। শ্রীরাধা আছেন তো প্রেমের বৈরী জটিলা কুটিলাও আছে। কিন্তু তার জন্যে কি রাধাকৃষ্ণের লীলা মিলন বন্ধ ছিল! সদাচার থাকলে তার পাশেই কদাচার থাকবে, সে জন্য কি সদাচার বন্ধ হয়ে যাবে! মনে হয় না, ভজন করতে গিয়ে তোমরা এখনো জটিলা কুটিলার মত লোকের খপ্পরে পড়েছ। শ্রেয় কার্যে বহু বাধাবিঘ্ন থাকবেই। যেমন ভজন আছে, তেমন ভজনে বিঘ্নও আছে। কিন্তু প্রকৃতই যে ঈশ্বর-ভজন করে, বাধা-বিঘ্ন তাকে হীনবল না করে বরং তার শক্তি আরো বাড়িয়ে দেয়। কারণ, ভগবান সৎবস্তু, ভগবৎ ভজনও সৎ বস্তু। এই সৎ বস্তুর সংস্পর্শে এসে বাধাবিঘ্নও তখন সদ্‌ধর্ম প্রাপ্ত হয়। ফলে তার বিনাশী শক্তি বিপরীত গতি প্রাপ্ত হয়ে বিপুল সৃজনী শক্তিতে পরিণত হয়। প্রমাণ, নামাচার্য হরিদাস এবং গণিকা লক্ষহীরার কাহিনী। লক্ষহীরা গিয়েছিল হরিদাস ঠাকুরকে পথভ্রষ্ট করাতে। ফল হল উলটো। হরিদাসের তো জপের সংখ্যা বহুগুণে বেড়ে গেলই, লক্ষহীরার অসদ্‌বৃত্তিও পরম সদ্‌বৃত্তিতে পরিণত হল। পরম সৎকে কলুষিত করতে গিয়ে চরম দুষ্ট পরম শিষ্টে পরিণত

হল। এ হল 'সৎ' এর শক্তি। এই 'সৎ' এর সঙ্গে যদি ভজনকে যুক্ত করতে পার, তবে সে ভজনের বিনাশ নেই। 'সৎ' এর ধ্বংস নেই। 'সৎ' বস্তুই ঈশ্বর।

২৫। যা সুখের তাই স্বর্গ, যা দুঃখের তাই নরক। কামনা নরক, নিষ্কাম স্বর্গ। কামনায় চিরদুঃখ, নিষ্কামে চিরসুখ। সেবাব্রত ছাড়া নিষ্কাম হবার অন্য কোন সাধন নেই। সেবাধর্মে যার যত শুদ্ধভাব, তার তত নিষ্কাম মন। যেখানে মুক্তির প্রার্থনা আছে সেখানেও শুদ্ধ নিষ্কাম ভাব নেই। অপরের সুখের জন্য সেবা। আপন সুখ-চিন্তা বিসর্জন না দিতে পারলে অপরের সুখচিন্তা আসে না। সেবা করতে গিয়ে অপরের সুখের কথা আনন্দের কথা ভাবতে ভাবতে একসময়ে নিজের সুখের চিন্তা ভুলে যাওয়া যায়। ডুবে যাওয়া যায় অপরের ভাবনায়। তখনই নিষ্কাম ভাব আসে। এই ভাবকে স্থায়ী করতে পারলেই পূর্ণ নিষ্কাম হওয়া যায়। এই ভাবকে স্থায়ী করতে হলে সেবাধর্মকে চিরস্থায়ী বস্তুর সহিত যুক্ত করতে হবে। অর্থাৎ চিরস্থায়ী বা 'সৎ' বস্তুর সেবা করতে হবে। নিষ্কামভাবে যদি "সৎ" বস্তু তথা ঈশ্বরের সেবা করা যায় তবেই স্থায়ী নিষ্কামভাব লাভ হয়।

এই নিঃস্বার্থ নিষ্কাম কৃষ্ণসেবার জন্যই ব্রজবালাগণ আজ আমাদের ভজনপথের গুরু হয়েছেন, জগৎপূজ্যা হয়েছেন। ব্রহ্মাদিদেবগণ যাঁকে যোগে-ধ্যানে পান নাই, আহিরী গোয়ালিনীরা শুধু প্রাণভরা সেবা ভালবাসা দিয়ে তাঁকে বশ করেছিলেন। শুধু নিষ্কাম সেবার জন্য গ্রাম্য গোপবালিকারা রাজর্ষি, দেবর্ষি, ব্রহ্মর্ষিদেরও উপরের স্থান লাভ করেছেন। সেবাধর্মই সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম।

২৬। ব্রাহ্মণ সর্বদাই ভিখারী। ব্রহ্মজ্ঞান হলেই ব্রাহ্মণ হয়। যাঁর ব্রহ্মজ্ঞান হয়েছে বিষয় তাঁর কাছ থেকে দূরে চলে গেছে।

বিষয়জ্ঞান আর ব্রহ্মজ্ঞান এক পাত্রে থাকতে পারে না। সুতরাং ভিখারী যে নয়, সে ব্রাহ্মণও নয়। তবে এ ভিখারী সেই বহির্জগতের ভিখারী নয়। এ ভিখারী মনে প্রাণে ভিখারী। বাসনাহীনতায় ভিখারী। এর ঝুলিতে কোন বাসনা নেই। এ ভিখারী সদা কৃষ্ণপ্রেমের ভিখারী।

২৭। বলতে পার, কেবল অপরের জন্যই এই দুর্লভ মানবজীবনটা বিলিয়ে দিয়ে যাব কেন? নিজের জন্য কি চাইবার পাইবার কিছুই নাই?

এ প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন শাস্ত্র—"ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা"। যে ত্যাগ করেছে, সে-ই ঠিক ঠিক ভোগ করেছে। বিষয়-ত্যাগের দ্বারা বিষয়কে সর্বতোভাবে ভোগ করা। বিষয় ভোগ করে যেটুকু তৃপ্তি বা আনন্দ লাভ হয়, বিষয় ত্যাগের দ্বারা বা বিষয়-বাসনা ত্যাগের দ্বারা তার চেয়ে অনেক বেশী তৃপ্তি বা আনন্দ পাওয়া যায়। বিষয়-ভোগীর খণ্ড আনন্দ। তার আনন্দ বিষয়ের সঙ্গে সংস্পৃষ্ট। বিষয় আছে, আনন্দ আছে। বিষয় নেই তো আনন্দও নেই। যেহেতু বিষয় অসৎ বস্তু, অস্থায়ী বস্তু, সেজন্য তার আনন্দও অস্থায়ী। স্থায়ী আনন্দ বিষয় ত্যাগে। অপরের সুখের জন্য অপরের তৃপ্তির জন্য বিষয় ত্যাগ করে যে আনন্দ তার কোন তুলনা নেই। সে আনন্দের ঘাটতি কখনই ঘটে না। অপরের জন্য জীবনটা বিলিয়ে দেওয়ার মানে জীবনটাকে পূর্ণরূপে ভোগকরা। তোমার জীবনের সঙ্গে অপরের জীবন যুক্ত করে জীবনটাকে বড় করে ভোগ করা। অপরকে ভালবেসে নিজেকে বেশী ভাল বাসা, বেশী তৃপ্তি পাওয়া।

২৮। ভক্তের কখনো সাংসারিক সুখ হয় না। কারণ, সে তা চায় না। ভক্ত বিশ্বসংসারকে কৃষ্ণময় দেখে। কারো একটু দুঃখকষ্ট দেখলে নিজের সব কিছু বিলিয়ে দিয়ে পরম তৃপ্তি পায়। অপরের দুঃখে এতই কাতর হয় যে, সেই দুঃখ নিজের জন্য

প্রার্থনা করে এবং ভগবানের দরবারে ভক্তের প্রার্থনা মঞ্জুর হতেও বেশী দেরি হয় না। ভক্ত শুধু অপরের দুঃখই বহন করে না, কখনো অপরেব অপকর্মের বোঝাও বহন করে। তবে এসব দুঃখকষ্ট তার ভিতরে প্রবেশ করতে পারে না। আমরা সাধারণ চোখে দেখি—কোন ভক্ত খুব কষ্ট পাচ্ছে। কিন্তু আমাদের এই দর্শন ঠিক নয়। ভক্তেব হৃদয়-মন্দির প্রেম-ভক্তি-রসে এমনি পবিপূর্ণ যে, সেখানে বাইবে থেকে একটি তিল রাখারও ঠাঁই নেই; দুঃখ ভিতবে প্রবেশ করবে কি প্রকারে! দুঃখ যাকে টলাতে পাবে সে ভক্তিধন পায় নাই, সে ভক্তিদেবীব কৃপা পায় নাই। ভক্তি এমনই মহামূল্য পরশপাথর যাব পরশে অভাব-বোধ, দুঃখবোধ, আপনপর-বোধ চিরতরে ঘুচে যায়।

২৯। শুধু মুখেব কথায় বা উপদেশ শুনলেই কি কৃষ্ণ-প্রেম আস্বাদন করা যায়! আস্বাদন বা অনুভব করার জন্যও কর্ম করতে হয়। উপযুক্ত ক্ষেত্র প্রস্তুত করে বীজ বপন করে নিয়মিত সেচ দিলে ভাল ফল পাবে। বীজ হাতে নিয়ে সারা জীবন কাঁদলেও কোন ফল হবে না। তত্ত্বকথা শুধু শুনে গেলেই ফল হবে না। উপদেশ মত কাজ করলেই ফল ফলবে। তোমরা ফল চাও না, তাই পাও না। যদি চাইতে তবে সেই মত কাজ করতে এবং কিছুনা কিছু ফল অবশ্যই পেতে। একবার একটু ফল পেলে কাজে উৎসাহ পেতে এবং ষোল-আনা ফল পাবার সম্ভাবনা থাকত। তোমরা শুধু কৃষ্ণকথা শুনেই কৃষ্ণ পেতে চাও। শুধু কথায় চিড়ে ভেজাতে চাও! তা কখনই সম্ভব নয়। তবু বলছি এই আশায় —শুনতে শুনতেও যদি একদিন তোমাদের লোভ জন্মে কর্ম করার, ফল পাবার! তোমরা নাকি খুব লোভ-মোহাদি গ্রস্ত! কিন্তু কৈ? তোমাদের ভিতর সত্যি সত্যি লোভ থাকলে তো প্রেমধনের প্রতি অবশ্যই লোভ করতে!

৩০। সংসার করব পুরাপুরি আবার সাধনও করতে চাই পূর্ণরূপে—দুটো কি একসঙ্গে চলবে! বিষয়কূপে ডুবে থেকে অমৃত আস্বাদন করবে কি ভাবে? একসঙ্গে দুটোর পরিপূর্ণ ভোগ সম্ভব নয়। করতে চাও তো একটা-একটা করে কর। বিষয় ভোগ করতে চাও তো আগে তাই করে নাও। কিন্তু অমৃত ভোগের সময় থাকবে কিনা তা কেউ বলতে পারে না। আর যদি অমৃত পেতে চাও তবে অন্যসব বাসনা ছেড়ে এখনই সাধনে যত্নবান হও। আমরা সকলেই অমৃতের পুত্র। পিতার ধনে পুত্রের পূর্ণ অধিকার। অমৃত আস্বাদন করতে চাইলে তোমায় তা থেকে বঞ্চিত করতে পারে এমন কেউ নেই। তুমি অবশ্যই অমৃতের অধিকারী হবে। তবে মহৎ লাভের জন্য মহামূল্য অবশ্যই দিতে হবে। বিনা মূল্যে কিছুই লভ্য নয়।

৩১। যিনি বিষয়তে বিষ দেখতে পান তিনিই প্রকৃত দার্শনিক। তিনিই জ্ঞানী। আমরা কেউ রাস্তা থেকে ইটপাথর এনে আমাদের বাক্সপেট্রাগুলি ভরতি করি না। কারণ, ইটপাথরের মূল্যবোধ। সেইরূপ যিনি জ্ঞানী, পণ্ডিত ·তিনি কখনও বিষয়-চিন্তারূপ ইট পাথর দিয়ে হৃদয়-কোঠা ভরতি করেন না।

৩২। ঈশ্বরকে দেখেছ কি দেখ নাই, ঈশ্বর আছেন কি নেই, এ সবের উত্তর তোমার ভাবনার উপর নির্ভর করে। কিন্তু কর্ম এবং কর্মফলকে নিশ্চয়ই দেখেছ এবং বিশ্বাস কর। যে যেমন কাজ করে আজও সে তেমনি ফল পায়। যে যতটুকু জলে নামে আজও তার ততটুকুই ভেজে। কর্ম এবং কর্মের ফল চিরন্তন সত্য। তুমি যদি মান তবু সে সত্য, যদি না মান তবুও তা সত্য। আগুনে হাত দিলে সে তোমার হাত পুড়ে দেবেই, তা তুমি অবুঝ হও কি অভিজ্ঞই হও। সুতরাং পরিণামের কথা মনে রেখে কর্ম করবে। কর্মের ফল অবশ্যই ভোগ করতে হবে। কখন তা সঙ্গে সঙ্গে,

কখন বা একটু দেরিতে, এই যা পার্থক্য। সর্বদা শাস্ত্র-অনুমোদিত কর্ম করবে। তবে আর ভয় নাই। কর্ম ছাড়া চিত্ত শুদ্ধ হয় না। প্রারব্ধ ক্ষয় না হলে ঈশ্বরে রতি মতি আসে না। শুদ্ধকর্ম দ্বারাই প্রারব্ধ ক্ষয় সম্ভব।

৩৩। যিনি নিজেই অসত্য বলেন, অসৎ আচরণ করেন, তিনি কি অপরকে সৎ আচরণের উপদেশ দিতে পারেন! আর দিলেও কি সে উপদেশে কোন কাজ হয়! আমাদের অবস্থা হয়েছে তাই। নিজে সদাচরণ না করে অপরকে সদাচরণের উপদেশ দেই। তাই উপদেশে কোনই ফল হয় না। মুখে উপদেশ না দিয়ে নীরবে আচরণ করে গেলেই হবে সব থেকে বড় উপদেশ দেওয়া। আমাদের সংসারের অবস্থা আরো জটিল। মায়ের মন এক দিকে, বাবার মন অন্য দিকে। তাদের সন্তানের মন তো ভিন্নদিকে যাবেই। মা বাবা মনেপ্রাণে একাত্ম হলেই সন্তান তাদের গুণ পায়। ঈশ্বর-ভজন ভিন্ন মা বাবার মন একমুখী হয় না। পিতা মাতার মন 'সৎ' বস্তুতে যুক্ত হলেই তাদের ঘর সত্যের আলোকে আলোকিত হয় এবং সদ্‌গুণযুক্ত সন্তান জন্মে। সন্তানদের অসদাচরণ দেখে এখন আমরা ক্ষুব্ধ হই, মর্মাহত হই। কিন্তু শিশুরা ঐ বৃত্তি কোথা থেকে পেল, সে অনুসন্ধান বা তার ভবিষ্যৎ প্রতিকারের বিষয় কজনে চিন্তা করি! কি ঘরে কি বাইরে সর্বত্রই যেন অপরের ঘাড়ে দোষ চাপাতেই তৃপ্তি বোধ করি। ফলে জটিলতা বেড়েই চলছে।

৩৪। অলৌকিক বস্তু কি লোকচক্ষুতে ধরা দেয়? এই দেহ মন দিয়ে কি অলৌকিক বস্তু লাভ করা যায়? তা পারলে তাকে আর আলৌকিক বলবে কেন! সে বস্তু সর্বদাই লোকাতীত। তবে কোন কোন অসাধারণ লোকের মধ্যদিয়ে এ লোকে অলৌকিকের প্রভা ভাসে। তুমি তা দেখতে পার যদি দেখার মত তোমার

চোখ থাকে। বিশ্বরূপ দর্শন করাতে ভগবান অর্জুনকে এই চোখ দিয়েছিলেন। শ্রীগুরু তোমাকে সেই চোখ দিতে পারেন। তুমি নিজে বামন হলেও গুরু তোমাকে আকাশ থেকে চাঁদ পেড়ে দিতে পারেন।

৩৫। "হরি" শব্দের ভিতরেই রাধাশ্যামের যুগলরূপ আছে। 'হ' ত্রিভঙ্গ শ্যামেব প্রতীক, আর "রি" হ্রস্ব ঘোমটা মাথায় শ্রীরাধা সতী।

৩৬। নিরাকার ব্রহ্মের প্রধান তিনটি সাকাররূপ—ব্রহ্মা(সৃষ্টিকর্তা), বিষ্ণু (পালন কর্তা) এবং শিব (সংহার কর্তা)। প্রাণ সকলার কাছে সর্বাপেক্ষা প্রিয় বস্তু বলে প্রাণের পালনকর্তা বিষ্ণুও প্রাণাধিক পূজ্য। একারণে সমস্ত লোকই বিষ্ণুর উপাসক অর্থাৎ বৈষ্ণব। হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান, ইহুদী, কাফ্রী, আস্তিক, নাস্তিক প্রভৃতি বিশ্ব-বৈষ্ণব ধর্মের এক-একটি স্তর বা অঙ্গপ্রত্যঙ্গ। এই সব অঙ্গপ্রত্যঙ্গের চালন-পালন ক্রিয়া বিষ্ণুর যে শক্তিদ্বারা সাধিত হয়, সেই শক্তির উপাসকদেরই শাক্ত বলা হয়। এই রকম ব্রহ্মার 'সৃষ্টিশক্তি' আছে এবং শিবের 'সংহার শক্তি' আছে। শক্তিযুক্ত না হলে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব সবাই নিষ্ক্রিয়, শব সমান। আমরা বিশ্ব-সৃষ্টির জন্য মূল সৃষ্টিশক্তির উপাসনা করি না এবং সৃষ্টি সংহারের জন্যও সংহার-শক্তির নিকট প্রার্থনা করি না। সুতরাং আমরা একটি শক্তির উপাসনা করি তা বিষ্ণুরই পালনী শক্তি, যে জন্য তাঁর এক নাম বৈষ্ণবী শক্তি। শক্তি ছাড়া যেমন কোন জীব হাটাচলা করতে পারে না, কোন পদার্থের কোন ক্রিয়া থাকে না, তেমনি কোন ধর্মও চলতে পারে না। প্রতি ধর্মের ভিতরই বিষ্ণুর পালনী শক্তির অংশ-কলা বিদ্যমান। এবং প্রতি ধর্মের ভিতরই শক্তি-উপাসনা চলছে কোন না কোন আকারে। ধর্মকে ধারণ করতে, পালন করতে, সাধন করতে, রক্ষা করতে, বিষ্ণুকে অনুভব করতে যে শারীরিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক শক্তি-বল-ক্ষমতার আবশ্যক সেই শক্তির

সাধনাই শক্তি-সাধনা। দৈহিক শক্তি না থাকলে যেমন ভারী বোঝা বহন করা যায় না, তেমনি মানসিক শক্তি না থাকলে মনন নিদিধ্যাসন সম্ভবে না। তাই খাঁটি বৈষ্ণব হবার আগে খাঁটি শাক্ত হতে হয়। আগে ভজন-শক্তি অর্জন, পরে ভজন। শক্তিই বৈষ্ণবের ভজনপথের পাথেয়।

ঐ একই শক্তিকে যে সাত্ত্বিক সে সাত্ত্বিকভাবে ধ্যান করছে, যার রাজসিক বৃত্তি সে রাজসিকভাবে পূজা করছে, যার তামসিক ভাব সে তামসিক উপাচারে পূজা করছে। আমাদের নিজ নিজ সংস্কার অনুযায়ী একই শক্তিকে বিভিন্ন ভাবে দর্শন করছি। বিভেদ এখানেই, শক্তিতে নয়। বিষ্ণু যেমন শুদ্ধ সত্ত্বগুণ, তাঁর শক্তিও তেমনি শুদ্ধ সত্ত্ব-গুণময়ী। বিষ্ণুর শক্তিই বৈষ্ণবী শক্তি। বিষ্ণুকে বাদ দিয়ে তাঁর শক্তি নয় এবং শক্তিকে বাদ দিয়ে বিষ্ণু নয়।

৩৭। জপে ধ্যানে তোমার মন না বসলে চিন্তার কিছু নেই। কোথায় কি কাজে তোমার মন বসে আগে তাই ভাব। আহার, নিদ্রা, বা কোন প্রকার বৃত্তি, জীবিকা, যাতেই তোমার মনের স্বাভাবিক টান তাকেই মাতৃরূপে, পরমা প্রকৃতিরূপে চিন্তা কর, ধ্যান কর। যদি খাদ্যের প্রতি তোমার অত্যধিক লোভ, তবে ক্ষুধা পেলে এবং আহারের সময়ে বিশ্বজননীর কাছে প্রার্থনা কর—

"যা দেবী সর্বভূতেষু ক্ষুধারূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥"

যদি তুমি সর্বদাই নিদ্রাগ্রস্ত, তবে তাঁর কাছে প্রার্থনা কর—

"যা দেবী সর্বভূতেষু নিদ্রারূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥"

যদি বিশেষ কোন প্রকার বৃত্তি বা জীবিকার প্রতি তোমার বিশেষ আকর্ষণ থাকে, তবে জগন্মাতার নিকট প্রার্থনা কর—

"যা দেবী সর্বভূতেষু বৃত্তিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥"

এই সব ত্রাণমন্ত্রাদি উচ্চৈঃস্বরে দেহ মন প্রাণ আলোড়িত করে সর্বদা বলতে থাক যেন মন্ত্রের ঢেউ তোমার প্রতি অঙ্গপ্রত্যঙ্গে, প্রতি ইন্দ্রিয়ের রন্ধ্রে রন্ধ্রে অণুতে পরমাণুতে সবেগে প্রবেশ করে। তার ফলাফল কি হবে, তা আর অপরকে বলে দিতে হবে না। তখন মন্ত্রচৈতন্যই তোমার সুপ্ত চেতনাকে, সুপ্ত শক্তিকে জাগিয়ে তুলবেন। এই মন্ত্রশক্তি বা মাতৃশক্তিই ভজনপথের সমস্ত বাধাবিঘ্ন অপসারিত করে দেন, ভজন-বিরোধী সমস্ত অসুর-শক্তিকে দশ হাতের দশপ্রহরণ দ্বারা দমন করেন। ভজন-বিরোধী শক্তিগুলিও মায়েরই শক্তি। তোমার প্রার্থনায় মা ক্ষুধা-নিদ্রা-বৃত্তিরূপাদি পরিহার করে শ্রদ্ধাভক্তিরূপে দেখা দেবেন।

৩৮। যদি আপন অপরাধের এক কণাও স্মরণে রাখতে তবে আর অপরের ছিদ্র অনুসন্ধানে মন দিতে না। আপন অজ্ঞতার পরিমাণ জান না তাই নিজকে এত বুদ্ধিমান মনে কর, মনে এত অহংকার। যদি এক রতিও শুদ্ধজ্ঞান লাভ করতে তাহলে দেখতে তুমি আমি কত ক্ষুদ্র, কত নগণ্য। তখন অহংকার কর্পূরের মত উবে যেত। শুদ্ধ দৃষ্টি, শুদ্ধ ভাবনা, শুদ্ধ চিত্ত যদি চাও তবে আপন অপরাধ অজ্ঞতা বুঝতে চেষ্টা কর, আত্মানুসন্ধানে রত হও। আপন দোষকে পর্বতপ্রমাণ দেখতে অভ্যাস কর, আর অপরের ত্রুটিকে তিলপ্রমাণ ভাবতে শেখ। আপন দোষ একবার চোখে পড়লে তা সংশোধন করতেই জীবন কেটে যাবে, তখন আর অপরের ছিদ্র দেখার অবসর হবে না। যদি জ্ঞানী হও তবে আত্মশোধনেই মন দিবে, পরচর্চায় প্রবৃত্ত হবে না। যতক্ষণ কাম ক্রোধ লোভ মোহ ইত্যাদি থাকে ততক্ষণ আত্মানুসন্ধান আরম্ভ হয় না। আর তা

না হওয়া পর্যন্ত সাধনাও আরম্ভ হয় না। সাধনা মানে আত্মতত্ত্ব জানা।

৩৯। তুমি কি ভগবানের দর্শন চাও? তাঁকে কি কখনো দেখ নি? যিনি সর্বদা সর্বস্থানে বর্তমান, তাঁকে কভু দেখেনি এমন কেউ আছে কি? তুমিও তাঁকে দেখেছ, সর্বদাই দেখতে পাচ্ছ। কিন্তু দেখেও তাঁকে চিনতে পারছ না। দেখেছ বলে স্বীকার করতেও পারছ না। এর কারণ ভগবানের স্বরূপ জানা নেই, আর যে চোখে দেখলে তাঁর স্বরূপ ধরা পড়ে সে চোখে মায়াচশমা লাগান আছে। মায়া-চশমা খুলে গেলে এই মুহূর্তেই তাঁকে চিনতে পারবে। ভগবানের লীলাসাহায্যকারিণী মা মহামায়া তাঁর লীলা পবিচালনার সুবিধার্থে আমাদের চোখে এই মায়াচশমা পরিয়ে দিয়েছেন। এ চশমা না থাকলে জগৎ-লীলা অচল। তাহলে যে তুমি বুড়ী ছুঁয়ে ফেলবে, খেলা এখনই বন্ধ হয়ে যাবে! মায়া-দেবীর কাছে দিনরাত প্রার্থনা কর কান্নাকাটি কব চশমা খুলে দেবার জন্য। যিনি এই চশমা পরিয়েছেন তিনি ছাড়া এ খুলবার সামর্থ্য আর কারো নেই। তিনি কৃপা করে খুলে দিলেই শুদ্ধ-দৃষ্টি ফিরে পাবে। তিনি অঘটনঘটনপটীয়সী মায়া। জীবকে ভগবানের সঙ্গে যোগ করেও দিতে পারেন, আবার বিয়োগ করেও দিতে পারেন। যোগ-বিয়োগের চাবি মা'র আঁচলে বাঁধা। ভগবৎ লীলা-নিকেতনের সর্বময়ী কর্ত্রী তিনি, ভুক্তি মুক্তির একমাত্র অধীশ্বরী।

৪০। ভগবানের নাম নিতেই দুঃখের পাহাড় হাজির হয় কেন? এখনও তোমার সুখদুঃখে সমজ্ঞান হয় নি, সেজন্যই দুঃখের পাহাড় হাজির হয়। যাতে তোমার সুখদুঃখে সমজ্ঞান হয়, যাতে তুমি দ্বন্দ্বাতীত হতে পার, মনে সাম্যভাব আসে, যাতে সুখে বিগলিত না হও, দুঃখে মোহ্যমান বা কাতর না হও, তোমাকে সেরকম একজন

উপযুক্ত ভক্ত গড়ে তোলার জন্য ভগবান বার বার দুঃখের আঘাত দিতে থাকেন। এই আঘাতে আঘাতে ভিতরকার সুপ্ত সত্তা জাগ্রত হলে তোমার মহত্ত্বের পূর্ণবিকাশ ঘটবে। অনাদিকাল থেকে হরিবিমুখ-তার জন্য আমাদের সদ্‌বৃত্তিগুলি, শুদ্ধসত্ত্ব ভাবটি সাধনভজনরূপ ঘষা-মাজার অভাবে ময়লাজড়িত হয়ে আছে। একমাত্র কঠিন দুঃখের কষাঘাতেই জন্মজন্মান্তরের সঞ্চিত ময়লার উপযুক্ত মার্জন হয়। জীব ভগবদ্‌মুখী হলেই কৃপালু ভগবান অনতিবিলম্বে ভক্তকে শুদ্ধ-স্বরূপে ফিরিয়ে আনবার জন্য পরপর কঠিন দুঃখ প্রদান করেন। গভীর দুঃখই ভগবানের করুণা। দুঃখ সইতে না পারলে তাঁকে চিনতেও পারবে না। দুঃখের বেশেই তিনি ধরা দেন।

৪১। "হরের্নামৈব কেবলম্" বাক্যে কেবল শ্রীনাম সংকীর্তনকেই বুঝায় না, নামজপকেও বুঝায়। উচ্চৈঃস্বরে নাম সংকীর্তনে যেমন বহিরঙ্গ পরিবেশ শুদ্ধ হয়, চিত্তশুদ্ধি হয় তেমনি অন্তরে রস-পিপাসারও উদ্রেক হয়। কীর্তন করতে করতে দেহ-ইন্দ্রিয়াদির শোধন হয় যাতে নামব্রহ্ম অন্তরে প্রবেশ করতে পারে। কীর্তন হতেই জপের শক্তি সঞ্চারিত হয়। কীর্তন উদ্‌যোগপর্ব, জপ শান্তি-পর্ব। কীর্তনে আবাহন, জপে প্রাপ্তি বা মিলন। কীর্তন সাধনা, জপ সিদ্ধি। কীর্তনের পরিণতি জপ, অর্থাৎ জপই কীর্তনের পরিপূর্ণ অবস্থা। কীর্তন দ্বারা সাধক জপারূঢ় হয় এবং জপ দ্বারা সিদ্ধি লাভ করে। জপের তিন রকম নিয়ম আছে। মনে মনে মন্ত্রজপকে মানসিক জপ বলে। ওষ্ঠ ও জিহ্বা কিঞ্চিৎ পরিচালনা করে নিজে মাত্র শুনতে পায় এমন জপকে উপাংশু জপ বলে এবং বাক্যদ্বারা মন্ত্র উচ্চারণকে বাচিক জপ বলে। সেদিক থেকে কীর্তনকেও বাচিক জপ বলা চলে কারণ, হরিনামই মহামন্ত্র। জপারূঢ় হলে বা জপে বিনিয়োগ হলে নামরূপ হরি হৃদয়পদ্মে সমাসীন থেকে পরবর্তী যথাকরণীয় করিয়ে নেন। এর জন্য সাধককে বিশেষ ভাবতে হয় না। এজন্যই "কেবলম্" শব্দে নির্দেশ দিচ্ছেন—কেবল নাম

করে যাও, বাকী ভাবনা সব ভগবানের।

৪২। হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥

এই মহামন্ত্র মহারাসের প্রতীক, অনন্ত রাসের প্রতীক, চিরন্তন রাসের প্রতীক, সৃষ্টির প্রতীক· পালনের প্রতীক, লয়ের প্রতীক। এক কথায় নির্গুণ ব্রহ্মের পূর্ণমূর্তি শ্রীনামবিগ্রহ। এঁকে প্রণব মন্ত্রের লীলাভাষ্যও বলা যেতে পারে। ঈশ্বরের যেমন অনন্ত শক্তি, তাঁর নামেরও তেমনি অনন্ত শক্তি। ভগবান যেমন চতুর্বর্গ—ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ প্রদান করেন, তদীয় নামও তেমনি চতুর্বর্গ দিতে সক্ষম। সে দিকে না গিয়ে শ্রীনামের পঞ্চম পুরুষার্থ প্রেমধন প্রদানের রহস্য আস্বাদনের চেষ্টা করি। অপরাপর শ্রীবিগ্রহের প্রেমদানের সামর্থ্য দেখা যায় না, কেবল শ্রীনাম-বিগ্রহেরই তা দেখা যায়। নাম-বিগ্রহের অধিষ্ঠান একমাত্র শ্রীবৃন্দাবনে। এজন্য শ্রীবৃন্দাবন ভিন্ন অন্যত্র প্রেমের প্রকাশ নেই। প্রেম গুণাতীত বস্তু বা ভাব। কিভাবে শ্রীনামব্রহ্ম জীবকে গুণাতীত তত্ত্বে পৌঁছান তার ইঙ্গিত এই মহামন্ত্রের ভিতর লক্ষ করা যায়।

এই মন্ত্রের ষোল নামে ষোলটি যুগলরূপ। অর্থাৎ এঁতে ষোলটি নায়করূপ এবং ষোলটি নায়িকারূপ। ষোল-নায়িকা অর্থে হ্লাদিনী শক্তির ষোলকলার পূর্ণতম বিকাশ। এবং তদনুরূপ ষোল নায়ক। এই ষোল কলায় পূর্ণাভিষেকের পরই প্রেমতত্ত্বে অবগাহন। কর্মানুষ্ঠান ব্যতীত যেমন নৈষ্কর্ম্য লাভ হয় না, তেমনি প্রেমকলায় সফল উত্তরণ ব্যতীত পূর্ণকাম হওয়া যায় না। এজন্য রাসলীলাকে কামজয়ী লীলা বলা হয়েছে। কামকে মোহিত করে, জয় করে পূর্ণকাম বা মদনমোহন-তত্ত্বে পৌঁছান। একমাত্র এই মহানামেই মদনজয়ের পূর্ণতথ্য পাওয়া যায়। এখানে মদন-যুদ্ধে জয়ের নিমিত্ত তথা ত্রিগুণাতীত তত্ত্বে উত্তরণের নিমিত্ত যে তিনটি

পরাগুণময় যুগলরূপকে অবলম্বন করা হয়েছে তা হল—'হরে', 'কৃষ্ণ' এবং 'রাম'। প্রথমে "হরে" কামকলা জয়, তৎপরে 'কৃষ্ণ' কামকলা এবং শেষে "রাম" কামকলা জয়। এই পরাযুগলত্রয় আকার-আকৃতিতে এবং স্বভাব-স্বতত্ত্বে একই যুগল ভিন্ন ভিন্ন রসস্তরে। যেমন—

নাম		রূপ	লীলা	ধাম
হ—হরি	=	বিষ্ণু	ভক্তিবিরোধীভাব	প্রথম স্তর
রে—রমা	=	লক্ষ্মী	হরণ করা	স্বর্গ
			তম+রজ ভাব	
কৃ—কেশব	=	কৃষ্ণ	আকর্ষণ করা	দ্বিতীয় স্তর
ষ্ণ—পরমা	=	আয়ান-	রসের আকর্ষণ	ব্রজ
বৈষ্ণবী		পত্নী	রজ+সত্ত্ব ভাব	
রা—রাসেশ্বরী	=	রাধা	রসবিহার	তৃতীয়স্তর
ম—মদনমোহন	=	শ্যাম	রাস	গোলোক
			গুণাতীত তত্ত্ব	

৪৩। প্রেম পঞ্চম পুরুষার্থ বা পরম ধর্ম। চারি পুরুষার্থ—ধর্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষ মানবহৃদয়ের সব চাহিদা পরিপূর্ণরূপে মেটাতে পারে না। ঐ চারি পুরুষার্থ লাভ হলেও অভাব থাকে প্রেমের তথা ব্রহ্মানন্দের। ব্রহ্মানন্দকে অখণ্ড আনন্দ বা ভূমানন্দও বলা হয়। ব্রহ্মানন্দ লাভ না হলে জীবের পূর্ণাবস্থা আসে না। একমাত্র প্রেমই ব্রহ্মানন্দ দিতে পারে। কারণ, প্রেম ব্রহ্মের স্বরূপ-শক্তি এবং একমাত্র প্রেম দ্বারাই ব্রহ্ম লভ্য, আস্বাদ্য হয়। ব্রহ্ম যেমন সর্বশক্তিমান, ব্রহ্মানন্দ বা প্রেমও তেমনি সর্বশক্তিমান। মানবমনকে কানায় কানায় রসপূর্ণ করতে একমাত্র ব্রহ্মানন্দই সক্ষম। নির্গুণ নিরাকার ব্রহ্মের প্রকাশ তিন রূপে—

(১) অন্তরঙ্গা—চিৎ-শক্তি (বা স্বরূপশক্তি) রূপে,

(২) তটস্থা—জীব-শক্তি (বিশ্বের জীবসমুদয় —পরা প্রকৃতি) রূপে,

(৩) বহিরঙ্গা—মায়া-শক্তি (জগৎসৃষ্টিকারিণী শক্তি—
অপরা প্রকৃতি) রূপে।

এখন ভগবান স্বয়ং কি বস্তু তা জানতে হলে বা আস্বাদন করতে হলে আমাদের যেতে হবে তাঁর স্বরূপশক্তির কাছে। এই স্বরূপ-শক্তির তত্ত্ব অনুসন্ধান করলে পাওয়া যাবে তিনটি প্রধান গুণ—সৎ, চিৎ এবং আনন্দ। এই বিশেষ তিন গুণের জন্য ভগবান সচ্চিদা-নন্দ স্বরূপ। ভগবানের স্বরূপ আস্বাদন করতে হলে তাঁর সচ্চিদানন্দ স্বরূপে ডুব দিতে হবে। ডুব দিয়ে অনুসন্ধান করতে হবে এই তিনটির মধ্যে কোনটি বেশী মিষ্টি, বেশী সুখদায়ী। এই তিনটি গুণের পরিচয় হল—

সৎ—সদ্ অংশে সন্ধিনী (বল)। 'সৎ' বলতে বুঝায় অস্তিত্ব, সত্ত্বা। অর্থাৎ যে বস্তু (বল) অক্ষর, অবিনাশী ; আগেও ছিল, এখনও আছে, পরেও থাকবে। যে শক্তির কোন কালে কোনরূপ পরিবর্তন নেই। নাম-রূপ-গুণ প্রভৃতি যাবতীয় ব্যাপার সন্ধিনী শক্তির কাজ।

চিৎ—চিৎ অংশে সম্বিৎ (জ্ঞান)। 'চিৎ' শব্দে চৈতন্য বা জড়াতীত বস্তু বুঝায়, অর্থাৎ জ্ঞান-তত্ত্ব বুঝায়। সমস্ত তত্ত্ব এই "চিৎ" বস্তুর উপর দাঁড়িয়ে আছে। "চিৎ" আছে তাই সত্ত্বাবোধ আছে, আনন্দ-অনুভূতি আছে।

আনন্দ—আনন্দাংশে হ্লাদিনী (ক্রিয়া) শক্তি। "কৃষ্ণকে আহ্লাদে তা'তে নাম আহ্লাদিনী।" আহ্লাদিত বা আনন্দিত করে বলে এই শক্তির নাম হ্লাদিনী। হ্লাদিনী কৃষ্ণকে আনন্দ দান করে এবং ভক্তগণেরও আনন্দের পুষ্টি সাধন করে।

এই তিনটি শক্তির যে কোনও একটিকে অপর দুটি হতে আলাদা করা যায় না। এই তিনটি শক্তি সর্বদা কৃষ্ণস্বরূপে অবস্থিতি করে

বলে এঁদের স্বরূপ-শক্তি বলে। অথবা এই শক্তিগুণে কৃষ্ণের স্বরূপ জানা যায়, আস্বাদন করা যায় বলেও এঁদের স্বরূপ-শক্তি বলে। হ্লাদিনীর ঘনীভূত ভাব বা সার অংশকে প্রেম বলা হয়।

এই প্রেম লাভই জীবের চরম লাভ, সর্বোত্তম লাভ, পরিপূর্ণ লাভ। ইহার পর আর কোন লভ্য বস্তু নেই। প্রেম-প্রাপ্তিই কৃষ্ণ-প্রাপ্তি।

৪৪। গীতায় শ্রীভগবান বলেছেন—

"ঊর্ধ্বমূলম্ অধঃশাখম্ অশ্বত্থং প্রাহুঃ অব্যয়ম্"—বলা হয়ে থাকে যে, অবিনাশী অশ্বত্থের মূল ঊর্ধ্বদিকে এবং শাখাসমূহ অধোগামী (১৫।১)।

এখানে বিশ্বজগৎরূপ ব্যক্ত ব্রহ্মকে একটি অশ্বত্থ বৃক্ষের সঙ্গে তুলনা করে বলেছেন—ঐ ব্রহ্মবৃক্ষের মূল ঊর্ধ্বে অর্থাৎ অব্যক্ত ব্রহ্মে এবং এর শাখাগুলি নিম্নমুখী অর্থাৎ সৃষ্টিমুখী। এই ভগবৎ বচনের ভঙ্গিতেই মূল অন্বেষণের ইঙ্গিত আছে। আমরা কেউ এই ব্রহ্মবৃক্ষের কাণ্ডের উপাসনা করি, কেউ শাখার, কেউ উপ-শাখার, কেউ পত্রের, কেউ ফুলের এবং কেউবা ফলের উপাসনা করি। প্রথমে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুই ঐ বৃক্ষের মূলের ভজনা করতে পথ দেখালেন। ব্রহ্মবৃক্ষের মূলস্বরূপ পঞ্চম পুরুষার্থ প্রেমের ভজনার কথা মহাপ্রভু নির্দেশ করলেন। যে তত্ত্ব কোন যুগে কোন অবতার জীবকে দেন নি, সেই অপ্রমেয় প্রেমতত্ত্ব মহাপ্রভু অবিচারে দ্বারে দ্বারে অযাচিতে দান করলেন। প্রেমই সৃষ্টির মূল এবং প্রেম প্রাপ্তিই আমাদের মূল লক্ষ্য।

৪৫। জপ-মালা শুধুই মালা নয়, ভেলাও বটে। এ ভেলা মায়া-সমুদ্রে নিমজ্জমান জীবকে কেবল প্রাণেই বাঁচায় না, পর-পারেও পৌঁছে দেয়। কণ্ঠ যখন নামজপ ভুলে যায় বা বন্ধ

করে তখন এই মালা নামকে ধরে রাখে এবং যথাসময়ে নামকে কণ্ঠে আরোপণ করে। নাম-জপ বা মন্ত্র-জপ জাতিধর্মনির্বিশেষে একটি অবশ্য করণীয়। হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান, পার্শী প্রভৃতি পৃথিবীর প্রায় সব ধর্মেই জপের জন্য মালা ব্যবহার করতে দেখা যায়। সকল ধর্মের ভিতর অন্ততঃ এই একটি বিষয়ে মিল দেখা যায়। এ দ্বারা মালার আবশ্যকতা তর্কাতীতভাবে প্রমাণিত।

৪৬। সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥

গীতা ১৮।৬৬

অর্থ—(ভগবান অর্জুনকে বলেছেন) সকল ধর্ম পরিত্যাগ করে তুমি একমাত্র আমার শরণ লও। আমি তোমাকে সকল পাপ হতে মুক্ত করব, শোক করো না।

ভগবানের এই অভয়বাণীর সুফল লাভ করতে হলে এবং শাস্ত্রোক্ত নানাবিধ বিধিনিষেধের বাঁধনে ধরা না দিয়ে শুধু ভগবৎ শরণাগতি দ্বারা পরমপদ লাভ করতে হলে "মামেকং" শব্দের তাৎপর্য ও ভাব পূর্ণরূপে গ্রহণ করতে হবে। এর জন্য ভাগবতের দ্বারস্থ হতে হবে।

যথা—আচার্য্যং মাং বিজানীয়াৎ নাবমন্যেত কর্হিচিৎ।
ন মর্ত্ত্যবুদ্ধ্যাসূয়েত সর্ব্বদেবময়ো গুরুঃ॥ ১১।১৭।২৭

অর্থ—ভগবান বললেন, আচার্যগুরুকে আমার তুল্য মনে করবে। কখনও তাঁর অবমাননা বা মানুষ মনে করে তাঁর দোষ আবিষ্কার করবে না। কেননা গুরু সর্বদেবতাময়।

ভাগবতের এই আদেশবাক্যটিকে গীতার উক্ত অভয়বাণীর সঙ্গে একত্রে অনুধাবন করতে হবে। অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে যেরূপ

সাক্ষাৎভাবে পেয়েছিলেন সেরূপ আমরা পাচ্ছি কি ? অর্জুনের মত ভগবানকে সাক্ষাৎভাবে না পেলে আমাদের পক্ষে ঐ অভয়বাণীর চিরন্তন সার্থকতা কোথায় ! গীতোক্ত বাক্যের সার্থকতা পাওয়া যাবে ভাগবতের বাক্যটির ভিতর। শ্রীকৃষ্ণকে আমরা আচার্য গুরুরূপে সর্বদাই পাই। কৃষ্ণস্বরূপ গুরুর শরণ নিলেই আমরা সর্বপাপ হতে মুক্ত হতে পারি।

সকল ধর্ম, সব উপদেশ, সব শাস্ত্রবাক্য ত্যাগ করে একমাত্র সদ্‌গুরুর বাক্য আশ্রয় করলেই আমাদের ভজনপথ যেমন সহজ সরল হয় তেমনি পরমপদপ্রাপ্তিও সুনিশ্চিত হয়। ভজনের এই সহজতম পথ আমাদের কাছে সুলভ না হবার কারণ, আমরা গুরুকে মনুষ্য জ্ঞান করি, তাঁর দোষ ত্রুটি দেখতে বসি। শ্রীগুরুতে যার শুদ্ধারতি তার অন্য ভজনের আবশ্যক হয় না। তার কাছে গুরুই ব্রহ্মা, গুরুই বিষ্ণু, গুরুই মহেশ্বর, গুরুই পরম ব্রহ্ম।

৪৭। আমরা যে দেবদেবীর মূর্তি মানুষের আকারে তৈরী করে পূজা করি তার একটি বিশেষ অর্থ হল—মানুষের ভিতরই এই সব দেবদেবীর দর্শন পাওয়া যায়। মানুষকে দেব অথবা দেবীজ্ঞানে পূজা করার এ একটি ইঙ্গিত। শ্রীগুরুকে পূজা করলে সর্বদেবতার পূজা করা হয়। তাছাড়া শ্রুতিমন্ত্র বলেছেন--যিনি ব্রহ্মকে জানেন তিনি ব্রহ্মই হন। এই মন্ত্র অনুসারে কোন সিদ্ধভক্ত তাঁর আরাধ্য দেব অথবা দেবীর গুণ-ভাব প্রাপ্ত হন। কখন সেই দেব-দেবীর ভাবাবেশও ভক্তের দেহে প্রকাশিত হয়। কখনবা ভক্তের সমাধি অবস্থায় সেই দেব-দেবী ভক্তদেহে আবির্ভূত হন। এরূপ ভক্তের পূজা করলে সে পূজা তাঁর আরাধ্য দেবদেবীও স্বীকার করেন, গ্রহণ করেন। নরদেহে নারায়ণ দর্শন এবং মন্দির-বিগ্রহে নারায়ণ দর্শন, এ দুটি বিচারে যতই এক হোক না কেন,

এদের ভিতর একটু পার্থক্যও আছে। যেমন, শ্রীবিগ্রহে কারো নারায়ণ দর্শন হলেই যে তার সর্বদেহে নারায়ণ দর্শন হবে এমন কথা সব সময়ে সত্য নয়। কিন্তু যে সর্বদেহে সর্বদা নারায়ণ দর্শন করে তার পক্ষে শ্রীবিগ্রহে নারায়ণ দর্শন অতি স্বাভাবিক। মূল কথা, চলমান ব্রহ্মে যার ব্রহ্মজ্ঞান হয়নি, অচল ব্রহ্মে তার ব্রহ্মজ্ঞান কতদূর সত্য তা বিচারের বিষয়। নরদেহে নারায়ণকে খুঁজে না পেলে, মাটি-পাথরের দেহে তাঁকে কতটুকু পাওয়া যাবে!

৪৮। সব সময়ে এই ভাবনা রাখবে—তুমি কৃষ্ণের দাস। গুরু যা কিছু আদেশ করেন তা সবই কৃষ্ণের আদেশ। তাঁর তৃপ্তি-সাধন করাই তোমার একমাত্র কাজ। তাঁর আজ্ঞায় ওঠা-বসা। তাঁর আনন্দেই তোমার আনন্দ। তোমার যা কিছু সবই তাঁর, তুমি তার রক্ষক মাত্র। এই ভাব সর্বদা মনে জাগ্রত রাখতে পারলে অহংকার অহংভাব কখনই তোমাকে বিপথে চালিত করতে পারবে না। অহংকার ঠাঁই না পেলে অন্যসব রিপু আর তোমার কাছে পাত্তা পাবে না। দুঃখও তোমায় স্পর্শ করতে পারবে না। ক্রমে ক্রমে ভক্তিভাব জেগে উঠবে।

৪৯। কোন সভায় বা দরবারে গিয়ে সেই দরবারের প্রধানের সঙ্গে কথা বলতে পারলে, ভাব জমাতে পারলে গৌরব বোধ কর। তখন আর দরবারের ইতরজনের সঙ্গে কথা বলার ইচ্ছে হয় না। সেইরকম কৃষ্ণের সঙ্গে কথা বলতে পারলে, তাঁর ঘনিষ্ঠ হতে পারলে অন্য কোন দেবতার ভজন করতে মন চাইবে না। অবশ্য তার প্রয়োজনও হয় না। সর্বদা নামজপের দ্বারা নামীর সঙ্গে যুক্ত থাকবে। তাঁর সঙ্গে ভাব জমাবে। মনে মনে আলাপ করবে। ভাবের লেনদেন করবে। দেখবে, তিনি তোমার কত আপন হয়ে গেছেন। তাঁর সঙ্গ ছাড়া তখন অন্য কিছুই ভাল লাগবে না।

৫০। সব ভাবনা ছেড়ে দিয়ে আগে অন্তরের পাপকে খুঁজে বের কর। একবার আপন পাপের মুখোমুখি হলে পাপ আপনি পালাবে। তার জন্য অন্য চেষ্টা করতে হবে না। সত্য ও ধর্ম নিত্যবস্তু, সকলার মধ্যে সর্বদাই বিরাজ করছেন। পাপ হটে গেলে আপনা থেকেই তারা জেগে উঠবে। তার জন্য সাধনা করতে হয় না। মনকে সাফ করার জন্যই সাধনার প্রয়োজন। পাপে মন অপরিষ্কার বলে সত্য উপলব্ধি হয় না, ধর্মে মন বসে না। মন শুদ্ধ হলে সর্বদা এমন আনন্দ-স্রোত অন্তরে বইতে থাকবে যে, তখন ঐ আনন্দরস আস্বাদন ছাড়া অন্য রসে মন যাবে না। মূল্যবান সম্পদ লোকে যেমন লুকিয়ে ভোগ করতে চায়, তুমিও তেমনি ঐ আনন্দ-রসকে লুকিয়ে আস্বাদন করতে চাইবে, বাইরে প্রচার করতে চাইবে না।

৫১। তুমি, আমি যেখানে দাঁড়িয়ে সত্যের যে রূপটি দেখছি, সেটাই তার শেষ রূপ নয়। 'সত্য' আরো সত্য, আরো কঠিন। সত্য-সাধনায় আত্মতুষ্টির অবকাশ নেই। যতই সম্মুখে চলবে আরো নব নব সত্য ধরা পড়বে। লব্ধ সত্যের আলোকে চিত্ত শুদ্ধি করে সম্মুখে অলব্ধ সত্যের জন্য প্রস্তুত হও।

৫২। যদি কারো এমন ভাব দেখ, যেন সে সব তত্ত্বই বুঝে গেছে ; তা হলে তার ছোঁয়া বাঁচিয়ে চলতে সর্বতোভাবে চেষ্টা করবে। এ বড় কঠিন ছোঁয়াচে রোগ। অহংকার এবং অভি-মানের মত সর্ববিধ্বংসী রোগ আর নেই। এ রোগ তোমাতে এলে তোমার ভক্তিবীজ অঙ্কুরেই বিনষ্ট করে দেবে। এর হাত থেকে বাঁচা বড়ই কঠিন, অসম্ভব। খুব সাবধান! যেটুকু অর্জন করেছ সেটুকু তো যাবেই, মূলধনেও টান পড়তে পারে। ঘোড়া দেখলে যদি শতহাত দূর থেকে যেতে হয়, তবে এই জ্ঞানগর্বী-দের সহস্র হাত দূরে রেখে চলবে।

৫৩। যখন সৎসঙ্গে বসবে তখন সকলেই একমন একপ্রাণ হয়ে তন্ময় হতে চেষ্টা করবে এবং আলোচ্য ভগবৎ রূপ গুণ লীলা যেন প্রত্যক্ষ করছ, এই ধ্যান রাখবে। তবেই রস পাবে। সৎসঙ্গের ফল পাবে। সৎসঙ্গ বড়ই দুর্লভ। সৎসঙ্গের ফল আরো দুর্লভ। আপন ধ্যান-ধারণা অনুভব-অনুভূতিতে ফাঁক থাকলে কেবল সৎসঙ্গেই তা পূরণ হয়।

৫৪। কোন কিছু দর্শন হলে অথবা কিছু অনুভূতি পেলে তা প্রকাশ না করে, মনে মনে সর্বদা তার ধ্যান বা চিন্তা করলে দর্শন-শক্তি তথা অনুভব-শক্তি বাড়ে। সুতরাং যথাসম্ভব আপন ভজন গোপন রাখবে। কথা যত কম বলবে ধ্যানের শক্তি, মনের শক্তি তত বাড়বে। শক্তি-অপচয়ের বদ্ অভ্যাস বন্ধ না করলে কোন্ ফাঁকে যে ভজন শক্তি উবে যাবে তা বুঝতেও পারবে না।

৫৫। মনে হয়, তোমরা শুদ্ধ সত্ত্বকে, নির্ভেজাল সত্যকে, প্রকৃত ধর্মকে গ্রহণ করতে ততটা আগ্রহী নও। কোটি লোকের ভিতর একজনও পাওয়া দুষ্কর, যে শুধু ভগবানকেই চায় অন্য কিছুই চায় না। তোমরা কি হরির জন্য হরি-ভজন করছ; না, যশ মান প্রতিষ্ঠার জন্য হরিকে ডাকছ, বুকে হাত দিয়ে উত্তর দাও দেখি? তোমাদের হরিও চাই, ধন-মানও চাই। অর্থাৎ একটু না একটু ভেজাল বস্তুতেই তোমাদের আসক্তি, সে তোমার পারিপার্শিক অবস্থার জন্যই হোক বা অন্য কোন কারণেই হোক।* পার্থিব প্রেমের জন্য অনেক সময় ছেলে-মেয়েদের আত্মবলির কথা শুনা যায়। কিন্তু কৃষ্ণপ্রেমের জন্য কজনে প্রাণ দিতেছে! লোকে অর্থের জন্য প্রাণও দেয়, কিন্তু পরমার্থের জন্য মন দিতেও নারাজ। ভগবানকে পেতে হলে ঐ রকম প্রাণপণ করতে হয়। প্রাণের ষোল-আনাই তাঁকে দিতে হয়। তবেই তুমি ষোল-আনা ভাগে

তাঁকে পেতে পার। তুমি যতটুকু তাঁকে কম দেবে, ঠিক ততটুকু কমই তাঁকে পাবে। ঠিক বলা হল না। তুমি এক পা এগোলে তিনি দু'পা এগিয়ে আসেন।

৫৬। ফাঁকি দেওয়ার অভ্যাস সম্পূর্ণভাবে ত্যাগ করবে, সে তুমি সংসারপথেই থাক আর সাধনপথেই থাক। ফাঁকির অপর নাম আত্মপ্রবঞ্চনা। সাধনপথের কথা ছেড়েই দাও, ফাঁকি দেওয়ার অভ্যাস নিয়ে তোমার সংসারধর্মই চলবে না। সংসারে সুখী হতে হলেও সত্যপথে চলা চাই। ফাঁকির ফিকির চালিয়ে দুচার দিন সংসারে মজা লুটতে পার, তারপর এমন ফাঁকে পড়বে যখন তোমার আপন জনও তোমাকে এড়িয়ে চলবে। কেঁদেকেটেও আর তাদের মন পাবে না। তখন তুমি নিঃস্ব নিঃসহায় নিরানন্দময়।

৫৭। হরিকথা শুধু কানে শুনলেই শোনা হয় না। যখন সেই কথা অনুযায়ী কাজ করবে তখনই হরিকথা শ্রবণ করা হল। সব সময়েই হরিকথার ভিতরে জ্ঞান ভক্তি বা কর্মের উপদেশ থাকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে। কথাশ্রবণের সময়ে সেই সব জিনিষ মনে গেথে নিয়ে তদনুরূপ কাজ করতে হয়। কর্ম ছাড়া সাংসারিক জ্ঞানই হবে না; ব্রহ্মজ্ঞান তো বহু দূরের কথা।

৫৮। কেউ যদি কিছু ভেবে নিয়ে তোমার সঙ্গে কথা বলা বন্ধ করে অথবা কম কথা বলে, তাতে তুমি মনে মনে খুশী হবে এই ভেবে যে, এতে তোমার শক্তি এবং সময়ের অন্ততঃ এক কণাও বেঁচে গেল।

৫৯। সব দাতার দান গ্রহণ করতে নেই। কোন কোন দাতার কাছ থেকে দ্রব্য-দানের বদলে বাক্যদণ্ড-দান পছন্দ করি। তার আদরের চেয়ে অনাদর আমার কাছে বেশী হিতকারী। লোকের

অনাদর ভগবানের আদর পাবার লোভ বাড়িয়ে দেয়। স্বজন পর হলে পরম জন আপন হন।

৬০। আমাদের মনের কপটতা যে কত গভীরে, একটু ভেবে দেখলেই তা বুঝা যায়। অন্তরের পাপ অন্তর্যামীর নিকটও গোপন রাখতে চেষ্টা করি। একবারও মনের সমস্ত পাপ তাঁর চরণে নিবেদন করে বলতে পারি না - হে ঠাকুর, তুমি আমায় নির্মল কর, শুদ্ধ কর। তিনি অন্তর্যামীরূপে আমার অন্তরের সব খবরই জানেন। কিন্তু যতক্ষণ না আমি তাঁর শরণাগত হচ্ছি ততক্ষণ তিনি দ্রষ্টা মাত্র। দেখেও কিছু করবেন না। আর যখনই আমার ভাল মন্দ সব কিছু তাঁর চরণে সঁপে দিয়ে আত্মনিবেদন করব, শরণাগত হব, কেবল তখনই তিনি আমার সব দায়দায়িত্ব গ্রহণ করেন। কাঁধে আমিত্বের-ঝোলা দেখলে কোন ভগবানই ভিক্ষা দেবেন না।

৬১। যখন পাপ করার প্রবৃত্তি নাশ হয় তখনই ভগবান সঞ্চিত পাপকে নষ্ট নিষ্ক্রিয় করে দেন। যতক্ষণ পাপবৃত্তি থাকে ততক্ষণ তিনি কৃপা করেন না। আর এই বৃত্তি থাকা পর্যন্ত আত্মনিবেদন বা শরণাগতি-ভাব আসে না। সাধন দ্বারা এই বৃত্তিকে ধ্বংস করতে হয়। শাস্ত্রীয় নিয়মনীতি-রূপ অস্ত্র দ্বারাই ঐ বৃত্তিকে নিবৃত্ত করা যায়। রিপু জয় করতে শাস্ত্রকেই তোমার শস্ত্র কর।

৬২। তোমরা ডুমুরগাছ নিশ্চয়ই দেখেছ। দেখেছ, কি রকম তার গায়ের যে কোন জায়গা থেকে ফুলের নোটীশ না দিয়েই ফুটে ফুটে ফল বের হয়। আমাদের পাপের ফলও তেমনি। জানান না দিয়ে বিনা-নোটীশে কিরূপে কোনভাবে কোথা থেকে পাপের ফল ফুটে বের হবে তা কেউ জানে না। পাপের ফল কেউ আগে থেকে আন্দাজ করতে পারে না। অতএব, হুঁশিয়ার! মনে কথায় বা কাজে যে ভাবেই পাপ করা হোক না কেন, পাপ একটি কর্ম এবং কর্মের ফলভোগ অবশ্যম্ভাবী।

৬৩। সগুণ-নির্গুণ তত্ত্বটি একটু কঠিন মনে হতে পারে; বিশেষতঃ, কেমন করে নির্গুণ আবার সগুণ হলেন। নির্গুণ-ভাবকে আমাদের চিন্তার ভিতর আনার জন্য এর একটা অর্থ করা যেতে পারে, যেমন—নিত্যানন্দ ভাব। নির্গুণে সত্ত্ব-রজ-তম নেই, তবে সদানন্দ ভাব সর্বদা বর্তমান। এ আনন্দ সৎ ও চিৎ যুক্ত, চিন্ময়ানন্দ। বুঝবার জন্য একটা উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। যেমন, অতি শিশুর ভাব। শিশুকে ভাল বল, মন্দ বল, গাল পাড়, ধমক দাও সে সবটাতেই খিলখিল করে হাসবে। তার ভিতর একটা স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দ ভাব, নির্গুণ ভাব। কারণ, তার ভিতরে তখনও তিন গুণেব ক্রিযা আরম্ভ হয় নি। তাই সে সর্বাবস্থায় আনন্দভাব বজায় রাখতে পারছে। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ভিতরের সুপ্ত গুণগুলি বাইরের গুণস্পর্শে পরিস্ফুট হতে থাকে। অর্থাৎ নির্গুণভাব থেকে সগুণে আসতে থাকে। তখন ভাল বা মন্দ বলা হলে তার ভিতর তদনুরূপ ক্রিয়া হতে থাকে এবং সেই ক্রিয়াব ফল তার কথায় বা কাজে প্রকাশ পায়। নির্গুণের ভিতরই সগুণ ভাব সুপ্ত থাকে, আবার সগুণের ভিতর নির্গুণ লুপ্ত আছে।

৬৪। সত্যই ধর্ম, সত্যই ঈশ্বর। তবু সত্যকথা বা ঈশ্বরকথা বলেও অনেক সময়ে অনেক মহাত্মার মহাবিপদ ঘটেছে। প্রাণ পর্যন্ত দিতে হয়েছে। অবশ্য তাঁদের কাছে সত্যই ছিল প্রাণ। সুতরাং দেহস্থিত প্রাণের পরোয়া তাঁরা করতেন না। ঈশ্বরপুত্র যীশুখ্রীষ্ট, বিজ্ঞানাচার্য গ্যালিলিও, বৈষ্ণবাচার্য হরিদাস প্রভৃতি মহাত্মাগণ সত্যের জন্য প্রাণ দিয়ে সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন, ঈশ্বরের মহিমা প্রচার করেছেন। সত্যে প্রতিষ্ঠিত হওয়াই ব্রহ্মে স্থিতি লাভ করা। সুতরাং সত্যানুরাগীরা একটু সাবধান হবেন। সত্যের বিনিময় যেন কিছুই চাইবেন না, যশ মান এমনকি প্রাণটাও না। সুখদুঃখের বিচার করলে সত্যলাভ হবে না। সত্য ঘোরতর নির্মম।

৬৫। ধন প্রার্থনায় কুলমর্যাদার হানি, মান চাওয়ায় আত্মমর্যাদার হানি, আর প্রাণভিক্ষায় ইষ্টমর্যাদার হানি।

৬৬। এক ঈশ্বর, এক ব্রহ্ম ; তবু আমরা বহু দেবদেবীর পূজা করি। কারণ, আমাদের বহুমুখী বা বহির্মুখী মন স্বভাববশতঃ বহুতে আকৃষ্ট। তাই বহুর উপাসনা দিয়েই আমাদের ভজন আরম্ভ। তত্ত্বজ্ঞান লাভ দ্বারা বহুত্বের ভিতর দিয়ে একত্বে পৌঁছি। বহু দেব-দেবীর আরাধনা শাস্ত্রবিরুদ্ধ নয়। তাই বলে আজীবন বহুত্বে ডুবে থাকলে অদ্বয়তত্ত্বে পৌঁছবে কখন! গোবিন্দ-ভজন করবে কখন? অদ্বয়তত্ত্বে না পৌঁছলে গোবিন্দ-ভজন চলে না। শ্রীগোবিন্দই অদ্বয়তত্ত্ব।

৬৭। শ্রীশ্রীদুর্গাপূজার তত্ত্বটি সংসারী এবং সন্ন্যাসী উভয়ের কাছেই বিশেষ অর্থবহ। সংসারী তাঁর সংসারটিকে শিবের সংসার মনে করবেন। আর সন্ন্যাসী গৃহস্থের বাড়ীতে গিয়ে কৈলাসে এসেছেন মনে করবেন। গৃহকর্তাকে শিব, গৃহিণীকে গৌরী, তাঁদের পুত্র-কন্যাদের লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্তিক, গণেশ জ্ঞান করবেন। তাতে শুধু সাধুর নয়, গৃহবাসীরও মনোবৃত্তির উন্নতি ঘটবে, পরম মঙ্গল হবে। সংসারে ধর্মভাব বৃদ্ধি পাবে। সংসারের কর্তাও অনুরূপ ভাব পোষণ করলে সংসারে শান্তি এবং ধর্মচেতনা বৃদ্ধি পাবে। মঙ্গলের পথ প্রশস্ত হবে। যার যেমন ভাব, তার তেমন লাভ। পিতামাতা তাঁদের পুত্রকন্যাদের দেবশিশু ভাবলে শিশুদের ভিতর দেবত্ব প্রকাশ পেতে থাকবে। ভাবনার ভিতরেই সম্ভাবনার জন্ম।

৬৮। কৃষ্ণই একমাত্র পুরুষ, আর সবাই প্রকৃতি। এ কথার তাৎপর্য পুরাপুরি বুঝলে সাধনতত্ত্বের বীজ এখানেই পাওয়া যাবে। কৃষ্ণ পূর্ণতম ব্রহ্ম। ব্রহ্ম কখনই প্রকৃতি হতে উৎপন্ন হন না। প্রকৃতিই ব্রহ্ম হতে উৎপন্ন। ব্রহ্ম নির্গুণভাব, প্রকৃতি ব্রহ্মের সগুণভাব। ব্রহ্মের কোন জনক নেই, কিন্তু প্রকৃতির জনক ব্রহ্ম। শ্রীরাধাও

শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ হতে উৎপন্ন। সুতরাং আদ্যাশক্তিকে কালী, দুর্গা, রাধা, বা মহাশক্তি যে কোন নামেই বল তা ব্রহ্ম হতে বা কৃষ্ণ হতে উৎপন্ন। দৃশ্যমান জগতের নারীপুরুষ জীবজন্তু পশুপাখী তরু-লতা কীটপতঙ্গ সবই প্রকৃতি-দেহজাত। প্রকৃতির দেহ হতে উৎপন্ন বলেই আমরা সবাই প্রকৃতি।

প্রকৃতি হতে জাত আমাদের এই দেহটিও যেমন প্রকৃতি, আবার এই দেহপুরে যিনি বিরাজ করছেন তিনিই হচ্ছেন পুরুষ বা পরমাত্মা। প্রকৃতির দেহরূপ গৃহে গৃহকর্তা শুয়ে আছেন। আমাদের তৈরী গৃহ যেমন আমাদের সুখ দেয় আরাম দেয়, তেমনি এই দেহগেহের কাজ হচ্ছে পরমাত্মারূপী পুরুষকে সুখ দেওয়া আরাম দেওয়া বা তাঁর সেবা করা, ভজন করা। এই ভজন করতে গেলে আমাদের দেহ যে পরমাপ্রকৃতি হতে উৎপন্ন আগে সেই পরমা প্রকৃতির আনুগত্য স্বীকার করতে হবে। মাতার পরিচয় জানা না থাকলে যেমন মাতামহের পরিচয় জানা যায় না, তেমনি আগে পরমা-প্রকৃতির প্রকৃতি জানা না থাকলে পরম পুরুষকেও জানা যায় না। সুতরাং প্রকৃতির ভজনা আগে করতে হয়। পরম-পুরুষ থেকে পরমাপ্রকৃতি এসেছেন এবং আমি এসেছি পরমা প্রকৃতি হতে। আমাকে পরমপুরুষে ফিরে যেতে হলে অবশ্যই পরমা প্রকৃতির মাধ্যমে ফিরতে হবে। আমি পরমাপ্রকৃতির অংশ। আমাকে পূর্ণতমের কাছে যেতে হলে, পূর্ণতম তত্ত্বে পৌঁছতে হলে আগে আমার নিজ প্রকৃতিতে পূর্ণতা আনতে হবে পরমাপ্রকৃতির কৃপালাভ দ্বারা।

কে আমার পিতা, তা কেবল আমার গর্ভধারিণী জননী-ই বলে দিতে পারেন। সেইরূপ বিশ্বপিতার পরিচয় কেবল বিশ্বজননীই জানাতে পারেন।

৬৯। সুখ এবং দুঃখ লীলাচক্রযানের দুটি অপরিহার্য চক্র। সুখ বা দুঃখের যে কোন একটি বাদ দিলে লীলাচক্র অচল। দুঃখের সুখ-

ময় রূপটি দেখতে চেষ্টা কর। দুঃখ যে ছদ্মবেশী সুখ তা নিশ্চয় করে জান। দুঃখ স্বরূপতঃ মঙ্গল বা ঈশ্বর। দুঃখই সুখের আগমনী বার্তা। সুখ যেমন তোমার আবাহনমাত্রই দেখা দেয় না, দুঃখও তেমনি কারো ইচ্ছার উপর নির্ভর করে চলে না। দুঃখের পরই সুখের নিশ্চিত আগমন, এ কথা মনে রাখলে পথ চলা সহজ হবে। দুঃখের মঙ্গলদায়ীরূপ জানা না থাকার জন্যই দুঃখকে দুঃসহ মনে হয়।

কেউ কারো দুঃখ ঘোচাতে পারে না। রামচন্দ্র সীতার দুঃখ ঘোচাতে পারেন নি। বৃন্দাবন ছেড়ে কোথাও যাব না—কৃষ্ণের এ আশ্বাসবাক্য পেয়েও শ্রীরাধার শতবর্ষ বিরহের অবসান হয় নি। শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তর্ধানের পর দুঃখের পাষাণ বুকে নিয়ে বহুবর্ষ বেঁচে ছিলেন মাতা বিষ্ণুপ্রিয়া। সুতরাং কোন লোকের দুঃখ দূর করব, এ ভাবনা অচল। বরং মহাদুঃখের পর মহাসুখের আগমন প্রতীক্ষা করে ঈশ্বর-চিন্তায় দিন কাটাও, তাতেই মঙ্গল। মঙ্গল-চিন্তায়ই মঙ্গল আসবে। চিন্তা দ্বারা চিত্তের জ্বালা বাড়ানো যায়, আবার কমানও যায়।

৭০। ব্রহ্ম অনন্ত, মানে ব্রহ্ম নির্বিশেষ। ব্রহ্ম বহু, মানে সব কিছুই ব্রহ্ম। কোন তুলনা দিয়ে বা কোন সীমারেখা টেনে ব্রহ্মকে বুঝান যাবে না। তুমিও ব্রহ্ম, আমিও ব্রহ্ম। তবে আমরা সগুণ ব্রহ্ম। সগুণ ব্রহ্মে সীমিত সুখ সীমিত আনন্দ, তাই আমরা অতৃপ্ত। আমাদের তৃষ্ণা অনন্ত, তাই অনন্তের পানে ছুটি অসীম সুখের আশায়। সীমিত সুখে অনন্ত তৃষা ব্যাহত ব্যথিত হয়, তৃপ্তি আনে না। অসীম সুখে অনন্ত তৃষা ডুবে মরে। তৃষ্ণার লয় হয়। অনন্ত সুখে তৃষ্ণা আপন সত্তা হারিয়ে ফেলে। তৃষ্ণার পরাজয়, সুখের জয়। এ জয়পরাজয়ের কারণ, তৃষ্ণা প্রকৃতিজাত বলে প্রকৃতিস্বরূপ, অনন্ত সুখ ব্রহ্মের স্বরূপ বলে ব্রহ্মবস্তু। ব্রহ্মের কাছে প্রকৃতির চিরপরাজয়।

ব্রহ্মে কত সুখ, কত তৃপ্তি, কত আনন্দ তার কোন পরিমাপ-কর্তা নেই। ব্রহ্মের তুল্য বা বড় বস্তু কিছুই নেই, নেই কোন প্রতিদ্বন্দ্বী। ব্রহ্মই বলবান, বলীয়ানের বল, আদ্যাশক্তির মূল শক্তি, আবার দুর্বলেরও মহাবল।

এই ব্রহ্মকে অনুভব করতে অনন্ত শাস্ত্রানুমোদিত পথ আছে। এর যে কোন পথেই তাঁকে আস্বাদন করা চলে। তবু পথের পার্থক্য হেতু আস্বাদনেরও তারতম্য ঘটে। ফলে একই ব্রহ্মের বিবিধ পরিচয়। গোপীদের যিনি প্রাণবন্ধু, যোগীদের কাছে তিনিই কৃপাসিন্ধু। আবার আপামর জগৎবাসীর কাছে তিনি জগদ্বন্ধু জগন্নাথ।

৭১। নিজ নিজ সংস্কারবশতঃ আমরা প্রত্যেকেই দেহে মনে প্রাণে একে অপরের নিকট হতে আলাদা। আমাদের চিন্তাশক্তি অনুভবশক্তিও আলাদা। সেকারণ একই গুরুর শিষ্য হয়েও, একই পথের পথিক হয়েও আমাদের ভিতর পার্থক্য দেখা যাবে। একই বস্তুকে আমরা বিভিন্ন বিন্দু হতে দর্শন করি এবং বিভিন্ন সাধন-ফল পাই। এ সব পার্থক্য দূর হয় যদি গুরুতে শ্রদ্ধা-ভক্তি-নিষ্ঠা-জ্ঞান পরিপূর্ণতা লাভ করে।

৭২। সাধনা নকল করার বস্তু নয়। একজনের সাধনা অন্যজনে হুবহু নকল করতে পারে না। তা করতে যাওয়াও সাধকের পরিচয় নয়। তোমার ভিতর দিয়ে তাঁর লীলা যে ভাবে যে রূপে প্রকাশ করাবেন তোমার সাধনাও তদ্রূপ হবে। তুমি কোন সাধন করছ না। তুমি কর্তা নও। তিনি তাঁর কর্ম তোমার ভিতর দিয়ে করিয়ে নিচ্ছেন। তিনিই কর্তা। তিনি যন্ত্রী, তুমি যন্ত্র মাত্র। এই জ্ঞান দৃঢ় হলে আর কর্মের বন্ধন থাকবে না। সুখদুঃখও বিচলিত করতে পারবে না। অজ্ঞানতার জন্যই দুঃখভোগ। অজ্ঞানতা নেই তো দুঃখও নেই।

৭৩। যা শুনছ তাই শেষ কথা নয়, অনন্ত মতের একটি মাত্র। এ কোন বিরোধী মত নয় বা কোন নূতন পথও নয়, মহাজনগণের স্বীকৃত একটি পথ। যে কোন একটি পথ আঁকড়ে থাকলেই সুফল পাওয়া যায়। সমস্যাটা আঁকড়ে থাকা নিয়ে,মত-পথ নিয়ে নয়।

৭৪। কৃষ্ণ অখিল রসামৃতসিন্ধু। এই অমৃতসিন্ধুর সঙ্গে শ্রদ্ধা-ভক্তিরূপ নালানদী দ্বারা যুক্ত হতে পারলেই অমৃতের স্বাদ মিলবে। শ্রদ্ধাবিহীনেরও অমৃত লাভ হতে পারে, কিন্তু সে অমৃতের স্বাদ পাবে না। অমৃতের ধর্ম হচ্ছে মরণশীলকে অমর করা, নিরানন্দকে আনন্দময় করা এবং অরসিককে রসিক করা। অমৃত-লাভের কৌশলটি হচ্ছে সৎগুরুতে প্রগাঢ় শ্রদ্ধা। সৎগুরুর মাধ্যমে অমৃত লাভ এবং শ্রদ্ধা দ্বারা তা আস্বাদন। শ্রদ্ধাবস্তু রসবস্তুকে আস্বাদন করায়। শ্রদ্ধার গাঢতায় রসের গাঢ়তা বা আস্বাদনচমৎ-কারিতা। রসাস্বাদনের মূলধন শ্রদ্ধা।

৭৫। যোগ বা সম্বন্ধ স্থাপন হয় সমধর্মীদের মধ্যে। চিন্ময় ব্রহ্মের সঙ্গে কেবল আমাদের চিন্ময় সত্তারই যোগ স্থাপন হতে পারে। অর্থাৎ আমাদের চিন্ময়সত্তা বা আত্মা দ্বারাই পরব্রহ্মকে জানা বা আস্বাদন করা যায়। ধ্যান জপ দ্বারা আমাদের চিন্ময় সত্তাকে জাগ্রত বা পরব্রহ্মমুখী করতে হয়। একারণে আত্মাকে জানা ব্রহ্মকে জানার নামান্তর। আগে আত্মজ্ঞান পরে ব্রহ্মজ্ঞান। পূজার সময়ে যে সব অর্ঘ্য দেবতাকে নিবেদন করি তা চিন্ময় জ্ঞান করেই চিন্ময় দেবতাকে নিবেদন করতে হয়। সে কারণেই পূজার প্রসাদে চিন্ময়ের স্বাদ পাই। প্রসাদ গ্রহণে আমাদের সর্ব অমঙ্গল দূর হয়। তাই দেবতা এবং তাঁর প্রসাদ অভিন্ন।

কোন ভজন-কীর্তন গান একান্তভাবে ঈশ্বরে আরোপিত করে গাইলে সেই সঙ্গীত ঈশ্বর-শক্তিতে শক্তিমান হয়ে আমাদের

সূক্ষ্মতম হৃদয়তন্ত্রীতে শুদ্ধ সাত্ত্বিক ভাবের উন্মেষ ঘটায়। তাই এতে আমরা ঈশ্বরের স্পর্শ অনুভব করি। এ গান শুনে পাষাণ-হৃদয়ও বিগলিত হয়। সঙ্গীত তখন চিন্ময়ের সান্নিধ্যে এসে চিন্ময়ধর্মী হয়েছে। এই প্রকার আমাদের সমস্ত ভোগ্যবস্তু এমনকি স্ত্রী পুত্র পরিজন অর্থ যশ মান সব কিছুই যদি ঈশ্বরে নিবেদন করে তাঁর প্রসাদস্বরূপ গ্রহণ করি তবেই তাতে অপার্থিব প্রেমের স্বাদ পাব। বিষয়-বিষ তখন আমাদের কাছে অমৃত-তুল্য মনে হবে। নারী তখন নরকের দ্বার না হয়ে স্বর্গের সিড়ি হতে পারে। বিষয় ভোগ করেও বিষয়াতীতের সন্ধান পাওয়া যেতে পারে। এভাবে সর্ব বিষয়ের ভিতর দিয়ে ঈশ্বরের সহিত যুক্ত হওয়াই সহজ সাধন বা সহজিয়া পথ। সহজিয়া-পথ মুখে বলা সহজ কিন্তু কার্যক্ষেত্রে মোটেই সহজ নয়। কারণ, শ্রদ্ধা ভক্তি নিষ্ঠার উঁচু স্তরে পৌঁছলেই এ পথে চলার সামর্থ্য আসে। গুণাতীতের জন্যই এই বন্ধনমুক্ত সহজ পথ। সাধারণের জন্য নয়। শক্তি অর্জন না করে এ পথে পা বাড়ালে অপমৃত্যু অবধারিত। ঠাকুর চণ্ডীদাসের ভাষায়—'সাধিতে নারিলে নরকে যাবে।'

৭৬। "মহামায়াপ্রভাবেণ সংসারস্থিতিকারিণা"—শ্রীশ্রীচণ্ডীতে স্পষ্টই বলা হয়েছে যে এই বিশ্বসংসার মহামায়ার প্রভাবে পরি-চালিত। তিনিই বিশ্বপ্রসবিনী। তিনি পরমাপ্রকৃতি, পরম ব্রহ্মের পরা প্রকৃতি। ব্রহ্মের সামীপ্যহেতু তিনি ব্রহ্মময়ী। কাউকে জানতে হলেই তার স্বভাব প্রকৃতি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জানতে হয়। পরাপ্রকৃতি হচ্ছে পরব্রহ্মের স্বভাব প্রকৃতি। সুতরাং পরাপ্রকৃতিকে না জানলে পরব্রহ্মকে জানা যাবে না। পরা প্রকৃতির তিনটি স্বভাব বা তিনটি রূপ—(১) যোগমায়া বা মহাসরস্বতী রূপ—তাঁর শুদ্ধ সত্ত্বগুণ। (২) মহামায়া বা মহালক্ষ্মী

রূপ—তাঁর রজ গুণ। এবং (৩) মায়া বা মহাকালীরূপ—তাঁর তম গুণ। মায়াসৃষ্ট এই মায়াময় জগতে থেকে মায়া ত্যাগ করা যায় না। যেমন জলের ভিতর বাস করে জল ত্যাগ করা চলে না। তবে এমন কৌশল করা যায় যাতে জল গায়ে লাগে না, যেমন পদ্মপত্র। গায়ে প্রেমের প্রলেপ মাখলে মায়ার প্রভাব হতে বাঁচা যায়। সাধনগুণে তমঃ হতে সত্ত্বে পৌঁছান যায়। আবার যোগ-মায়ার কৃপায় গুণাতীত হওয়াও যায়। শাস্ত্রে যোগমায়াকে কৃষ্ণের অনুজা বলা হয়েছে। অর্থাৎ কৃষ্ণের পরেই যোগমায়ার স্থান। তিনি অঘটনঘটনপটীয়সী। অসম্ভবকে সম্ভব করতে পারেন। জীবকে পরব্রহ্মের কাছে হাজির করাতে পারেন। তিনিই ভক্তিদেবী। কৃষ্ণভক্তি তিনিই প্রদান করেন। তিনিই নারায়ণী, আবার তিনিই রাধা। কৃষ্ণধন লাভ করা যোগমায়ার কৃপা ভিন্ন কভু সম্ভব নয়।

৭৭। কৃষ্ণপ্রেম লাভ করতে চাইলে আগে কৃষ্ণপ্রেম ধারণের শক্তি অর্জন করতে হয়। কোন বস্তু পেতে গেলে সেই বস্তু লাভের যোগ্যতা অবশ্যই থাকা চাই। উঁচু পদে চাকুরী করতে চাইলে সেই মত যোগ্যতা চাই। যোগ্যতাই শক্তি। এই শক্তি লাভের জন্যই শক্তি পূজা, যোগমায়ার পূজা। আমরা বিভিন্নরূপে শক্তির পূজা করি যেমন, দুর্গা, কালী, লক্ষ্মী, সরস্বতী প্রভৃতি। এঁরা একই শক্তির গুণভেদে বিভিন্ন প্রকাশ। আমাদের বিভিন্ন কামনা পূরণ করতে একই শক্তি বিভিন্ন রূপ ধারণ করেছেন। শ্রদ্ধা ভক্তি প্রেম পার্থিব অপার্থিব যে কোন বস্তুই লাভ করতে যাও, তদনুরূপ শক্তির পূজা বা শক্তির আরাধনা অবশ্যই করতে হবে। যদি বল, ভক্তি লাভ করতে শক্তিপূজার আবশ্যকতা নেই। তবে সে ধারণা ঠিক হবে না। কারণ, ভক্তি নিজেই একটি শক্তি, দৈবীশক্তি। তাই তিনি ভক্তিদেবী। ভক্তি হল সর্বময়ী শক্তির শুদ্ধ সত্ত্ব ভাব। এই শুদ্ধা শক্তিই প্রেমদাত্রী। তম-শক্তিকে জয় করে (ক্ষয় করে নয়)

রজ-শক্তির দরজায় পৌঁছতে হয়। এখানে তমঃ শক্তিকে জয় করা মানে তমোশক্তির আশীর্বাদ লাভ করা। এইরূপ রজ-শক্তির আশীর্বাদে সত্ত্বগুণ লাভ হয়। মধুর রসে যেমন অপর চারটি রস—শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য বর্তমান, তেমনি শুদ্ধ সত্ত্বগুণে অপর গুণসকলও বর্তমান। তবে তারা সবাই সত্ত্বগুণের অধীনতা মেনে নিয়ে সত্ত্বের শক্তি বর্দ্ধিত করে সাধকের ভজনে সাহায্য করে।

৭৮। বিষবৃক্ষে বিষফল জন্মে। সে ফল খাওয়া মানে বিষ খাওয়া, মৃত্যুকে ডেকে আনা। 'বিষয়' শব্দের এক অর্থ 'বিষ হয়'—যে বস্তু বিষ উৎপন্ন করে। সংসার-বিষয় বিষই উৎপন্ন করে। অমৃত উৎপাদন করে না। সংসার-বিষয় ছেড়ে আশ্রম- বিষয়ে যুক্ত হলেও একই অবস্থা। বিষের হাত থেকে রেহাই নেই। বিষয় সর্বদাই ভজনের বিঘ্ন করে—সে সংসার-বিষয়ই হোক বা আশ্রম-বিষয়ই হোক। এক বিষ ছেড়ে অন্য বিষ পান করলে বা কোন প্রকার বিষে ডুবে থাকলে অমৃতের সন্ধান কোন কালেই মিলবে না। বিষ ত্যাগ করেই অমৃতের সন্ধান করতে হবে।

৭৯। যতক্ষণ পর্যন্ত মন কাঁচা থাকে ততক্ষণ ইষ্টে নিষ্ঠা আসে না, সাধ্যবস্তুর সন্ধান মেলে না। এ অবস্থায় বহুবিধ শাস্ত্র পাঠে ভ্রান্তি আসতে পারে। সকল শাস্ত্র যে একই তত্ত্ব বলছেন তা সাধনার প্রথম অবস্থায় ধরা একটু শক্ত। তাই প্রথমতঃ গুরুর আদিষ্ট শাস্ত্র পাঠই কর্তব্য। একটু অগ্রসর হওয়ার পর বিভিন্ন শাস্ত্র পাঠ করলে বুঝা যায় যে সর্বশাস্ত্রের লক্ষ্য এক। শুধু সাধকের স্তর-ভেদে বিভিন্ন পথ দেখান হয়েছে।

আমরা বিভিন্ন সংস্কার রুচি এবং মন নিয়ে সংসারে এসেছি। আমাদের চিন্তাশক্তি বিচারশক্তি এবং গ্রহণশক্তি বিভিন্ন প্রকার। অর্থাৎ আমরা প্রায় প্রত্যেকেই সাধনার বিভিন্ন স্তরে আছি। শাস্ত্ররূপী ভগবান আমাদের সকলের পিপাসা মেটাতে বিভিন্নরূপে

প্রকাশিত আছেন। শাস্ত্রপাঠের সময়ে শাস্ত্রকে সাক্ষাৎ ঈশ্বর জ্ঞান করে তাঁর কৃপা প্রার্থনা করতে হয় যাতে শাস্ত্রের মর্মবাণী পাঠকের হৃদয়ে পরিস্ফুট হয়, স্পষ্ট হয়। কোন কঠিন তত্ত্ব একাগ্র মনে বার বার পাঠ করলে শাস্ত্রকৃপা পাওয়া যায়। গুরুকৃপার মত শাস্ত্রকৃপাও প্রার্থনীয় বস্তু।

৮০। শুধু মত ও পথের পার্থক্য, গন্তব্য স্থান একটিই। যার যেমন মানসিক সামর্থ্য সে তেমন পথে চলবে, বিভিন্ন শাস্ত্রের ইহাই বক্তব্য। শাস্ত্রবাক্যে কোন প্রকার সংশয় বা দ্বিধা উপস্থিত হলে শ্রীগুরুর আশ্রয়ে তথা ইষ্টনামের আশ্রয়ে তা দূর করতে হয়। শাস্ত্রের কাছে প্রার্থনা জানালেও সংশয় ঘুচে যায়। এসব সম্ভব না হলে, পূজ্য গুরুভ্রাতা অথবা গুরুতুল্য কোন মহাত্মার কৃপায়ও সংশয় দূর হয়। সংশয় বা দ্বিধাগ্রস্ত সময়টি সাধকের কাছে সংকটপূর্ণও বটে। দ্বৈধজ্ঞানে ভ্রান্ত পথে চালিত হবার সম্ভাবনাই বেশী। এ কারণেই শ্রীমন্মহাপ্রভু বৈষ্ণবের কাছে ভাগবত পড়ার নির্দেশ দিয়েছেন। ব্রহ্মজ্ঞের কাছেই হরিকথা শুনতে হয়।

৮১। যার ক্ষুধা নেই তার কাছেই যেন খাদ্যের ভিড়। যে সন্ন্যাসী খাদ্যে উদাসীন, লোক যেন তাঁকে খাওয়াতেই ব্যস্ত। তেমনি, তুমিও কিছু চেও না, ভগবান তোমাকে কিছু দেবার জন্য সর্বদা ঘুরঘুর করে তোমার পাশেপাশেই ঘুরবেন।

৮২। প্রাপ্তিতেই আনন্দ। যেমন প্রাপ্তি তেমন আনন্দ। ক্ষণস্থায়ী বা অসৎবস্তু প্রাপ্তিতে ক্ষণিকের জন্য আনন্দ। আর চিরস্থায়ী বা সৎ বস্তু প্রাপ্তিতে সদানন্দ বা অখণ্ড আনন্দ। ক্ষুদ্র বস্তু প্রাপ্তিতে খণ্ড আনন্দ, বৃহৎ বা ভূমা বস্তু প্রাপ্তিতে ভূমানন্দ বা অখণ্ড আনন্দ। একমাত্র গোবিন্দই সৎবস্তু, চিরস্থায়ী বস্তু, বৃহত্তম বা ভূমা বস্তু। তাই গোবিন্দ-প্রাপ্তিতেই পূর্ণতম আনন্দ, ভূমানন্দ।

পূর্ণানন্দ বা ভূমানন্দের আর একটি তত্ত্ব আছে। যেহেতু ব্রহ্ম অসীম অনন্ত সেকারণে এঁকে যতই আস্বাদন করে যতই আনন্দ পাওয়া যায়, সামনে যেন ততই অনাস্বাদিত আনন্দ বাকী থাকে। যত বেশী আস্বাদন করা যাবে তত বেশী আনন্দ সামনে পড়ে আছে দেখা যাবে। আনন্দ-আস্বাদনের আকর্ষণ এতই প্রবল যে, তখন শুধু সামনে অনন্তের পানে ছুটে চলা নব নব আস্বাদনের লোভে। এ থেকে নিবৃত্ত হবার শক্তি জীবের নেই। জীবের প্রতি ব্রহ্মানন্দের এই যে অমোঘ আকর্ষণ ইহাই কৃষ্ণের আকর্ষণশক্তি। আকর্ষণ বা কর্ষণ করে তাই নাম কৃষ্ণ। ভূমানন্দ আকর্ষণ করে তাই ভূমানন্দই কৃষ্ণ।

৮৩। মূর্খের মধ্যে রাজত্ব করার চেয়ে পণ্ডিতের পদসেবায় বহু সুখ। কোন লোকের সেবা যে গ্রহণ করে না, দেবতারা পর্যন্ত তাকে সেবা করে ধন্য হতে চায়।

৮৪। ইষ্টনিষ্ঠা নষ্ট হল তো ভজনের ঘরে শূন্য গেল।

৮৫। সমাজের কাছে সাধু সাজার আগে নিজের কাছে সাধু সাজ। কিছু সাজতে গেলে সাজার জন্যও প্রস্তুত থাকা ভাল।

৮৬। তর্কে জয়ী হওয়ার চেয়ে ভক্তিবিশ্বাস অটুট রেখে হেরে যাওয়াতে অনেক লাভ।

৮৭। শিষ্য যখন প্রার্থনা করে—হে গুরু, আমাকে নির্মল কর, কৃপা কর, তখন গুরুর ভাবনা হয়—শীঘ্রই শিষ্যের পূর্বসঞ্চিত কর্মফলের ভোগ শেষ হোক। যার কর্মফলভোগ তারই। তবে গুরু-বৈষ্ণব-কৃপায় ফলভার অনেকটা লাঘব বা হালকা হতে পারে। এবং বহুজন্ম ধরে যে ফল ভোগ করতে হত, তা এ জন্মেই শেষ হয়ে যেতে পারে। এ সময়ে শিষ্যের বহুতর বাধাবিঘ্ন, রোগব্যাধি পর্যন্ত দেখা

দিতে পারে। গুরুর প্রতি ভক্তি-বিশ্বাসের জোরে শিষ্য ঐ সব কঠিন পরীক্ষায় হেলায় পার হয়ে যায়। গুরুভক্তিই বিঘ্নবিনাশক।

৮৮। ধরেনিলাম প্রত্যক্ষ প্রমাণের অভাবে ঈশ্বরকে মানতে পারছ না। কিন্তু সদা সত্যকথা বলায়, সত্যপথে চলায় অন্তরে যে এক প্রকার শক্তি সঞ্চার হয়, মানষিক বল বৃদ্ধি পায় তা নিশ্চয়ই স্বীকার করতে পার। সেই শক্তিকেই যদি ঈশ্বর বা ভগবান বলে মানতে পার, তবে ভগবান আছেন একথার প্রমাণ পেতে আর বেশী অপেক্ষা করতে হয় না। এক অখণ্ড শক্তি বিশ্বে সর্বত্র পরিব্যাপ্ত আছে। আমাদের খণ্ডদৃষ্টি খণ্ডজ্ঞান, তাই সেই অখণ্ড শক্তিকে খণ্ড খণ্ড ভাবে অনুভব করি, দর্শন করি। এককে বহুরূপে দর্শন করি। যদি অখণ্ডদৃষ্টি দিয়ে দর্শন করতে পারি, তা হলে এই খণ্ড শক্তির ভিতর দিয়েই অখণ্ড শক্তির সন্ধান পেতে পারি। অণুর মধ্যেই বিরাটের ছায়া দেখতে পারি। ক্ষুদ্র শক্তিকে অনুভব করতে করতে ভূমাশক্তির অনুভব হয়। আগে ক্ষুদ্রকেই ঈশ্বর জ্ঞান কর, ক্রমে বিরাট ঈশ্বরের দর্শন পাবে। ক্ষুদ্রও তিনি, বিরাটও তিনি।

৮৯। এক দিন পথে কিছু অর্থ-সম্পদ পড়ে আছে দেখতে পেলে, আর একদিন পথে এক সাধু মহাত্মার সাক্ষাৎ পেলে। এই দুটি দর্শনের মধ্যে তোমার আন্তরিক আকর্ষণ কোনটির প্রতি কেমন হয়, তা ভাল করে লক্ষ করবে। কোনটি বেশী প্রিয় লাগে তা বিচার করবে। মন অর্থলোভী কি পরমার্থলোভী, এ বিচার নিজকেই করতে হয়। নিজের দোষত্রুটি ভুলভ্রান্তি বুঝতে না পারা পর্যন্ত তার সংশোধন হয় না। অনেক সময়ে অপরে দোষ দেখিয়ে দিলেও আমরা তা মানতে চাই না। ফলে আত্ম-শুদ্ধি হয় না। নিজের দোষ ধরাপড়ামাত্র লজ্জাবোধ আসে, আত্ম-গ্লানি আসে। ফলে উহা সংশোধনের জন্য নিজের ভিতরই

একটা তাগিদ অনুভব হয়। তাতেই আত্মশুদ্ধি সহজ হয়, শীঘ্র হয়। আপন মনের এক-একটি অশুদ্ধভাব শোধন করতে করতে ভজনপথে অগ্রসর হবে। একদিনেই পূর্ণশুদ্ধি আসে না। রাতারাতি সাধু হওয়া যায় না।

৯০। মানুষ সংস্কারমুক্ত হতে পারে না। কারণ, সংস্কার দিয়েই দেহ গঠিত। সুতরাং 'সংস্কারমুক্ত' অর্থহীন কথা। মানুষ সাধন বা অভ্যাসযোগ দ্বারা নিম্ন নীচ সংস্কার পরিত্যাগ করে উন্নত ভাব গ্রহণ করে মাত্র। অশুদ্ধভাব পরিত্যাগ করে শুদ্ধভাব গ্রহণ করে। পার্থিব পরিবেশ পরিহার করে অপার্থিব রাজ্যে প্রবেশ করে। ভৌতিক তত্ত্ব ছেড়ে পরমার্থিক তত্ত্ব গ্রহণ করে। অসৎ থেকে সৎ'এ গমন করে। তমসা থেকে জ্যোতির্ময়লোকে পৌঁছে। দেহ থাকা পর্যন্ত সংস্কার আছে। দেহের লয় হলে পর সংস্কার থেকে মুক্ত হবে, কি হবে না, সেটাই প্রশ্ন।

৯১। তখনি কৃপালাভ হবে যখন কৃপা ধারণের যোগ্যতা জন্মিবে এবং কৃপা কি বস্তু তা অনুভব হবে। কৃপার অর্থ হল—করে পাওয়া, কর্ম করে তার ফল পাওয়া। সুতরাং কর্মযোগ ছাড়া কৃপাযোগ আসে না। তাঁর কর্ম করলে তাঁর কৃপা অবশ্যই হবে।

৯২। কেউ কেউ প্রশ্ন করে—ধর্মকর্ম করা কেন? ভগবানকে ডাকা কেন? এসব "কেন"র উত্তর তাদের প্রশ্নের ভিতরেই আছে। অভাব বা অভাববোধ না হলে কেউ ভগবানকে ডাকে না, তাঁর কথা স্মরণও করে না। তাঁকে ডাকার প্রশ্ন মনে জাগলেই বুঝতে হবে—কোন না কোন প্রকার অভাববোধ মনে জেগেছে। সবরকম পার্থিব সুখসম্পদ থাকা সত্ত্বেও যখন মনের অভাব ঘোচে না, তখনই লোক ঈশ্বরের আশ্রয় প্রার্থনা করে একটু সুখের জন্য, একটু আনন্দের জন্য। মানুষ সম্পদলোভী। সম্পদ যেখানে, বিপদও

সেখানে। লোকে সম্পদ চায়, বিপদকে চায় না। কিন্তু সম্পদ এলেই যে তার পিছু পিছু বিপদও লুকিয়ে লুকিয়ে আসে, এ সত্য আগে কেউ মানতে চায় না। সম্পদ দিয়ে সুখের আসর জমাতে না জমাতেই বিপদ ছোবল মারতে শুরু করে। সব রকম শক্তি সহায় সম্পদ দিয়েও যখন বিপদের হাত থেকে রক্ষা পায় না, তখনই বিপত্তারণ মধুসূদনের শরণ গ্রহণ। সংসারে এদের সংখ্যাই বেশী। এ ছাড়া সংসারে আর এক শ্রেণীর লোক আছে, যাদের কাছে পার্থিব বিষয়ের চেয়ে পরমার্থ বিষয় অধিক লোভনীয়। তারা বস্তুর চেয়ে ভগবানে বেশী অনুরক্ত। বিষয়ের অভাবের চেয়ে ভাবের অভাবে বেশী ব্যথিত। জন্মজন্মান্তরের সুকৃতির ফলে আজ তারা বিষয়ে বিতৃষ্ণ, ভগবৎ প্রীতিরসে পুষ্ট। তারা ভগবানের ভজনা করে স্বভাব-বশতঃ, অভাববশতঃ নয়। ভগবৎ রস আস্বাদনই তাদের উপজীব্য। এরাই প্রকৃত জ্ঞানী। বিপদের অপেক্ষা না করেই বিপদভঞ্জনের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে। জ্ঞানীর একটি বিশেষ লক্ষণ হল—তারা দেখেই শেখে, ঠেকায় পড়ে শেখে না।

৯৩। তোমরা প্রত্যেকেই ভগবানকে দেখেছ। শুধু দেখ নাই, তাঁকে আস্বাদনও করেছ। তোমাদের মধ্যে এমন কেউ আছ কি, যে কোন বিপদ-আপদে দুঃখদুর্বিপাকে পড় নি? সুখ যদি ভোগ করে থাক তবে নিশ্চয়ই কোন না কোন শঙ্কটেও পড়েছ! বিঘ্ন-বিপদে পড়লে অবশ্যই ভগবানের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছে। তখন নয়নজলে বুক ভাসিয়ে নিশ্চই ভগবানকে ডেকেছ বিপদ হতে পরিত্রাণ পাবার জন্য এবং চকিতে যেন কোন প্রকারে সেই চরম বিপদ হতে বেঁচে গেলে! ঐ চকিত-ঘটনার স্মৃতিচারণ করলে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের কথা মনে পড়বে। তোমরা ভেবে রেখেছ, মঠে-পটে-দেউলে যে যে রূপে তাঁকে চেন, তেমন একটা রূপ ছাড়া তিনি আসবেন কি করে! কিন্তু ভুলে গেছ

তাঁর অনন্ত রূপের কথা, অনন্ত লীলার কথা। হঠাৎ একটা ভয়ানক ঝড়, তুফান, অগ্নিকাণ্ড, প্লাবন, মহামারী, দুর্ঘটনা ইত্যাদি রূপে এসে তোমাদের সঙ্গে লীলা করে চকিতে অন্তর্হিত হলেন। তোমরা কিছু বুঝতেও পারলে না। তাঁকে দেখেও চিনতে পারলে না। যদি সর্বদা মনন দ্বারা তাঁর সঙ্গে যুক্ত থাকতে পার, তবে আর তিনি এমনি করে তোমাদের ধোঁকা দিতে পারবেন না। একমাত্র ভক্তের কাছেই ভগবান জব্দ।

৯৪। যিনি সর্বদা হরিকথা শুনিয়ে বা গুরুমহিমা কীর্তন করে মনকে ভগবদ্‌মুখী রাখেন তিনিও গুরুতুল্য। যিনি ভজনের সহায়তা করেন তিনি পরম বান্ধব। পরমবস্তু প্রাপ্তিতে যিনিই সহায়তা করেন তিনিই পরম বান্ধব।

৯৫। সাধনার মুখ্য ফল দুটি—আপন ক্ষুদ্রতাবোধ এবং ভগবানে বিরাটত্ববোধ।

(১) আপন ক্ষুদ্রতা-অক্ষমতা বিষয়ে নিশ্চিত হলে জীব যে পরতন্ত্র, এই তত্ত্বে পৌছায়। অর্থাৎ ভগবান ভজনশক্তির অধীন নহে—ভজনলভ্য নহে, এই জ্ঞান লাভ; এবং

(২) ভগবানে বিরাটত্ববোধ। তিনি যে স্বরাট্‌ স্বতন্ত্র তা সম্যক-রূপে অনুভব করা। অর্থাৎ কেবল ভগবৎ কৃপাতেই ভগবানকে লাভ করা যায়, তিনি কৃপালভ্য—এই জ্ঞান লাভ।

এ দুটি জ্ঞান লাভ হলেই ভজন আরম্ভ হয়।

৯৬। ব্রহ্মজ্ঞান লাভের পথে অগ্রসর হতে হলে শ্রীভগবানের একটি প্রধান নির্দেশবাক্য "দ্বন্দ্বাতীতঃ" (গীতা ৪।২২) খুব বিশেষভাবে অনুধাবন করা কর্তব্য। অদ্বয়তত্ত্বে পৌছতে, 'একং সদ্‌'—এক ব্রহ্মে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে মনকে দ্বন্দ্বাতীত স্তরে অর্থাৎ দ্বিভাবের ঊর্ধ্বে স্থাপনা করতেই হবে। দ্বন্দ্ব মানে দুই-দুই

ভাব, দ্বিভাব। ভাল মন্দ, সুখ দুঃখ, শীত গ্রীষ্ম ইত্যাদি প্রকার বিচারযুক্ত ভাব। এই দ্বিত্বভাব যতক্ষণ থাকবে ততক্ষণ ব্রহ্ম-জ্ঞান সুদূরপরাহত। দ্বন্দ্বভাবকে ভেদজ্ঞানও বলা হয়। দ্বন্দ্ব-ভাব বা ভেদজ্ঞান বা বিরোধজনক বুদ্ধির লয় না হলে ব্রহ্ম-জ্ঞানের উদয় হয় না। ভেদজ্ঞানই ব্রহ্মজ্ঞানের প্রধান অন্তরায়। আমরা মানুষে মানুষে, ধর্মে ধর্মে, অবতারে ভগবানে ভেদজ্ঞান করি। এক মন্দিরের বিগ্রহকে দেবতা জ্ঞানে প্রণাম করি, কিন্তু সর্বত্র এ জ্ঞান আনি না। আপন গুরুকে কৃষ্ণ জ্ঞান করি, কিন্তু অপরের গুরুকে সেই জ্ঞানে দেখি না। শুধু মানুষ কেন, সর্বজীব বৃক্ষলতা কীটপতঙ্গ সবই যে ঈশ্বরের এক-একটি রূপ, এ জ্ঞান না হওয়া পর্যন্ত ব্রহ্মজ্ঞান আসবে না। ব্রহ্মজ্ঞান অর্থে সবই সাক্ষাৎ ব্রহ্ম—এই জ্ঞান। ব্রহ্ম ছাড়া দ্বিতীয় কোন বস্তু নেই—এই ভাবই দ্বন্দ্বাতীত অবস্থা। "যাঁহা-যাঁহা নেত্র পড়ে তাঁহা কৃষ্ণ স্ফুরে।"

৯৭। তুমি একদিন কাউকে রক্ষা করলে সাহায্য করলে, তোমার বিপদের দিনেও কেউ না কেউ তোমাকে রক্ষা করবে সাহায্য করবে। একটি ক্ষুদ্র তুচ্ছ বস্তু তুলে রাখলে, এক সময়ে সেই সামান্য বস্তুটি তোমার কোন বিশেষ কাজে আসবে। অর্থাৎ তুমি যাকে রাখবে সেও তোমাকে রাখবে। এতে আরো একটি তত্ত্ব পাবে—এ সংসারে কোন বস্তুই তুচ্ছ নয়, ক্ষুদ্র নয়। সবই চিন্ময়, ব্রহ্মময়। তুমি যদি ধর্মকে রক্ষা কর, ধর্মও তোমাকে রক্ষা করবেন। আবার যদি ধর্মকে অবহেলা কর, তবে ধর্মও তোমাকে অবহেলা করবেন, তোমার প্রতি বিরূপ হবেন। ধর্ম আর ঈশ্বরে প্রভেদ নেই। ধর্মের সেবা করলেই ঈশ্বরের সেবা করা হয়। সামান্য একটি ফুলগাছকে যত্ন না করলে সে আশানুরূপ ফুল দেয় না। তেমনি ধর্ম বা ঈশ্বরের সেবা না করলে বাঞ্ছিত ফল লাভ হয় না।

৯৮। সাম্যেই শান্তি, সমতাই সুখ। সমজ্ঞানেই আনন্দ। দেহে মনে প্রাণে যতই সমতা একতা আনতে পারবে ততই শান্তির অধিকারী হবে। মন-কর্ম-বাক্য যখন এক হবে তখনই ভজনে সিদ্ধিলাভ হবে। যেমন বায়ু-পিত্ত-কফের সমতা থাকলেই শরীর সুস্থ থাকে, তেমনি মন-কর্ম-বাক্যে একতা থাকলেই সত্ত্বে স্থিতি। ঐ তিন জন তিনদিকে টানলে সাধন-ডোর ছিন্ন ভিন্ন। আত্মসংযমের মূলকথা— মন-কর্ম-বাক্য এক করা।

৯৯। অফুরন্ত অর্থ উপার্জনের জন্য যখন লোভ আছে তখন অফুরন্ত জীবন লাভের জন্যও লোভ থাকা উচিত। মৃত্যু কেউই চায় না। কিন্তু অনন্তকাল বেঁচে থাকতে সকলেই কি আশা করে? আবার শুধু চাইলেই তো সব কিছু পাওয়া যায় না! চাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পাওয়ার জন্য কিছু করাও চাই। নইলে চাওয়া চাওয়াই থেকে যাবে, পাওয়া আর হয়ে উঠবে না! পাওয়ার জন্য পরিশ্রম করতেই হয়। কিরূপে পাওয়া যায় তা জানতে হয়। এই জানার জন্য পরিশ্রম করাটাই সাধনা।

কিভাবে অনন্তকাল বেঁচে থাকা যায় তা আমরা ভাবি না। অনন্ত জীবনের সঙ্গে দৈহিক মৃত্যুর সম্পর্ক নেই। দেহ গত হলেও অনন্তকাল বেঁচে থাকা যায়। মৃত্যু ইচ্ছাধীন হলেই অনন্ত জীবন লাভ হয়। মৃত্যু ইচ্ছাধীন হলে তৎপর জন্মও ইচ্ছাধীন হয়। এরূপ স্বাধিকার লাভ হলেই অনন্ত সুখের অধিকারী হওয়া যায়। অনন্ত সুখই অনন্ত সম্পদ। পৃথিবীর সম্পদের সঙ্গে সম্পর্ক শ্মশানঘাট পর্যন্ত। ও ঘাট পার করে এই সম্পদকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়া যায় না। কিন্তু পরমার্থ-সম্পদ বা ভজনসম্পদ মৃত্যুর পরেও সঙ্গে যায়। তবু যা ফেলে যেতে হবে তার জন্যই ষোল-আনা পরিশ্রম করি। আর যা সঙ্গে যাবে তার জন্য দু-চার আনা পরিশ্রম করতেও চাই না। এর চেয়ে নির্বুদ্ধিতা আর কি হতে পারে! তবু আমরা শ্রেষ্ঠ জীব বলে দাবী করি, জ্ঞানের বড়াই করি। মূঢ়তা আর কাকে বলে!

১০০। এ জগৎকে যতই মায়ার-খেলা বল, যতই "ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা" বল, এ জগতে থেকেই পরম সত্যকে লাভ করতে হবে। এখানে বসেই পরমার্থ-সম্পদ সঞ্চয় করতে হবে, যার মূল্যে বৈকুণ্ঠে বাস হবে, যে সম্পদের গুণে সারূপ্য সালোক্য সার্ষ্টি সামীপ্য সাযুজ্য —এর যে কোন একটি মুক্তিলাভ হতে পারে। ব্রহ্ম সত্য, মানে ব্রহ্মের কোন লয় নেই, ক্ষয় নেই, পরিবর্তন নেই, বিকার নেই। জগৎ মিথ্যা, মানে জগতেব পদার্থসমূহকে যে যে রূপে আমরা দেখছি ওগুলো ওদের মিথ্যা রূপ, অস্থায়ী রূপ। ওদের সত্য রূপ স্থায়ী রূপ হচ্ছে ব্রহ্মস্বরূপ। এখন যে রূপে বৃক্ষটিকে দেখছি কিছু-দিন পর ঐ রূপের পরিবর্তন হবে। হয় বড় হবে, না হয় মরে গিয়ে কাঠ হবে। সুতরাং বৃক্ষটি সর্বদাই পরিবর্তনশীল। এভাবে জগতের প্রতি বস্তুই পরিবর্তনশীল। অতএব জগতের এই চেহাবাটা তাব স্থায়ী চেহারা নয়, সৎ চেহারা নয়। এটা জগতের অসৎ বা নশ্বর চেহারা, মিথ্যা চেহারা। এ কারণ জগৎ মিথ্যা। ভজনগুণ-বিচাবে এ জগৎ স্বর্গ হতেও শ্রেষ্ঠ। কারণ, স্বর্গে কোন সাধন-কর্ম নেই এবং তা না থাকার জন্য পুণ্যধন বাড়াবাব কোন সুযোগ নেই। সেখানে সঞ্চিত পুণ্য ক্ষয় হতে থাকে এবং ক্ষয় হয়ে গেলে পুনরায় এই জগতে ফিরে আসতে হয়। কিন্তু এখানে বসেই সাধন-ভজন করে পঞ্চবিধ মুক্তির যে কোন একটি লাভ করে জগতে ফিরে আসার পথ বন্ধ করে দিতে পারি। এ জন্যই স্বর্গ হতে মর্ত্যলোকের মহিমা অধিক। স্বর্গের কি কথা, গোলোক-বৈকুণ্ঠবাসীরাও মর্ত্যের ভজনামৃতরসে লোভ করেন। আচার্যগণ বলেন, গোলোকে পরকীয়া রসমাধুরী অনুপস্থিত, তার জন্য এখানেই আসতে হয়।

১০১। তোমরা গুরুর নিকট, সাধুমহাত্মার নিকট কখন কখন আশীর্বাণী প্রার্থনা কর মঙ্গল লাভের জন্য। কারণ, তোমরা জান সাধুগুরুর বাক্য কভু বৃথা হয় না। সাধুর হৃদয়ে ভগবান সর্বদা

বিরাজ করেন বলে সাধুর বাক্যই ভগবানের বাক্য। একটু চিন্তা করলে দেখতে পাবে, সাধু যাকেতাকেই এরূপ আশীর্বাদ করেন না। যে ভক্তিনিষ্ঠা নিয়ে সাধুর কাছে প্রার্থনা করে, কেবল তাকেই সাধু ঐরূপ কৃপা করেন। তাহলে সাধুর কৃপাধারা প্রবাহিত হয় আমাদের ভক্তি-বিশ্বাসের খাত বেয়ে। অর্থাৎ আমাদের ভক্তি বিশ্বাস না থাকলে সাধুর আশীর্বাদ অচল। সাধু-গুরু-বাক্যের সুফল পেতে হলে সাধু-গুরুতে অচলা ভক্তি রাখতে হয়। এরূপ অচলা ভক্তি রাখতে নিজেকে সত্যে প্রতিষ্ঠিত করতে হয়। সত্যকথা বললে, সত্যপথে চললেই কেবল সত্যস্বরূপ সাধুগুরুতে শুদ্ধা ভক্তি জন্মাবে। যদি অসৎ পথে চল তবে আর সাধুগুরুর আশীর্বাদের সুফল আশা করো না। নিজে অসৎ পথে চলে সৎগুরুর প্রতি দোষারোপ করা মহাপাপ। নিজে অসৎ হলে জগৎটাই অসৎ মনে হবে, তখন সৎগুরুতেও অশ্রদ্ধা আসবে।

১০২। ব্রহ্মজ্ঞান আর শাস্ত্রজ্ঞান এক কথা নয়। শাস্ত্রপাঠে শাস্ত্রবিদ্ বা বেদবিদ্ হওয়া চলে, কিন্তু তা বলে তারা সব সময়েই ব্রহ্মবিদ্ নয়। ব্রহ্মবিদ্ বা ব্রহ্মজ্ঞ হতে হলে অবশ্যই ব্রহ্মের বা ব্রহ্মজ্ঞের শরণাপন্ন হতে হবে। ব্রহ্মের বা ব্রহ্মজ্ঞের কৃপা হলেই কেবল ব্রহ্মজ্ঞ হওয়া যায়। আর ব্রহ্মজ্ঞ হলেই শাস্ত্রজ্ঞান বেদজ্ঞান আপনাআপনি আসে। সাধু-গুরু-বৈষ্ণবগণই ব্রহ্মজ্ঞ মহাজন, ব্রহ্মজ্ঞান দিবার একমাত্র অধিকারী।

১০৩। সাধন-ভজনের শক্তিতে ঈশ্বর লাভ হয় না। তা যদি হবে, তা হলে সর্বশক্তিমান স্বতন্ত্র ঈশ্বরকে ভজনশক্তির অধীনতা স্বীকার করতে হয়। এতে ঈশ্বরের স্বাতন্ত্র্য ক্ষুণ্ণ হয়। ঈশ্বরত্বের হানি হয়। ঈশ্বর লাভ হয় ঈশ্বরের কৃপায়। সাধন-ভজনের গুণে ঈশ্বরের কৃপালাভের যোগ্যতা জন্মে। সাধনভজন ছাড়া চিত্তশুদ্ধি হয় না, শুদ্ধ জ্ঞান লাভ হয় না, হৃদয়ক্ষেত্র প্রস্তুত হয় না। যেমন,

ক্ষেতে বীজ বপন করতে হলে আগে খুব ভাল করে চাষ দিয়ে মাটিকে উত্তমরূপে তৈরী করে নিতে হয়, নইলে বীজের অঙ্কুর শুকিয়ে যায়, বীজ নষ্ট হয়। তেমনি সাধন-ভজনরূপ চাষ-ক্রিয়া দ্বারা চিত্তক্ষেত্রকে উত্তমরূপে প্রস্তুত করে, ভক্তিবীজ বপন করে ঈশ্বরের কাছে কৃপাবারি প্রার্থনা করতে হয়। তিনি কৃপাবারি বর্ষণ করলে তবে ভক্তিবীজ অঙ্কুরিত হতে পাবে, বড হতে পারে। নইলে কোন আশা নেই। ভগবান কাকে কৃপা করবেন, কাকে করবেন না, কখন করবেন, কখন করবেন না, তা একমাত্র তিনিই জানেন। অর্থাৎ এসবই তাঁর ইচ্ছাধীন। তাই তিনি স্বরাট্, নিজেই নিজের কর্তা। তিনি স্বতন্ত্র, অর্থাৎ তিনি অপর কোন শক্তিদ্বারা নিয়ন্ত্রিত নন। অতএব তিনি ভজন-শক্তিরও অধীন নন। দেহমন-প্রাণ তাঁকে সমর্পণ করে আকুল হয়ে প্রার্থনা জানালে তাঁর কৃপা লাভ হতে পারে। তিনি করুণাঘন, করুণাময়। তাঁর করুণার উদ্রেক ঘটাতে আত্মসমর্পণ ছাড়া আমাদের অন্য কোন পথ নেই। আমাদের দেহস্থিত আত্মা তাঁরই অংশবিশেষ। এই অংশ যখন তাঁতে সমর্পিত হয়—অংশ যখন পূর্ণতে অর্পিত হয় তখন করুণা-ঘন করুণাবিগলিত হন। ফলে আমরা তাঁর করুণা বা কৃপা লাভ করি। সাধনভজন দ্বারা যখন আমাদের চিত্ত শুদ্ধ হয় তখন আমাদের আত্মা তাঁর স্বরূপ ধারণ করে, পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। পূর্ণ-তমকে বিগলিত করার শক্তি লাভ করে। তাই আত্মার জাগরণে, আত্মার চেতনায় পরমব্রহ্মে আলোড়ন উদ্বেলন ঘটে। ফলে ব্রহ্মবারি বা কৃপাবারি বর্ষণ, ব্রহ্মানুভূতি।

১০৪। আমরা ব্রহ্মময় হয়েও কেন ব্রহ্মানুভূতি পাচ্ছি না! আনন্দ ধারণ করেও কেন আনন্দের আস্বাদ পাচ্ছি না! অমৃতের পুত্র হয়েও কেন মৃত আছি? এ সবের মূল কারণ অজ্ঞানতা। অজ্ঞা-নতা মানে ব্রহ্মজ্ঞানের অভাব। আমি কে? কেন ত্রিতাপ আমাদের

দহন করে? ব্রহ্মজ্ঞান হলেই এসব প্রশ্নের জবাব জানা যাবে। এই অজ্ঞানতাকে আমরা বহু আখ্যা দেই, যেমন—মায়া, আমিত্ব, অহংকার, সংস্কার ইত্যাদি। আসলে একটি বস্তু, ব্রহ্মকে না জেনেই আমাদের সর্ববিধ অন্ধত্ব। জ্ঞানের বাতি জ্বাললেই সব অন্ধকারের শেষ। ঐ জ্ঞানের বাতি জ্বালাবার জন্যই সাধন-ভজন।

১০৫। শুধু দেহকে নয়, সমস্ত মনসহ দেহকে নিয়ে পথে বের না হলে পার্থিবজ্ঞান পূর্ণ হয় না। সংসার-বন্ধনের ভিতর জ্ঞানের প্রসারতা বাধাপ্রাপ্ত হয়। পার্থিব জ্ঞান পূর্ণ না হলে অপার্থিব জ্ঞান জন্মে না। মুক্ত পরিবেশে মুক্ত-জ্ঞান বা মুক্তির স্বাদ লাভ হয়। উঁচু পরিবেশে উঁচু জ্ঞান লাভ। যেমন, পাহাড়পর্বতে মন উর্ধ্বমুখী হয়। যেরকম পরিবেশে বাস মনের তেমন আশ। পথেই মেলে পাথেয়। প্রকৃতিই প্রধান উপদেষ্টা। দেহ-মন-প্রাণ প্রকৃতির কাছে খুলে ধর, তুলে ধর।

১০৬। ঈশ্বর-অনুভূতি না হওয়া পর্যন্ত পূর্ণতম জ্ঞান লাভ হয় না। ঈশ্বর-অনুভূতি মানে কায়মনপ্রাণে ঈশ্বরকেই মাতা পিতা বন্ধু বা সখা সুহৃদ বলে দৃঢ়ভাবে জানা। তখন আর কোন লোকের উপর বৈরীভাব থাকবে না, আবার কুটুম্বভাবও আসবে না। কেউ আমার ক্ষতি করতে পারে, এ ভয় রবে না। কেউ আমার উপকার করবে, এ আশাও জাগবে না। তখন সব সম্পর্ক, সব লেনদেন ভগবানের সঙ্গে।

১০৭। আত্মপ্রচারে যার সময় আছে, তার প্রবঞ্চনা করারও সময় আছে। অপরকে বঞ্চনা করা আর আত্মবঞ্চনা একই বস্তু। আত্ম-প্রশংসা এবং আত্মপ্রবঞ্চনার একই মূল্য। ফুল কি প্রচারের জন্য কোন চেষ্টা করে!

১০৮। শাস্ত্র বলেছেন, ভোগে তৃপ্তি নেই, পূর্ণতৃপ্তি ত্যাগে। ত্যাগের দ্বারাই পূর্ণতম ভোগ। জগতে সর্বত্রই ঈশ্বরের প্রকাশ।

সব বস্তুই যখন ঈশ্বরময়—ব্রহ্মময়, তখন কি বস্তু ত্যাগ করে কি বস্তু ভোগ করবে ? বস্তুতে বস্তুতে ভেদ কোথায়? সবই তো ব্রহ্ম, সবই এক পদার্থ ! শাস্ত্র, কিন্তু, বস্তু-ত্যাগের নির্দেশ দেন নি। বস্তু-ত্যাগের নির্দেশ দিলে ব্রহ্মত্যাগের নির্দেশ দেওয়া হত। শাস্ত্র কি কখন ব্রহ্মত্যাগের নির্দেশ দিতে পারেন ! শাস্ত্র দিয়েছেন অজ্ঞানতা বা মায়া ত্যাগের নির্দেশ এবং বলেছেন, বস্তুতে ব্রহ্মজ্ঞান করতে। বিষয়ের প্রতি মায়া বা অজ্ঞানতাবশতঃ বিষয়ে আমাদের ব্রহ্মজ্ঞান হয় নি। শাস্ত্র বলেছেন—বিষযে মায়া-বুদ্ধি লৌকিকবুদ্ধি জড়-বুদ্ধি ত্যাগ করে তাকে ব্রহ্মজ্ঞানে ভোগ করতে। তুমি ব্রহ্মে প্রতিষ্ঠিত হলে সকল বস্তু তোমার নিকট ব্রহ্মময়রূপে প্রতিভাত হবে। তখন বিষয় ভোগ কবলেও ব্রহ্মকে ভোগ করা হবে, ব্রহ্মানন্দ আস্বাদন হবে। ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষই ব্রহ্মকে বেশী পরিমাণে ভোগ কবেন, বেশী অমৃত ভোগ করেন, বেশী বিষয় ভোগ করেন। অর্থাৎ তাঁরা বিষয়-ব্রহ্মের অজ্ঞানরূপ বিষ পরিত্যাগ করে জ্ঞানরূপ অমৃত গ্রহণ করেন।

১০৯। সাধুর সম্পদ প্রেম, প্রেমের প্রকাশ পূর্ণানন্দে।
অসাধুর ধান্দা কাম, কামের পরিচয় নিরানন্দে॥

১১০। আচার্য বশিষ্ঠদেব ভগবান শ্রীরামচন্দ্রকে উপদেশ দিচ্ছেন— "মনঃকৃত কৃতং রাম, ন শরীরকৃতং কৃতম্।" মন দ্বারা কর্ম করাকেই কর্ম করা বলে, শুধু দেহ দ্বারা কর্ম করাকে কর্ম করা বলা চলে না। আসলে মনই কর্ম করে। মনই কর্তা। সাময়িক-ভাবেও মনরূপী কর্তার অজ্ঞাতে যদি দেহ কোন কর্ম করে, তার জন্য মনের উপর কোন রেখাপাত হয় না বা মনে কোন প্রকার প্রতি-ক্রিয়াও হয় না। ফলে কর্মবন্ধনরূপ ফল ভোগ করতে হয় না। সাধনা দ্বারা অভ্যাসযোগ দ্বারা বহির্মুখী মনের স্থায়ী লয় সম্ভব। যাদের বহির্মুখী মন চিরতরের জন্য লয় হয়েছে তারাই মুক্ত। এই

মনই বন্ধনের কারণ, আবার মুক্তিরও উপায়। মনের লয় অর্থাৎ মনের বহির্মুখী বৃত্তির লয়। যতক্ষণ মন বহির্মুখী ততক্ষণ বন্ধন; যখনই মন অন্তর্মুখী তখনই মুক্তি।

১১১। যদি অপরের ভালবাসা পেতে চাও, আগে নিজেকে ভাল বাস। যদি অপরের শ্রদ্ধা চাও, আগে নিজেকে—নিজ আত্মাকে শ্রদ্ধা কর। আমরা সকলেই আমাদের নিজ নিজ পরিচয় দেই 'আমি' শব্দ দ্বারা। আমরা ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি, কিন্তু আমাদের পরিচয় এক অভিন্ন শব্দে। সুতরাং আমাদের সকলের মধ্যে একটি অভিন্ন সত্তা বিদ্যমান, যার প্রকাশ 'আমি' শব্দে। এই 'আমি'ই সর্বভূতে সদাবিরাজমান বাসুদেব। 'আমি'র তত্ত্বই বাসুদেব-তত্ত্ব। 'আমি'কে জানলেই ভগবান বাসুদেবকে জানা হয়। এই 'আমি'কে ভাল বাসতে পারলে সকলকেই ভালবাসতে পারবে। একে জানলে সকলকেই জানা যাবে। এই 'আমি' আমাদের দেহ হতে আলাদা বস্তু। ভাবনাদ্বারা 'আমি'কে বিকশিত করতে হয়। প্রেম-ভালবাসাই এই ভজনের মূল মন্ত্র। 'আমি'র সাক্ষাৎই আত্ম-সাক্ষাৎ বা ব্রহ্ম-সাক্ষাৎ। এই 'আমি'র ভালবাসা পেলেই জগতের ভালবাসা পাবে।

১১২। আমরা সকলেই ভগবান ভগবান বলি, কিন্তু ক'জনে তাঁকে জানি! তাঁকে কি ভাবে চিনতে হয় জানতে হয়, প্রথমে তাই শিখতে হয়। এই শিক্ষার পাঠ শুরু হয় 'আমি'কে জানার মধ্য দিয়ে। ঈশ্বর সদা সর্বত্র বিদ্যমান। সুতরাং ঈশ্বর আমার ভিতরেও সর্বদা আছেন। বাইরে ঈশ্বরের সাক্ষাৎ পেতে হলে আগে আমাদের ভিতরের ঈশ্বরের সঙ্গে সাক্ষাৎ দরকার। ভিতরের ঈশ্বরই বাইরের ঈশ্বরের সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটিয়ে দেন। আগে ঘরের লোকের সঙ্গে পরিচিত হও, ভাব জমাও, পরে বাইরের লোকের খবর নিও। আগে নিকটের কথা ভাব, পরে দূরের কথা

ভাববে। আত্মার কৃপা আগে লাভ কর, পরে পরমাত্মার কৃপা প্রার্থনা করবে। মন-গুরুকে আগে স্বীকার কর, পরে বাইরের গুরুমূর্ত্তির শরণাপন্ন হবে। যতক্ষণ এই কাছের জন আপন না হচ্ছে ততক্ষণ বাইরের ভগবানকে ভেবে লাভ নেই। আত্মাকে দিয়ে পরমাত্মাকে ধরা। পোষা হাতী দিয়ে বন্য হাতী ধরা।

১১৩। অর্থের প্রতি লোভ কমাও তবেই পরমার্থের প্রতি লোভ বাড়বে। লোভ না বাড়লে লাভ হবে না। অর্থের প্রতি অন্ধ হলেই পরমার্থের প্রতি দৃষ্টি পড়বে। দৃষ্টিশক্তি একটাই; সেটাকে অর্থের দিকে দিয়ে রাখলে পরমার্থে চোখ পড়তে পারে না। পরমার্থ সঞ্চিত হতে থাকলে অর্থ আপনাআপনি আসতে থাকবে। নারায়ণের কৃপা হলে মা লক্ষ্মীর কৃপার জন্য ভিন্ন করে ভাবতে হয় না। সাধুসন্তগণ শুধু পরমার্থ-ধনেই ধনী নন, তাঁরা পার্থিব ধনেও অযাচক ধনী। পরমার্থ সঞ্চয় করতে পার বা না পার, অর্থ সঞ্চয় করে পরমার্থ আগমনের পথ বন্ধ করে দিও না।

১১৪। ঈশ্বর মঙ্গলময়। অর্থাৎ ঈশ্বরে অমঙ্গল-অশুভ বলে কোন ভাব বা বস্তু নেই। বিশ্বচরাচর ব্রহ্মময় বা ঈশ্বরময়। সুতরাং বিশ্বচরাচরেও অমঙ্গল-অশুভ বলে কোন পদার্থ নেই। তবু আমরা যে অমঙ্গল অশুভ দর্শন করি তা আমাদের দৃষ্টি-ভ্রম মাত্র। এই ভ্রমের কারণ অজ্ঞানতা, ব্রহ্মজ্ঞানের অভাব।

১১৫। যে বাক্য বা যে গ্রন্থ মনকে শাসন করে দমন করে তাই শাস্ত্র পদবাচ্য। মনকে শাসন করা মানে সদাচঞ্চল বহির্মুখী মনের চঞ্চলতা দমন করে অন্তর্মুখী করান। তাই ব্রহ্ম শাস্ত্রগম্য। অর্থাৎ ব্রহ্মকে জানতে হলে, ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করতে হলে তা শাস্ত্রের আনুগত্যেই করতে হবে। শাস্ত্রকে উপেক্ষা করে ব্রহ্মকে জানা যাবে না। বায়ুকে নিয়ন্ত্রণ করা তবু সম্ভব, কিন্তু মনকে নিয়ন্ত্রণ

করা অতীব অসম্ভব কাজ। এহেন মনকে সংযত করার একমাত্র উপায় হচ্ছে শাস্ত্ররূপী ভগবানের শরণ নেওয়া। শাস্ত্রে শ্রদ্ধাভক্তি এলে, শাস্ত্র দেখিয়ে দেন অন্তর্যামী পুরুষকে। অন্তর্যামী পুরুষের কাজ হচ্ছে—অন্তরের অন্দরমহলে লুকিয়ে থেকে অলক্ষ্যে মনকে ক্রমে ক্রমে সংযমন করা, নিয়মন করা, দমন করা। ভগবান গীতায় বলেছেন—আমি ইন্দ্রিয়সকলের মধ্যে মন। সেই মনরূপী ভগবানকে নিয়ন্ত্রণ করার শক্তি-সামর্থ্য জীবের থাকতে পারে কি! একমাত্র অন্তর্যামী ভগবানই মনরূপী ভগবানকে বশে আনতে সক্ষম। প্রতি জীবের অন্তরতম প্রদেশে থেকে অন্তর্যামীরূপে তিনি সকলকেই পরিচালনা করছেন।

১১৬। ভজনপথে আমাদের সমস্যা প্রধানতঃ দুটি তত্ত্ব নিয়ে। তার একটি মন, অপরটি মায়া। এ দুটি তত্ত্ব ঠিক ঠিক ধরতে না পারলেই সব গোলমাল, গোলে পৌঁছান যাবে না। মনকে সংযত না করে, মনের স্বাধীনতা মেনে নিলে ব্রহ্মতত্ত্বে পেঁাছান যাবে না। এবং মায়ার স্বরূপ ধরতে না পারলে ব্রহ্মের স্বরূপও বুঝা যাবে না। ব্রহ্মকে জানতে হয় মায়ার আধারে। মায়া যেন একটি পরিমাপের পাত্র, যার ভিতরে রেখে ব্রহ্মকে অনুভব করতে হয়, আস্বাদন করতে হয়। অসীম সমুদ্রের জলের স্বাদ নিতে হলে একটি পাত্রে তুলে নিতে হয়। তেমনি অনন্ত ব্রহ্মকে জানতে হলে আস্বাদন করতে হলে একটি মায়া-পাত্রের আবশ্যক। অসীম অনন্ত ব্রহ্মকে মায়া-ই আমাদের কাছে সসীম, সুলভ করে দেন। এ কারণেই মায়ার দ্বারস্থ হওয়া অপরিহার্য। যে মায়া আমাদের কাছ থেকে ব্রহ্মকে আড়াল করে বা ঢেকে রেখেছেন, সেই মায়াই প্রসন্না হয়ে নির্গুণ নিরাকার ব্রহ্মকে আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য করে দেন। মায়ার কৃপাতেই ইন্দ্রিয়াতীত বস্তু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হয়। মায়ার কৃপা ভিন্ন ব্রহ্মপ্রাপ্তি নৈবচ নৈবচ।

১১৭। যখন তোমার চোখে আপামর সকলকেই ভক্ত বলে দেখবে, যখন মনে হবে—সকলেই নানাভাবে ভগবানের সেবা করছে, সকলেই ভগবানের অনন্ত লীলারূপায়ণে এক-একজন শিল্পীমাত্র, তখনই বুঝবে তোমার হৃদয়ে ভক্তির সঞ্চার হয়েছে। ভক্তের চোখে সবাই ভক্ত।

এই শুদ্ধাভক্তি সাধু-ভক্ত সঙ্গ ছাড়া, তাঁদের কৃপা ছাড়া কখনই লাভ হয় না। পরশমণি লোহাকে স্পর্শ করলেই যেমন লোহা সোনা হয়ে যায়, তেমনি ভক্তের পরশে অভক্তেরও ভক্তির উদয় হয়। ভক্তি লাভের অন্য উপায় নেই। গুরু একজন কৃষ্ণভক্ত, তাই গুরুকৃপায় কৃষ্ণভক্তি লাভ হয়।

১১৮। মুখেই বলি—ঈশ্বর মঙ্গলময়, মুখেই বলি—ভগবান যা করেন সবই মঙ্গলের জন্য। কিন্তু সব সময়েই অমঙ্গলের ভয়ে মরি। এর কারণ ঈশ্বরের উপর বিশ্বাস নেই ভক্তি নেই। যদি দৃঢ় বিশ্বাস থাকত যে ঈশ্বরই কর্তা এবং যা কিছু হচ্ছে সবই তাঁর ইচ্ছায় হচ্ছে, তবে আমাদের সকল ভয় সকল চিন্তা দূর হয়ে যেত। মনে সর্বদা আনন্দ থাকত। মঙ্গলময় যখন কর্তা তখন তাঁর দ্বারা কোনই অমঙ্গল হতে পারে না। যা কিছু অমঙ্গল দেখছি বা ভাবছি তা আমাদের ভ্রম মাত্র। ভ্রমের কারণ আমাদের অজ্ঞানতা। যতক্ষণ অজ্ঞানতা আছে ততক্ষণই অমঙ্গল। জ্ঞান লাভ হলেই মঙ্গল। জ্ঞানই মঙ্গল।

১১৯। রঙ্গিন চশমা পরলে যেমন সব কিছুই রঙ্গিন দেখায়, তেমনি প্রেমের চশমা চোখে লাগাতেই বিশ্ব প্রেমময় হয়ে ওঠে। তখন দেখবে—এ ভুবন প্রেমেতে তৈরী, প্রেমেতে লালিত, প্রেমেতে মগন। একটিবার খাঁটী প্রেমিকের সঙ্গ কর তাকে স্পর্শ কর, তোমার চোখেও প্রেমের চশমা লেগে যাবে। ভগবৎ কৃপায় তার সন্ধান পাবে। তোমার মনের চাহিদা খাঁটী হলে অবশ্যই খাঁটী লোক পাবে। তখনই বুঝবে—"সবার উপর মানুষ সত্য তাহার উপর নাই"।

১২০। প্রণবের (ওঁএর) স্বরূপটি বুঝতে চেষ্টা কর। ইঁনিই নির্গুণ নিরাকার পরব্রহ্মের ধ্বনিরূপে আদি সাকার রূপ। নিরাকার ক্ষীরোদ সাগর বা ঘনীভূত প্রেমের সাগর একদা তাঁর ইচ্ছায় চঞ্চল হয়ে উঠল, আলোড়িত মথিত হয়ে উঠল। অনন্ত প্রেম মথিত হলে প্রেমের সারস্বরূপ ওঁকার ধ্বনি প্রকটিত হন লীলার জন্য। প্রণব সৃষ্টির আদি বীজ। এই বীজ হতেই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি। প্রণবের স্বরূপ আস্বাদন করে জীব অনন্ত প্রেমের স্বাদ পায়। যেমন করে মাছি মধু পান করতে গিয়ে মধুভাণ্ডে পড়ে নিজেই মধুময় হয়ে যায়, তেমনি প্রেম আস্বাদন করতে গিয়ে জীব নিজেই প্রেমে ডুবে গলে প্রেমময় হয়ে যায়। প্রেমের সঙ্গে একাকার হয়ে যায়।

১২১। দুধের ভিতর মাখন থাকে, কিন্তু তা দেখা যায় না। দুধ মন্থন করলে মাখন দেখা যায়। ভাবসমুদ্র মন্থন করলে প্রেমের দেখা মেলে। করুণানিধান আপন করুণা-পারাবার মন্থন করে নির্গুণ থেকে সগুণে প্রকটিত হলেন ওঁকার রূপে। ওঁ এর আকৃতিতেও মন্থন বা আবর্তনের একটি ব্যঞ্জনা বিদ্যমান। এঁতে সাধন-প্রক্রিয়ার রহস্যের ইঙ্গিত আছে। এঁর শিরস্থিত চন্দ্রবিন্দু (ঁ) সাধন-প্রক্রিয়ার একটি অতীব গুহ্য তত্ত্ব। চন্দ্র শিরেই থাকে, যেমন শিবের শিরে চন্দ্রের অবস্থিতি। এক বিন্দুতেই নিরাকার সাকার প্রাপ্ত হয়। বিন্দুই ভগবৎ তত্ত্ব যা কেবল সাধন দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায়। আগে দেহের চন্দ্রকে জান, পরে বিন্দুরূপী ভগবৎ তত্ত্ব মন্থনেই প্রকটিত হবে। মন্থন-রহস্য বিবিধ শাস্ত্র-পুরাণ বহুভাবে উল্লেখ করেছেন। এর মধ্যে সমুদ্রমন্থন আখ্যানটি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। প্রায় সমস্ত শাস্ত্র-পুরাণেই এই আখ্যানটি আছে। একই তত্ত্ব পুনঃপুনঃ বলার কারণ, পুনঃপুনঃ মন্থন না

করলে অমৃত উৎপন্ন হয় না। এই নিগূঢ় তথ্যটি যাতে জীব ভুলে না যায় তার জন্য সমস্ত শাস্ত্র এটিকে তুলে ধরেছেন। তত্ত্বের গুরুত্বের জন্যই পুনরুক্তি।

অনাদিকাল হতে এই মন্থনক্রিয়া চলছে বহু রস লাগি। গোয়ালা দুগ্ধ মন্থন করে মাখন বিক্রি করছে রসিক ক্রেতাকে। মাতা যশোমতী দধি মন্থন করে মাখন তুলছেন তাঁর গোপালের জন্য। মাতা আদ্যাশক্তি ব্রহ্মদণ্ড দ্বারা ভজনদধি মন্থন করছেন ভক্তের জন্য। সাধক জিহ্বাদণ্ড দ্বারা নাম-সমুদ্রকে মন্থন করছে প্রেম ভক্তি লাগি। নন্দসুত আনন্দ মন্থন করে অমৃত পরিবেশন করছেন গোপ-গোপীকে। মন্থনে রসের সৃষ্টি, মন্থনদণ্ডে রসের স্থিতি, মন্থনভাণ্ডে রসের জয়।

১২২। শিবতত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম না হলে ভজনতত্ত্ব পরিষ্কার হবে না। হরকে না জানলে হরি কি বস্তু তা জানা যায় না। শিব যেমন পরমা প্রকৃতির পদতলে শবের মত অচঞ্চল হয়ে পড়ে আছেন, তেমনি বিশ্বপ্রকৃতির তথা সমাজসংসার-প্রকৃতির শত চাঞ্চল্যেও যদি নিজকে শবের মত সদা অচঞ্চল অনড় রাখতে পার, তবেই হরির সাক্ষাৎ পেতে পার। শিব সর্বদা চন্দ্রকে শিরে ধারণ করে আছেন, কখনই নীচে নামাচ্ছেন না, অর্থাৎ চন্দ্রকে নিম্নগামী হতে দিচ্ছেন না। জীব যদি ঐরূপ হতে পারে, যদি দেহস্থিত চন্দ্রকে সর্বদা শিরে আবদ্ধ রাখতে পারে, উর্ধ্বরেতা হতে পারে তবেই তার দেহে চন্দ্রকান্তি আসবে। আর সেই চন্দ্রালোকে শ্রীহরির চাঁদবদন দর্শন করা যাবে। এ কারণে ভানুনন্দিনীর কৃপা না হলে অর্থাৎ দেহস্থিত পরিপূর্ণতম চন্দ্রের শুদ্ধতম জ্যোতি বিকশিত না হলে কৃষ্ণচন্দ্রের দর্শন হয় না। প্রেম-পূর্ণিমার পূর্ণচাঁদরূপী রাধার শুদ্ধ শুভ্র আলোতে কালাচাঁদের দর্শন। রূপের সাহায্যে অরূপের দর্শন।

১২৩। আমরা প্রায় প্রত্যেকেই প্রত্যহ কোন না কোন দেবদেবীর পূজা করি। কেন করি, কার তুষ্টির জন্য করি, কি লাভের জন্য তা গভীরভাবে চিন্তার বিষয়। পূজার প্রধান উদ্দেশ্য নিজকে জানা। কেবল নিজকে জানলেই সব জানা সম্ভব। সব রকম পূজার আগে নিজকে নিজে পূজা করে আত্মশুদ্ধি করে নিতে হয়। মূল পূজার পূর্বে আমরা যে ভূতশুদ্ধি, আসনশুদ্ধি, দেহশুদ্ধি, করন্যাস, অঙ্গন্যাস প্রভৃতি ক্রিয়ানুষ্ঠান করি তা শুধু নিজের শুদ্ধচৈতন্যকে জাগ্রত করার জন্য। নিজকে জানার জন্য। আপন চৈতন্য জাগ্রত না হলে, নিজকে চৈতন্যময় করতে না পারলে পরাচৈতন্যময় ভগবানের পূজার অধিকার হয় না। কে কার পূজা করছে? অণু-চৈতন্যই বিভু-চৈতন্যের পূজা করছে। চৈতন্যকে পূজা করার শক্তি জড়ের নেই। জড় অর্থে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু চৈতন্যশক্তির পূজা করতে পারে না। তাই পূজার আগে আত্মচৈতন্য জাগ্রত করে নিজকে চৈতন্যময় করে নেবার বিধি। আপন অণুচৈতন্যকেই যদি জাগ্রত করা না যায় তবে বিভুচৈতন্যে অর্থাৎ ভগবানে সাড়া জাগানো যায় না। আত্মচেতনা জাগ্রত করাই পূজার মুখ্য উদ্দেশ্য। একবার আত্মচেতনা জাগ্রত হলে ঐ জাগ্রত অণুচেতনা তার স্বধর্মানুযায়ী বিভুচেতনার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে। অণুর ধর্মই হচ্ছে বিভুর সঙ্গে বিরাটের সঙ্গে মিলিত হওয়া। পূজা বা সাধনার কাজ ঐ অণু-চেতনাকে জাগ্রত করা পর্যন্ত। আমরা ভগবৎ অনুভূতি লাভ করি আমাদের জাগ্রত অণুচেতনার মাধ্যমে। বিশ্বচেতনা অনুভব বা আস্বাদন করায় আমাদের হৃদয়স্থিত অণুচেতনা। চৈতন্য ছাড়া চৈতন্যকে ধরবার সাধ্য নেই।

পূজার অন্তর্নিহিত ভাব হচ্ছে—'পৌছান', স্থূলভাবে বা সূক্ষ্মভাবে পৌছান। প্রথমে বহিরঙ্গ উপাচার দ্বারা পূজায় স্থূলভাবে ভগবৎ বিগ্রহের সমীপে পৌছান। ইহা পূজার প্রথম স্তর। দ্বিতীয় স্তর হচ্ছে—অন্তরঙ্গ উপাচার (ধ্যান-মনন) দ্বারা ভগবৎ তত্ত্বে পৌছান।

১২৪। অনেক ইটপাথর অনেক পরিশ্রম ও অর্থ দিয়ে আশ্রম-মন্দির তৈরী করার আগে মানসিক পরিশ্রম ও মানবীয় সম্পদ দিয়ে মনের মন্দিরটি তৈরী করে নিতে হয়। নইলে আশ্রম পণ্ডশ্রম মাত্র। আশ্রম মানে শ্রমদ্বারা সেবা করা। শুধু শ্রীবিগ্রহের সেবাই নয়, শুধু দেবতার দাস্যতাই নয়, আশ্রমে যারাই থাকবেন এবং আসবেন—এমন কি আশ্রমের তরুলতা জীবজন্তু প্রভৃতি সকলেরই দাস্যতা স্বীকার করে সেবা করলে তবে আশ্রমবিগ্রহের পূর্ণ সেবা করা হয়। আশ্রমের প্রতি জীবজন্তু বৃক্ষলতাকে আশ্রম-দেবতার এক-একটি প্রিয় সেবক মনে করে প্রীতির সঙ্গে তাদের সেবা করলে আশ্রমধর্ম পালন করা হয়। ঈশ্বরের দাস্যতা লাভ করতে হলে আগে তাঁর সৃষ্ট সকল জীবের দাস্যতা স্বীকার করতে হবে। এই সর্বব্যাপী দাস্যভাব পূর্ণ বিকাশ হলে তবে সখ্য প্রেম আসবে। এভাবে সখ্যপ্রেমের পূর্ণতায় বাৎসল্য প্রেমের সঞ্চার হবে। বাৎসল্য প্রেমের পরিপূর্ণতায় মধুররসের অধিকারী হবে। এ কারণে মধুর রস সকল রসের সকল ভাবের ভাণ্ডার। সকল রসের মিশ্রণে মধুব রসের সৃষ্টি। তাই মধুর রস এত মিষ্টি, মধুর রসের এত বৈশিষ্ট্য এত বৈচিত্র্য। আশ্রম প্রতিষ্ঠার মূল লক্ষ্য হওয়া চাই—সেবাধর্ম দ্বারা স্তরে স্তরে পূর্ণতম প্রেমধর্মে বা মধুর রসে উত্তরণ।

১২৫। ভাবছ, বুঝি তোমার দুঃখ অভাব লেগেই আছে তাই বড় কষ্ট! তাই ভজনের সময় পাচ্ছ না, মনও পাচ্ছ না। দিন চলে যাচ্ছে ভজনবিহীন। ঐ দুঃখ অভাব কষ্টকেই কেন ভগবানের এক-একটি রূপ বলে মনে করনা! মনে কর, ঐ রূপেই ভগবান তোমার কাছে এসেছেন। তাঁর দুঃখময় রূপটি স্বীকার করে তাঁর কাছেই তাঁর আনন্দময় রূপের জন্য প্রার্থনা কর। দেখবে, বাঞ্ছাকল্পতরু ভগবান তোমার প্রার্থনা পূরণ করতে আনন্দময়রূপে তোমার সামনে এসে

গেছেন। তিনি কিন্তু তোমার সামনে সামনে সর্বদাই আছেন—হয় সুখের বেশে, নয় তো দুঃখের বেশে। তিনি সুখস্বরূপ, সুখময়। তাই প্রথমে তিনি সুখরূপে দেখা দেন। তখন তাঁকে চিনতে না পারলে দুঃখরূপে হাজির হন। এবারে যতক্ষণ তুমি তাঁকে চিনতে না পারছ ততক্ষণ তিনি তাঁর দুঃখের বেশ ত্যাগ করছেন না। দুঃখের বেশে তোমার সঙ্গে লীলা করতে তাঁরও দুঃখ হয়। কিন্তু উপায় কি! তুমি যে তাঁকে চিনতেই চাইছ না। তোমাকে জোর করে চেনানোর জন্যই এ ব্যবস্থা। তাঁকে চিনতে পারলেই তিনি তাঁর স্বরূপে সচ্চিদানন্দরূপে তোমার সঙ্গে লীলায় মত্ত হবেন। তিনি যে লীলাময়! আনন্দই তাঁর লীলা।

সুখও তিনি, দুঃখও তিনি। সর্বরূপেই তিনি। যে রূপেই তিনি আসুন না কেন, তাঁকে চিনতে শেখ, গ্রহণ করতে শেখ। তাঁকে গ্রহণ করতে শিখলে তাঁর সর্বরূপেই আনন্দ পাবে। আমাদের চরম দুঃখেও যদি তাঁকে না চিনি, তাঁকে না ডাকি তবে আনন্দের দিনে তাঁকে জানব, তাঁকে ডাকব এমন নিশ্চয়তা কোথায়? আজ আমরা দুঃখের কষাঘাতে জর্জরিত হয়েও যখন তাঁর শরণ নিচ্ছি না, তখন বিষয়-মদিরা পানে মত্ত অবস্থায় তাঁকে চিনব কোন্ দিব্য চোখে? তিনি জীবকে সুখ দিয়েও পরীক্ষা করেন আবার দুঃখ দিয়েও পরীক্ষা করেন। সুখের পরীক্ষায় তো প্রায় সকলেই ফেল করে। দুঃখের পরীক্ষায় তবু কিছু সংখ্যক পাশ করে। পাশ করিয়ে নেওয়াটা তাঁর অন্যতম প্রধান কাজ। তাই দুঃখটা এখন 'কমপালসরি' বিষয় হয়ে পড়েছে।

১২৬। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু। 'প্রভু' শব্দের অর্থ হচ্ছে—নিগ্রহানুগ্রহসমর্থ। যাঁর নিগ্রহ বা অনুগ্রহ করার পূর্ণ সামর্থ্য আছে, অর্থাৎ যিনি সর্বশক্তিমান বা সর্বৈশ্বর্যবান তিনিই প্রভু। প্রভু শব্দের ভিতরই মহাশক্তির খবর আছে, তথাপি 'মহা' বিশেষণ পদ যুক্ত হয়েছে

প্রভুর মহত্ত্ব এবং উদারতা প্রকাশ করতে। 'চৈতন্য' শব্দের অর্থ হচ্ছে—জ্ঞান বা চেতনা। 'শ্রীচৈতন্য'র অর্থ হল—যে জ্ঞান দ্বারা 'শ্রী' লাভ করা যায়, বা 'শ্রী' যুক্ত জ্ঞান, ব্রহ্মজ্ঞান। 'শ্রী'র অর্থ হল ঐশ্বর্য বা ত্রিবর্গ (ধর্ম-অর্থ-কাম বা সত্ত্ব-রজঃ-তমঃ, এরকম ত্রি-সত্যাদি)। সুতরাং 'শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু'র মূল অর্থ হল — ব্রহ্মজ্ঞানই সর্বশক্তিমান, সর্বফলদাতা।

১২৭। শাস্ত্র বলেছেন—ভগবানকে বিষয় বস্তু নিবেদন না করে ভোগ করলে চুরি করার অপরাধ হয়। তবেই বুঝ, বিষয়ের কর্তা বা মালিক কে! বিষয়ের কর্তা ভগবান, বিষয়ের ভোক্তাও ভগবান। ভগবানের বস্তু ভগবানকে না দিয়ে, তাঁর অনুমতি না নিয়ে ভোগ করতে গেলে তো চুরি করার অপরাধ হবেই, পাপ হবেই। আর তার জন্য দুঃখরূপ শাস্তি অবশ্যই ভোগ করতে হবে। ভগবানকে কর্তা না ভেবে নিজেকে কর্তা ভাবতে গিয়েই এই বিপদ ডেকে আনা হয়েছে। এর মূল কারণ আমাদের অজ্ঞানতা তথা অহংকার। আমি-আমার এই অহংভাব-ই আমাকে কর্তা সাজবার কুবুদ্ধি দিয়েছে। তাঁর বস্তু তিনিই গ্রহণ করছেন—এই জ্ঞানই হল ভগবানকে বিষয় নিবেদন করা। তা না করে অহং-কর্তা জ্ঞানে বিষয় ভোগ করে যে দুঃখ হয় তাই চৌর্য-অপরাধ। এর ফলে পুনঃপুনঃ জন্ম নিয়ে বিষয়দহনে দগ্ধ হতে হয়। বিষয়চুরির অপরাধে বিষয়বিষদণ্ড।

১২৮। গীতা-উপনিষদের প্রথম শব্দ 'ধর্মক্ষেত্রে'র অন্তর্নিহিত ভাব শুদ্ধরূপে ধরতে পারলে গীতা-বাণীর মর্ম বুঝা সহজ। ধর্মক্ষেত্র কিরূপ? কুরুক্ষেত্ররূপ বা কর্মক্ষেত্ররূপ। ধর্মের রূপ কর্মে। ধর্ম লুকিয়ে আছে কর্মের মধ্যে। কর্মেরই প্রাধান্য। আবার, কি রকম কর্মক্ষেত্র? উত্তর হচ্ছে—ধর্মক্ষেত্র, ধর্মময় কর্মক্ষেত্র। গীতার আঠারটি অধ্যায়ে যত প্রকার যোগ বা সাধনের কথা আছে

তার মূল ভূমি হচ্ছে ধর্মময় কর্মক্ষেত্র। কর্মই ধর্ম, ধর্মই কর্ম। কর্ম ছাড়া কোন ধর্মই হবে না, কোন সাধনাই হবে না।

কর্ম ছাড়া ব্রহ্মজ্ঞানও হবে না। সমস্ত গীতাধর্ম নির্ভর করছে পুণ্য-কর্মের উপর। কর্ম-তত্ত্বটি শুদ্ধভাবে বুঝতে পারলে গীতার যে কোন যোগতত্ত্বের গভীরে পেঁছান যাবে। বড় সুদূরপ্রসারী এই কর্মতত্ত্ব। এই কর্মময় বিশ্বের প্রতিটি তত্ত্বের মূলেই আছে কর্ম-তত্ত্ব। কোন শাস্ত্র এই তত্ত্বের কোন সীমারেখা টানতে পারেন নি। যতই এর আলোচনা করা যায়, যতই এর গভীরে যাওয়া যায় এর যেন শেষ নেই। ফলে শাস্ত্রের ব্যাখ্যা, টীকা-টিপ্পনী কালে কালে বেড়েই চল্‌ছে। গীতায় শ্রীভগবান একটি ছোট্ট কথায়—গহনা কর্মনো গতিঃ—বলে দিলেন কর্মের তত্ত্ব দুর্জ্ঞেয়। আমাদের ভালমন্দ পাপপুণ্য স্বর্গনরক সুখদুঃখ সব কিছু নির্ভর করছে কর্মের উপর। অতএব বহুৎ হুঁশিয়ার !

১২৯। নব বিবাহিত বরবধূর সৌন্দর্য-সুষমা নিশ্চয়ই তোমরা লক্ষ করেছ। কাল যাকে নেহাৎ কুৎসিত দেখেছ আজ তাকে বর বা বধূবেশে সুন্দর দেখাচ্ছে, আকর্ষণীয় মনে হচ্ছে। আবার দুচার দিনের মধ্যেই তাদের ঐ লাবণ্যপ্রভা লুপ্ত হতে থাকে। কেন এরূপ হয়? প্রেমলগ্নে যুবকযুবতীর ভিতর সেই চিরপ্রেমময় জাগ্রত থাকেন। উদ্দেশ্য—এই পার্থিব প্রেম থেকে জীবকে অপার্থিব প্রেমরাজ্যে তুলে নেওয়া। রসভূপ কানুগোরির আবেশাবির্ভাবের জন্যই বরকনের রূপের এত জেল্লা। কিন্তু পার্থিব কামপ্রভাবে তাদের সেই স্বর্গীয় ভাব অধিকক্ষণ স্থায়ী হয় না। ফলে দুচার দিনের মধ্যেই তারা প্রভাহীন হয়ে পড়ে। জীবের ভিতর যে জৈব-কাম তাও ঈশ্বরের দান। এই কাম হতেই প্রেমের জন্ম। কিন্তু সে প্রেম কজনে চায়! কজনার জন্মে! ঠাকুর চণ্ডীদাস বলেছেন—কোটিকে গোটিক হয়। এক কোটির ভিতর একজনার হয়। এই

কোটির অর্থ কোটি-কোটি মনে হয়। সেই স্বর্গীয় প্রেমের স্বাদ-স্বরূপ আমাদের জানা নেই। জানা না থাকলে লোভ জন্মে না। লোভ জন্মেনি বলে লাভও হচ্ছে না। ঐ প্রেমের স্বরূপ জানাবার জন্য ভগবানের শ্রীবৃন্দাবনলীলা এবং তাতে আমাদের লোভ জাগাবার জন্য তাঁর শ্রীনদীয়ালীলা। ঐ প্রেম কি বস্তু তা কেবল স্বয়ং প্রেমই জানাতে সক্ষম। বেদপুরাণও অক্ষম। অপরের কি কথা!

১৩০। ধর্মকে জানা শক্ত। ঈশ্বরকে জানা আরো শক্ত। কিন্তু মৃত্যুকে জানা মোটেই শক্ত নয়। কম হোক বেশী হোক মৃত্যুকে আমরা জানি, দেখি। আমাকেও যে একদিন মৃত্যুর ডাকে তার দরজায় হাজিরা দিতেই হবে, এ ধ্রুবসত্যও ভুলি নি। মৃত্যুর সময়ে কোন বিষয় সম্পদ সঙ্গে যায় না, তা তো প্রত্যহ দেখছি। এই ধ্রুবসত্য নিত্য দেখেশুনেও কতটা তা বুঝতে পেরেছি! কতটা আমরা সাবধান হয়েছি! সত্যই ধর্ম, সত্যই ঈশ্বর—এ কথা জেনেও মৃত্যুরূপ চিরসত্যকে আমরা কতটা ঈশ্বররূপে গ্রহণ করতে পেরেছি! বরং মৃত্যুকে উপেক্ষা করেই চলছি। মৃত্যুর এক নাম ধর্মরাজ বা ধর্মের অধিপতি। চোখের সামনে পেয়েও যখন ধর্মরাজরূপী ঈশ্বরকে স্বীকার করছি না, তখন ভগবানের অন্যসব রূপ, যার কোনদিন কোন পরিচয় পাই নি তা মানবো কোন বুদ্ধিতে! আসলে আমরা ভগবানকে দেখেও দেখতে চাই না। জেনেও না-জানার ভান করি। মৃত্যুর কথা মনে মনে চিন্তা করলেও মনের অন্ধকার দূর হয়, সাত্ত্বিক ভাব ফুটে ওঠে। সে জন্যই শ্মশানের দৃশ্যে ক্ষণিকের তরে হলেও মনে বৈরাগ্যভাব আসে। যার মন কিছুতেই বশ হয় না, সে শ্মশানে গেলে মনের পরিবর্তন আনতে পারে। সাধনার এমন সহজ ক্ষেত্র আর নেই। শ্মশান ধর্মরাজের স্থান। সাধনা দ্বারা শ্মশান-বৈরাগ্যকে স্থায়ী করতে পারলেই আসল বৈরাগ্য লাভ হবে।

১৩১। চিকিৎসক রোগীকে ঔষধদ্বারা অজ্ঞান করে অস্ত্রোপচার করে। তখন রোগীর বেদনাবোধ থাকে না। ঔষধের ঘোর কেটে গেলে জ্ঞান ফিরে আসে। তখন রোগীর বেদনা বোধ হয়। আমরা মায়ামোহের ঔষধ সেবনে অজ্ঞান অবস্থায় আছি। আমাদের এখন ঈশ্বর-অভাববোধ নেই। মায়ামোহের ঘোর কেটে গেলেই ভগবৎ-অভাবরূপ বেদনা জেগে উঠবে। তখনি বেদনানাশক হরিনামের বড়ি গিলতে মন যাবে।

১৩২। ভগবানের নাম-জপে যদি আগ্রহ না জাগে, তাঁর ধ্যানে যদি মন না বসে, তাঁর লীলা-কীর্তনে যদি রুচি না হয়, তাঁর রূপ-দর্শনে যদি লোভ না জন্মে, তাঁর ধাম-দর্শনে যদি মনপ্রাণ না ছুটে, তবে মনে মনে সর্বদা এই চিন্তা কর—ভগবান সর্বদা আমায় দেখছেন, ভগবান সর্বদা আমার সাথে সাথে আছেন। যদি দৃঢ়তার সঙ্গে এই বিশ্বাস রাখতে পার তবে তাই হবে শ্রেষ্ঠ সাধন। তুমি ভগবানকে না দেখলেও তিনি সর্বদা সর্বজীবকে দেখছেন, তোমাকেও দেখছেন। এই ভাবনা করতে করতে মনে তাঁর প্রতি দৃঢ় প্রত্যয় আন, অনুভব আন। সর্বদা তাঁর চিন্তায় তাঁর সঙ্গে যুক্ত হও। বৈরীভাবে যখন কৃষ্ণলাভ হয় তখন এরূপ চিন্তাদ্বারা অবশ্যই কৃষ্ণলাভ হবে। যে কোন উপায় তাঁর সঙ্গে যুক্ত হওয়াই যোগ।

১৩৩। সুখ হচ্ছে সমুদ্রের ভাসমান শেওলা, আর দুঃখ হচ্ছে তার গভীর জলের জীব। সুখ মানুষকে ভাসিয়ে নিয়ে যায় যত্রতত্র ঠিকানাবিহীন। কিন্তু দুঃখ মানুষকে স্থির স্থিতপ্রজ্ঞ করে চালায় নির্দিষ্ট লক্ষ্যে। সুখ আত্মবিস্মৃতি আনে, দুঃখ আনে আত্মসচেতনতা। দুঃখের তীব্রতায় বেহাল মানুষ যেমন পাগল হয়, তেমনি নৈষ্ঠিক ব্যক্তি এ দ্বারা দূরদৃষ্টি লাভ করে দুর্গম পথ পার হয়। কিন্তু সুখ-সাগরে অনেকের তরী লক্ষ্যহারা হয়ে হারিয়ে যায়। দুঃখের

দাহিকাশক্তিতে অন্তরের ময়লা পুড়ে চিত্তশোধন হয়, আর সুখের বিলাস-ব্যসনে ভ্রান্তমতি হলে চিত্তে ময়লা জমতে থাকে। সুখ অন্ধত্বকারক, দুঃখ অন্ধত্বনাশক।

১৩৪। বহু জনম হরিবিমুখ থাকার পর আজ ভজন করতে গিয়ে মনের দিক থেকে, দেহের দিক থেকে, সংসারের দিক থেকে যত রকম বাধাবিপত্তি আসছে, সে সবই আমাদের পূর্ব পূর্ব জন্মের কর্মফল—এক কথায় যাকে আমরা সংস্কার বলি। মন বলে ভজন করি, কিন্তু রিপুগণ আপত্তি করে। রিপুগণের বাধা দেবার সাহস ও শক্তি আমরাই তাদের যুগিয়েছি। এতদিন রিপুর সেবা করে এসেছি। তাদের চাহিদা পূরণ করে তাদের লোভ বাড়িয়ে দিয়েছি। তাদের জোর বাড়িয়ে দিয়েছি। আত্মাকে আত্মকর্তৃত্ব করতে না দিয়ে রিপুকে কর্তা বানিয়েছি। এতদিন কর্তাগিরি করার জন্য রিপুর একটা আধিপত্য জন্মেছে। তাকে হঠাৎ হটাতে গেলে গোলমাল হবে বৈকি! তাই এ কাজ অতি কৌশলে সারতে হয়। গীতায় শ্রীভগবান এই কৌশলের কথাই নানা প্রকার যোগ-তত্ত্বের মাধ্যমে ব্যক্ত করেছেন। যদি আমরা যাবতীয় কর্ম ভগবানের উদ্দেশে বা ভগবানের প্রীতির জন্য করতাম, তবে রিপু-গণের কর্তৃত্ব করা কখনই সম্ভব হত না। খাল কেটে কুমির আনা হয়েছে। একে হটাতে এখন চাই কঠিন সাধনসংগ্রাম।

১৩৫। অপরের ভুল ভাঙ্গতে গিয়ে নিজে ভুল করো না। তার ভুল দাঁড়িয়ে আছে তোমার ভুলের উপর। আগে আপন ভুল ভাঙ্গ। দেখবে, অপরের ভুলও নেই। তুমি তোমার ভুল ভেঙ্গে সত্যে প্রতিষ্ঠিত হও, সত্যময় হও, দেখবে—তোমার চোখে আর কোথাও কোন ভুল নেই। একবার সত্যে প্রতিষ্ঠিত হলে জগৎ সত্যময় দেখবে। মিথ্যা বলে কোন বস্তুই আর থাকবে না।

১৩৬। শ্রীগুরু ভব-সাগর পারের কাণ্ডারী। আবার শাস্ত্র-সমুদ্র পারের কাণ্ডারীও তিনি। আমাদের শাস্ত্র পর্বতপ্রমাণ, আর আমাদের আয়ু বিন্দুপ্রমাণ। তাও আবার পদেপদে বিপদে ভরা। অনন্ত শাস্ত্রে ভগবৎলাভের অসংখ্য পথের সন্ধান আছে। শাস্ত্র-সমুদ্র মন্থন করে আপন-উপযোগী ভজনপথের হদিস পেতেই জীবনসন্ধ্যা ঘনিয়ে আসে, সাধন করার সময় থাকে না। শ্রীগুরু শাস্ত্র-সমুদ্র মন্থন করে শিষ্যকে ভজনপথ বাতলে দেন। শিষ্যকে পথ খুঁজতে শাস্ত্র ঘাটতে হয় না। সমস্ত শাস্ত্র পাঠ করা যেমন অসম্ভব, আবার শাস্ত্র খুঁজে পথ বেছে নিতে বিপথে পড়ার বিপদও আছে। আত্মজ্ঞান না থাকার জন্য সুপথে পড়ার চাইতে বিপথে পড়ার সম্ভাবনাই বেশী। একমাত্র তত্ত্বদর্শী গুরুগণের কৃপায় আমাদের এ বিপদে পড়তে হয় না। কারণ, তাঁরা পথের সন্ধানও জানেন আবার আমার দেহমনের খবরও রাখেন। কোন পথ আমার উপযোগী, তা সঠিকভাবে জানা তাঁদের পক্ষেই সম্ভব। তাই ভজনপথ গুরুগম্য।

১৩৭। দিন চলে যায়। দীনও চলে যায়। দিন চলে গিয়ে রাত্রি আসে। তাকে কোন মতে বাধা দেওয়া চলে না। তেমনি যে দীন হতে পেরেছে—সকল গর্ব, সকল অহংকার, সকল আমিত্ব ভগবৎপদে নিবেদন করে দীন দরিদ্র হতে পেরেছে, সে অনায়াসে ভবসাগর পার হয়ে চলে যায়। তাকে কোন বাধাই আর বাঁধতে পারে না।

১৩৮। অজ্ঞানদ্বারা জ্ঞান ঢাকা থাকে। মহামূল্যবান বস্তু অল্প মূল্যের বস্তুদ্বারা আবৃত থাকে। মূল্যবান বস্তু খোলা থাকলে তার আদর কমে যায়, দাম কমে যায়। লোকের ঔৎসুক্য-আগ্রহ-লোভ হ্রাস পায়। ফলে পরম উপকারী পদার্থও অনাদর অবহেলার বস্তু হয়ে পড়ে। তাতে লোকেরই ক্ষতি হয়। পরম সম্পদ চরম

অবহেলায় হারায়। কাঁচের টুকরা সিন্দুকে থাকলে লোকের তা দেখতে লোভ হয়। কিন্তু মণিরত্ন খোলা পড়ে থাকলে লোকের তাতে নজর পড়ে না। যাতে চরম অবহেলারূপ বিভ্রান্তি জীবের না জন্মে, তার জন্যই করুণাময় ঈশ্বর করুণা করে পরমার্থকে গুপ্ত রেখেছেন, গোপনে ঢেকে রেখেছেন, যেন জীবের তা পেতে লোভ জন্মে। বস্তুতে লোভ না জন্মালে তা লাভ হয় না। লাভের মূলে লোভ। সহজলভ্য জিনিষের মূল্যবোধ হয় না। মহামূল্য পদার্থের মর্যাদা রক্ষার জন্যই ঢাকনার ব্যবস্থা।

জ্ঞান চিন্ময়বস্তু হয়েও কিভাবে অজ্ঞান বা মায়া দ্বারা আবৃত থাকে, তা একটি রহস্য। এ রহস্যের মূলে আছে জীবের প্রতি ঈশ্বরের করুণা। ঐ কারুণ্যগুণেই ব্রহ্মময় জ্ঞান মায়ারূপ অজ্ঞানতার আবরণ স্বীকার করেন। অজ্ঞানের জন্ম জ্ঞান হতে। মায়ার জন্মও ব্রহ্ম হতে। অজ্ঞান অথবা মায়াকে আমরা দেখতে পাচ্ছি বুঝতে পাচ্ছি জ্ঞানের-ই আলোকে। অর্থাৎ অজ্ঞান ভেসে আছে জ্ঞানের উপরে। এই অজ্ঞানের মাধ্যমেই আমরা জ্ঞানে পৌঁছি, যেমন মায়ার মাধ্যমে ব্রহ্মে পৌঁছি। পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণ মায়াময় নরের আচরণ করেন বলেই, মায়ায় দেহধারণ করেন বলেই আমরা তাঁকে জানতে পারি বুঝতে পারি। মায়াতীত তত্ত্ব করুণাবশতঃ মায়াময় হন জীবকে কৃপা করতে। বাল গোপাল অজ্ঞান শিশুর মত মাটি ভক্ষণ করেছিলেন বলেই মা যশোদা তাঁর মুখবিবরে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড দর্শন করার সুযোগ পেয়েছিলেন। ব্রহ্মের অজ্ঞান-আচরণ হেতু জীবের ব্রহ্মজ্ঞান লাভ।

১৩৯। পুকুরের জলেই কচুরিপানা জন্মে, আবার সেই কচুরিপানাই জলকে ঢেকে দেয়। তখন আর জল দেখা যায় না, শুধুই পানা। একটু চেষ্টা-কষ্ট করে পানা সরালেই জলের দেখা মেলে। আমাদের চিত্তদর্পণের ময়লা বা অজ্ঞানতাও কচুরিপানার মত।

ভ্রমরূপ অজ্ঞানতার জন্ম আমাদের চিত্তে। আবার চিৎবস্তু ঢাকা পড়ে যায় ঐ অজ্ঞানতায়। একটু চেষ্টা-সাধনা করলেই অজ্ঞানতারূপ ময়লা দূর হয়। তখন নির্মল চিত্তদর্পণে ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব দর্শন।

১৪০। পূর্ণঘটে পূর্ণতমের পূজা।

পূর্ণঘট অর্থাৎ জলপূর্ণ ঘট ছাড়া পূর্ণতমের বা ব্রহ্মের পূজা হয় না। ঘটে যদি ছিদ্র থাকে তবে ঘট জলে পূর্ণ রাখা যায় না। তাই নিচ্ছিদ্র ঘটই পূর্ণঘটের উপযোগী। ঘট দেহের প্রতীক। দেহঘট আর পূর্ণঘটের একই তত্ত্ব। দেহঘটে যদি কোন ছিদ্র বা ত্রুটি থাকে তবে পূজার উপকরণ—বিবেক বৈরাগ্য, জ্ঞান-ভক্তি প্রেম ইত্যাদি পূর্ণভাবে দেহে থাকবে না। ফলে সে দেহদ্বারা পূর্ণতমের পূজা বা সাধনা সম্ভবে না। যৌবন কালই জীবনের একমাত্র সময় যখন দেহের সমস্ত পদার্থ সমস্ত যন্ত্র পূর্ণশক্তিতে ভরপুর থাকে। তখনই সাধনা শুরু করতে হয়। যৌবনই পূর্ণঘট।

১৪১। কর্মে জ্ঞান লাভ। জ্ঞানে ভক্তি লাভ। ভক্তিতে প্রেম লাভ। কিন্তু সব কর্মেই শুদ্ধজ্ঞান লাভ হয় না। ভগবানের উদ্দেশে যে কর্ম করা হয় কেবল তাতেই শুদ্ধজ্ঞান লাভ হয়। কর্ম শুদ্ধ না হলে চিত্তশুদ্ধি হয় না। ভগবানে সমর্পিত কর্মই শুদ্ধ কর্ম। শাস্ত্র-অনুমোদিত কর্মই ভগবানে সমর্পিত কর্ম।

১৪২। গীতায় ভগবানকে "পুরুষঃ পুরাণঃ" বলা হয়েছে। পুরুষ মানে যিনি দেহপুরে শয়ান আছেন। অনন্ত দেহে অনন্তকাল ধরে অনন্ত কামনাবাসনারূপী অনন্তনাগের উপর তিনি অনন্তশয়নে আছেন। অন্তরের সহস্র কামনাগুলি অনন্তনাগের সহস্র ফণা। এই কামনা-গুলিই সাপের ন্যায় আমাদের ক্রূর হিংস্রক করে। দেহপুরীতে নারায়ণ ঐ অনন্ত কামনার উপরে শুয়ে আছেন। কামনা বাসনার ঊর্ধ্বে তাঁর অবস্থিতি। তাঁকে জাগরিত করাই আমাদের

সাধনা। অনন্তনাগকে নির্বিষ করতে না পারলে—নিষ্কাম হতে না পারলে নারায়ণকে জাগাতে তাঁর কাছেই যাওয়া যাবে না। দেহতত্ত্বের ভাষায় বলে কুলকুণ্ডলিনীকে জাগান। এই শক্তি না জাগলে ইষ্ট দর্শন হয় না—কি অন্তরে কি বাইরে। অনাদি অনন্ত-কাল ধরে তিনি জীবের দেহপুরে শুয়ে আছেন তাই তিনি পুরাণ।

১৪৩। ধর্ম খুঁজতে হয় না। ধর্ম আমাদের ভিতরের বস্তু। মনকে যে ধারণ করে আছে সে-ই ধর্ম। তবে যে মন নিয়ে আমরা সর্বদা চলি সেই লাগামহীন মন নয়। এই মনের ভিতরে—গভীরে সদ্-অসদ্ বিচারযুক্ত একটি বিশুদ্ধ মন আছে যাকে বিবেক বলা হয়। সেই বিশুদ্ধ মনকে যে ধরে আছে তাকেই ধর্ম বলা হয়। বাহ্য-ব্যভিচারী মনের ভিতর ডুব দিয়ে বিবেকের কাছে পৌঁছতে হয়। বিবেকের ধর্ম হচ্ছে ভাল-মন্দ বিচার করে সৎপথে চালিত করা। ইহাই ধর্ম। বিবেকের সদসৎ বিচারের সূক্ষ্মতম নির্দেশটি গ্রহণ করে চলতে পারলেই ধর্মের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। আত্মার সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। ধর্মই আত্মা। আত্মতত্ত্বই ধর্মতত্ত্ব।

১৪৪। ভগবানকে সর্বদা পেয়েই আছ—এইভাব লও। এই বিশ্বাস দৃঢ় হতে দৃঢ়তর কর। তিনি তোমার ভিতরে বাইরে সর্বত্র ব্যাপীয়া আছেন। তাঁকে নিয়ে সর্বদা আনন্দ কর। তাঁকে আস্বাদন কর। তাঁর লীলা কীর্তন কর। তবেই তাঁকে পূর্ণরূপে পাবে। সবই তোমার আছে, কিন্তু ঈশ্বর যে তোমার কাছেই আছেন—কেবল এ জ্ঞান এই অনুভূতি তোমার নেই। তোমার ভিতরে তিনি হাসেন তাই তুমি হাস। তিনি বলেন তাই তুমি বল। তিনি চলেন তাই তুমি চল। এই জ্ঞান না থাকার জন্যই তুমি দুঃখী। এই জ্ঞান হলেই তুমি সুখী। এই জ্ঞানের অভাবেই তুমি বদ্ধজীব। এই জ্ঞান হলেই তুমি মুক্ত। জ্ঞানাগ্নি তোমার সব সংস্কার সব অকর্ম বিকর্ম পুড়িয়ে দিয়ে তোমাকে শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত করে দেবে।

১৪৫। সাধুসঙ্গে একটি গল্প শুনা যায়।
এক ভিখারী পথে যা কিছু পেত সবই কুড়িয়ে নিয়ে আসত। এভাবে তার আস্তানায় অনেক নুড়ি পাথর ইট কাঠ জমা হল। কিন্তু তার দারিদ্র্য ঘোচে না। একদিন এক সাধু ভিক্ষার ছলে তার ডেরাতে এলেন। ভিখারী বলল—কতগুলি নুড়ি-পাথর ইট-কাঠ ছাড়া তার কাছে ভিক্ষা দেবার মত কিছুই নেই। সাধু তখন ঐগুলিই দেখতে চাইলেন। ভিখারী তাঁকে এনে সব দেখাল। সাধু সব দেখে তার ভিতর থেকে একটি পাথর তুলে বলেন, এটি পরশপাথর, এর ছোঁয়াতে লোহা সোনা হয়। এমন অমূল্য বস্তু থাকতে কে তোমায় ভিখারী বলে? এই বলে সাধু এক খণ্ড লোহার সঙ্গে পরশপাথরটি ছুঁইয়ে দিয়ে সোনা করে দিলেন। ভিখারী তা দেখেই আনন্দে নেচে উঠে বল্‌ল—তা হলে আমার মত ধনী আজ আর কেউ নাই! আমাদের অবস্থাও তাই। জ্ঞানরূপ পরশপাথর আমাদের ভিতরেই আছে। শুধু তার সন্ধান জানিনে বলেই আমাদের সর্ববিধ দুঃখ দারিদ্র্য। একবার সেই ব্রহ্মস্বরূপ জ্ঞানের সন্ধান পেলে পলকে দুঃখসাগর পালটে গিয়ে সুখসাগরে পরিণত হবে।

১৪৬। প্রেমের ভজন রসের ভজন সকলের জন্য নয়। যারা বৈধীভজনে সিদ্ধিলাভ করেছে অর্থাৎ বৈধীভজন শেষ করেছে, কেবল তারাই রাগানুগা ভজনের অধিকারী। প্রেমের ভজনে কোন বস্তু প্রাপ্তির অবকাশ বা লালস নেই। যে পূর্ণকাম হয়েছে, চাহিদা যার শেষ হয়েছে, সে রস-মন্দিরের দোরগোড়ায় পৌঁছেছে। এখন রসের বা রসকর্তার কৃপা হলেই সে রসমন্দিরে প্রবেশ করতে পারে। সাধন-শক্তিতে এ দরজা পার হওয়া যায় না। এখানেই সাধনের শেষ। কেবল রাসেশ্বরীর কৃপাতেই এ রস লাভ হয়। রসক্ষেত্র বৃন্দাবনে 'দেহি দেহি' ভাব নেই, আছে 'লেহি লেহি'

ভাব। বৈধীমার্গে 'দেহি' ভাব, রসমার্গে 'লেহি' ভাব। বৈধীভাব হল—হে প্রভু, আমায় ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ দাও। রাগানুগা-ভাব—হে প্রাণকান্ত, আমার যথাসর্বস্ব তোমায় নিবেদন করছি, তুমি গ্রহণ কর।

১৪৭। পেঁয়াজের খোসা ছাড়াতে ছাড়াতে যেমন কিছুই আর অবশিষ্ট থাকে না, তেমনি মনের সংস্কার একটি-একটি করে ত্যাগ করেই মনকে সংস্কারশূন্য করতে হয়, সংস্কারমুক্ত হতে হয়। তবে মনের একটা বিশেষ ধর্ম হল—মানসক্ষেত্র কখনও শূন্য থাকে না। যখন একটু একটু করে সংস্কার দূর হতে থাকে তখন সেই শূন্যস্থান ভক্তিদেবী ক্রমে ক্রমে দখল করতে থাকেন। সব সংস্কার দূর হলে মনটি ভক্তিদেবীর পূর্ণদখলে আসে। অর্থাৎ হৃদয় তখন ভক্তিপূর্ণ হয়। সংস্কার মনের ময়লা, মনকে ভারী করে, মনকে জড়বৎ করে দেয়। সংস্কারমুক্ত হবার সঙ্গে সঙ্গে মন হাল্‌কা হতে থাকে। সূক্ষ্ম হতে থাকে। মনের শক্তি বাড়তে থাকে। অর্থাৎ মন ঊর্ধ্বগতি লাভ করতে থাকে। ফলে মনে শুদ্ধানন্দের সঞ্চার হয়। মন যতই সূক্ষ্ম হতে সূক্ষ্মতর হতে থাকে, তার শক্তি ততই বাড়তে থাকে। সূক্ষ্মতম মনের শক্তি অসীম অনন্ত। এই সময়ে নূতন নূতন অনুভূতি লাভ হতে থাকে। নানা প্রকার বিভূতি আসতে থাকে। ঐসব বিভূতি দ্বারা পথভ্রষ্ট হবার সম্ভাবনা থাকে। যার যুগলপদে স্থির লক্ষ্য, যে দৃঢ়নিশ্চয় কেবল সেই ব্যক্তি সকল প্রকার প্রলোভন ত্যাগ করে প্রেমধন লাভ করে।

১৪৮। আকাশের শেষ নেই। ঊর্ধ্বগমনের শেষ নেই। ভজনেরও শেষ নেই। ঈশ্বর অনন্ত। সাধনাও অনন্ত। যে যত দূর অগ্রসর হয়েছে সে তত বেশী অনুভূতি পেয়েছে, তত বেশী আনন্দময় হয়েছে। এর শেষ কেউ পায় না। হরি-লীলা হরি-কথার শেষ নেই। শেষ থাকলে ভূমানন্দ থাকে না। ঐ আনন্দ-তত্ত্বের

উপরে নারায়ণের অধিষ্ঠান। নারায়ণের পদসেবা করছেন লক্ষ্মী। অর্থাৎ ঐশ্বর্য নারায়ণের পদতলে। ষড়ৈশ্বর্য-তত্ত্বের উপরে প্রেমতত্ত্ব। যাবতীয় ঐশ্বর্যকে পায় দলে প্রেমতত্ত্বে পৌছতে হয়। 'ঐশ্বর্যজ্ঞানে নাহি মিলে ব্রজেন্দ্র নন্দন।'

১৪৯। স্বর্গের তিলোত্তমা রূপে শ্রেষ্ঠা। তোমাদের গুণে তিলোত্তমা হতে হবে। এক তিল এক তিল করে উত্তম গুণ সংগ্রহ করে তোমরা গুণে তিলোত্তমা হবে। সদ্‌গুণ কোথাও ঝুড়ি ঝুড়ি দেখা যায় না, পাওয়াও যায় না। এ জিনিষ তিল তিল করে সংগ্রহ করেই আপন গুণভাণ্ডার, জ্ঞানভাণ্ডার পূর্ণ করতে হয়। যেখানে যার কাছে যতটুকু ভাল দেখবে তক্ষুনি তা মনেপ্রাণে গ্রহণ করবে। কোনটি ভাল কোনটি মন্দ তা তোমার বিবেক বলে দেবে। ভালমন্দ বিচার করা একান্ত প্রয়োজন। বিচার করতে গেলেই ভালর দিকে মন যাবে। শাস্ত্রই হলেন বিচারের মানদণ্ড।

১৫০। আলস্য অজ্ঞানতা তামসিকতা ষডরিপু প্রভৃতি এক-একটি মহাশক্তিধর অসুরবিশেষ। এর একটিই সাধনপথে মহাবিঘ্ন সৃষ্টি করতে পারে। একটু চিন্তা করলে দেখা যাবে, এরকম একাধিক অসুর আমাদের ভিতর অবাধে রাজত্ব করছে। এদের দমন করার শক্তি আমাদের নেই। এরাও মহাশক্তির সন্তান। তাঁর শক্তিতেই এরা শক্তিমান। সুতরাং এদের দমন করতে, এদের হাত থেকে নিস্তার পেতে মহাশক্তির কৃপা ছাড়া অন্য পথ নেই। মহাশক্তি যদি কৃপাকরে এদের ভিতর থেকে তাঁর শক্তি প্রত্যাহার করে নেন, তবেই এরা নিস্তেজ হবে দমিত হবে। তবেই এদের জয় করা সম্ভব হবে। শক্তিসাধনার আবশ্যকতা এখানেই। এই রিপুগণ সকলে মিলে আমাদের ভিতর এক দুর্ভেদ্য দুর্গ তৈরী করে আমাদের শুদ্ধ জ্ঞানকে বিবেককে বন্দী করেছে। মহাশক্তি রিপুদের বিনাশ করে দুর্গ ধ্বংস করে শুদ্ধ জ্ঞানকে উদ্ধার করেন। তাই তাঁর এক নাম দুর্গা। অসংখ্য রিপু দমনের জন্যই তাঁর দশভূজা-দশপ্রহরণধারিণীরূপ।

১৫১। 'নীতি' অর্থাৎ নীত হয়। তাঁর নিকটে নীত হয়। ভগবদ্-সমীপে নীত হয়। যে ভাব বা তত্ত্ব জীবকে ঈশ্বরের নিকট পৌঁছে দেয় তাই নীতি। আর যে ভাব ভগবৎচিন্তা হতে জীবকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যায় তাই দুর্নীতি।

১৫২। ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ এই চার প্রকার সাধনীয় বিষয়ের মধ্যে অর্থ ও কাম এই জগতের সুখের জন্য এবং ধর্ম ও মোক্ষ পরকালের জন্য। প্রথমে হরিচিন্তা আরম্ভ হয় জাগতিক অভাব ও কামনা পূরণের জন্য প্রার্থনা দিয়ে। সাংসারিক অভাববোধ আমাদের মনে হরিচিন্তা জাগায়। কিন্তু অর্থ ও কামে যখন মনের আশ মেটে না, পূর্ণ শান্তি আসে না তখনই ধর্ম ও মোক্ষের চিন্তা আসে। কামনা পূরণার্থ হরিভজন আরম্ভ হলেও হরির নাম রূপ লীলা ধামের এমনি শক্তি এবং মাহাত্ম্য যে ক্রমে ক্রমে মনকে উর্ধ্বগামী করে। লোহা পরশপাথর ছুঁলে যেমন সোনা হয়ে যায়, তেমনি হরিচিন্তারূপ পরশপাথরের স্পর্শে আমাদের মনের ময়লারূপ লোহা শুদ্ধ জ্ঞানরূপ সোনা হয়ে ফুটে উঠতে থাকে। তখন অর্থ ও কাম থেকে মন সরে এসে ধর্ম ও মোক্ষ চিন্তায় ডুবে যেতে থাকে। করুণাসাগর ভগবানকে ডাকলে তাঁর চিন্তা করলে তিনি আমাদের পার্থিব অসৎ বস্তু না দিয়ে ধর্ম ও মোক্ষরূপ সৎ বস্তু দেন। ইহাই ভগবৎ কৃপা। কবির কথায়—তুমি দাও তারে প্রেম-অমৃত যে চাহে তৃষিত বারি।

১৫৩। মহতের ভান করাও ভাল। নকল সাধু সাজতে সাজতে কখন কখন চৈতন্য উদয় হয়ে পড়ে। সেই ব্যাধের গল্প মনে কর। ব্যাধ পাখী-শিকার করতে গিয়ে দেখল, সব পাখী তাকে দেখেই পালিয়ে যায়। সে একটু দূরে দেখতে পেল, এক ধ্যানস্থ সাধুর গায়ে মাথায় আসেপাশে বহু পাখী নির্ভয়ে চড়ে বেড়াচ্ছে।

ব্যাধ ভাবল, এত হাঙ্গামা করেও যখন পাখী ধরতে পারছি না তখন ঐ সাধুর মত সাধুসেজে বসে থাকলেই তো অনেক পাখী হাতের কাছে পাওয়া যাবে। এই ভেবে সাধুর বেশ ধরে ব্যাধ বসে গেল। কিন্তু পাখী আসে না। পাখী আসবে কেন? সাধু থাকে সমাধিতে নিশ্চল অবস্থায়, আর ব্যাধ নড়েচড়ে দেখে কখন পাখী আসবে, কি করে সে ধরবে। কিছুতেই যখন ওর কাছে পাখী আসে না, তখন সে মনে মনে ভাবল, নিশ্চয় সাধু কিছু মন্ত্রতন্ত্র জানে পাখী আনবার। এই ভেবে সে সাধুকে একদিন সব কথা খুলে বলল। সাধু বললেন, ভগবানের নাম করে যাও তবেই পাখী তোমার কাছে আসবে। এ কথা শুনে ব্যাধ বসে বসে ভগবানের নাম জপতে লাগল। কিছু দিন পর ভগবৎ নামের গুণে ব্যাধের মনে পরিবর্তন দেখা দিল। ভগবানের নামে লোভ বাড়ার সঙ্গে একটু একটু তন্ময়ভাব আসতে লাগল এবং পাখীরাও কাছে আসতে লাগল। তখন সে ভাবল—সাধু যখন পাখী ধরতে পেরেও ধরছে না তখন নিশ্চয়ই তিনি অন্য কোন বড় জিনিষ ধরবার মতলবে আছেন ! তবে আমিও পাখী না ধরে তাই ধরব। এভাবে ব্যাধেরও একদিন সদ্‌মতি হল এবং সাধুর মত ধ্যান-সমাধি লাভ করল।

সত্য বস্তুর সবই সত্য। তার ছলনাও সত্য। সত্যবস্তুর ছলনা করতে করতে একদিন না একদিন আসল সত্য ধরাপড়বেই। ইহাই ঈশ্বরের নির্বিচার করুণা।

১৫৪। বিচার-জ্ঞান থাকা ভাল, কিন্তু সাধুর বিচার করতে নেই। অর্থাৎ কোন সাধুবেশধারীকে কপট বিবেচনা করতে নেই। কে জানে কোন বেশ ধরে কখন কোন দেবতা আসেন ! নিজে প্রতারিত হয়েও সকলের প্রতি শ্রদ্ধাভক্তি পোষণ করাই লাভের হেতু। তাতে আর কিছু না হোক শ্রদ্ধাভক্তি বেড়ে যাবে। মহাসম্পদ

লাভ হবে। লোকের কাছে ঠকতে লোকসান নেই, পরলোকে ঠকলেই মহাপরাজয়।

১৫৫। মনে যখন শ্রদ্ধাভক্তি থাকে না, বা কমে যায় তখন মনের সেই শূন্যস্থান পূরণ করে পরনিন্দা-পরচর্চারূপ অশ্রদ্ধা অভক্তি প্রভৃতি অগুণগুলি। কারণ, মন কখনও খালি থাকে না। মনে পাপ বা দোষ আছে—এই জ্ঞান হলেই তা দূর করার জন্য চেষ্টা আসবে। সেই চেষ্টাই সাধনা। পাপের ভয় থেকেই পুণ্যের লোভ আসে। সেই লোভ হতেই ঈশ্বর-লাভ। যেমন, পিপাসা না পেলে কেউ জল চায় না তেমনি ঈশ্বর-অভাববোধ না হলে ঈশ্বরকেও কেউ চায় না। পিপাসা যার যত বেশী, জলপানে তৃপ্তি তার তত বেশী। ঈশ্বরে লোভ যার যত তীব্র, ঈশ্বরলাভ তার তত শীঘ্র। তীব্রতায় শীঘ্রতা।

১৫৬। ভগবান পতিতপাবন, পতিতের বন্ধু। একবার নিজেকে পতিত ভেবে আর্ত হয়ে ডাকলেই তিনি পরম বন্ধুর মত এসে দাঁড়াবেন। আমাদের মনের অবস্থা এমনই যে পতিত হয়েও তা ভগবানের কাছে স্বীকার করতে চাই না। ফলে আর্ত হয়ে তাঁকে ডাকতেও পারি না। পতিত হয়েও আত্মাভিমান এবং কপটতার জন্য পরম বন্ধুকে পাচ্ছি না। ইহা বড়ই দুর্দৈব! তিনি পতিতের কত বড় পরম বান্ধব তার অসংখ্য প্রমাণ শাস্ত্রে দেখা যাবে। দস্যু রত্নাকর এমনি পতিত ছিল যে মুখে রাম নামটি পর্যন্ত উচ্চারণ করতে পারত না। মরা মরা জপেই রাম কৃপা পেয়েছিল। আমরা 'রাম' উচ্চারণ করতে পেরেও তা নিচ্ছি না। হেন পরম বান্ধবকে আমরা ভুলে আছি মিথ্যা আত্মাভিমানে।

১৫৭। একমনে একপ্রাণে দিনান্তে একবার কৃষ্ণনাম নিলেই তাঁর কৃপা পাওয়া যায়। 'একবার কৃষ্ণনামে যত পাপ হরে, জীবের সাধ্য

নেই তত পাপ করে'। গজ-গ্রাহ যুদ্ধে গজ জলে ডুবে যাচ্ছিল। মৃত্যু সম্মুখে জেনে গজ শুঁড় দিয়ে একটি পদ্ম তুলে ভগবানকে শেষ অর্ঘ্য নিবেদন করতে গিয়ে বলতে যাচ্ছিল—হে নারায়ণ, গ্রহণ কর! কিন্তু 'না' উচ্চারণ করতে না করতেই নারায়ণ এসে চক্রদ্বারা গ্রাহের মাথা কেটে গজকে মুক্ত করলেন। চাই একাগ্রতা, চাই আত্মসমর্পণ। একাগ্রতা না থাকলে হাজার বছর ধরে ডাকলেও তাঁর সাড়া মিলবে না। বাইরের উপকরণ বাইরের ভড়ং ছেড়ে মনকে এক বিন্দুতে আন। এক মুহূর্তেই ফল পাবে।

১৫৮। কাম-ক্রোধ-লোভাদি যদি ছাড়তে নাই পার তবে তারা থাক, তার সঙ্গে মুখে কৃষ্ণনামও থাক্। এ ভাবে চলতে চলতে একদিন কৃষ্ণনামই ওদের হটিয়ে দেবে তোমার ভজনপথ থেকে। তুমি নামের কাছে আত্মসমর্পণ কর। যেই নাম সেই হরি—এ বিশ্বাস দৃঢ় কর। দেখবে, শীঘ্রই হরি তোমার সকল ময়লা হরণ করেছেন। তোমাকে নির্মল করে দিয়েছেন। নামের অসীম শক্তি তখন নিজের ভিতরেই দেখতে পাবে।

১৫৯। বিশ্বচরাচর কৃষ্ণময়। কৃষ্ণ ছাড়া দ্বিতীয় সত্তা নেই। যা কিছু ভাবছি তাও কৃষ্ণময়। আমরা সকলেই কৃষ্ণ-ভজন করছি, যা কিছু করছি তা দ্বারাই কৃষ্ণপূজা হচ্ছে। কেউ এসব সজ্ঞানে করছি, কেউ বা অজ্ঞানে করছি। যারা সজ্ঞানে করছি তারা ঈশ্বর-ভজনার আনন্দ পাচ্ছি বা ঈশ্বর-প্রেম অনুভব করছি। কিন্তু সেই একই কাজ যখন অজ্ঞানে করছি তখন ভজনানন্দ পাচ্ছি না। পাচ্ছি তার বিপরীত ফল। পাচ্ছি হাজার দুঃখ, সর্বদা কষ্ট। অথচ হাজার কষ্ট স্বীকার করেও সেই কাজই করে যাচ্ছি, করতে বাধ্য হচ্ছি। শত ইচ্ছা থাকলেও এই দুঃখকষ্টের হাত থেকে পরিত্রাণ পাই না। কেন এটা হয়? কে আমাকে এরূপ করতে বাধ্য করছে? এ সব চিন্তা করলে উত্তর নিজের ভিতরেই পাওয়া

যাবে। বাইরের হাজার উপদেশেও তেমন কাজ হবে না, যদি না ভিতর থেকে উত্তর মেলে, ভিতরের দরজা যদি না খোলে! সাধু যে কাজ করছেন মহা আনন্দে, আমি সেই কাজই করছি মহা দুঃখে, চোখের জলে। একবার শুধু দৃষ্টিভঙ্গিটা পরিবর্তন কর, একবারটি ভাব—এ সবই ঈশ্বরের কাজ, আমি তাঁর দাস, সেবক মাত্র। দেখবে—দুঃখের পালা শেষ হয়ে সুখের জোয়ার বইছে। জীবন মধুময় হয়েছে। রাজা কংস সর্বদা কৃষ্ণচিন্তা করেও ভয়ে ভীত ছিল, আর তার অমাত্য অক্রূর কৃষ্ণ-চিন্তায় প্রেমানন্দে ভাসত। উলটো ভাবের জন্য একই কাজের ভিন্ন ফল। ভাবনা অনুসারেই ফললাভ।

১৬০। তোমার যে চিন্তা যে ভাবনা যে বিচার তার উপরেও একটা ভাবনা-বিচারের স্তর আছে, একথা মনে রাখবে। তুমি যা ভাব সেটাই শেষ কথা নয়। মনকে পাঠশালার ছাত্র করে রাখবে। তবেই সৎ ভাব ভিতরে প্রবেশ করবে, উচ্চ স্তরের সন্ধান পাবে। এভাবে মনকে উন্নত হতে উন্নততর স্তরে নিয়ে যাবে। মন একটা অহংকারের গণ্ডির ভিতর বাস করে। বিবেকদ্বারা সেই গণ্ডি ভেঙ্গে দিয়ে মনকে মুক্ত করে দিলেই সে ঊর্ধ্বগতি লাভ করে। মুক্ত মন আপন শক্তিতে শুদ্ধ স্তরে পৌঁছে যাবে।

১৬১। যেমন সূর্য স্বপ্রকাশ তেমনি জ্ঞানও স্বপ্রকাশ। সূর্যকে দেখতে বা দেখাতে অন্য আলোর আবশ্যক হয় না। জ্ঞানকে প্রকাশের জন্যও অন্য জ্ঞানের আবশ্যক হয় না। অন্য জ্ঞান বা উপদেশ যা আমরা দেখি তার আবশ্যকতা শুধু চিত্তশুদ্ধির জন্য। চিত্তশুদ্ধি হলে জ্ঞান আপনাআপনি প্রকাশিত হয়, যেমন মেঘ কেটে গেলেই সূর্যকে দেখা যায়। আমাদের অজ্ঞানতার জন্য জ্ঞানের এই চিরপ্রকাশ অবস্থা দেখতে পাইনা, অনুভব করতে পারি না। এই অজ্ঞানতা আর কিছু নয়—আমাদের ভিতর যে

চিরপ্রকাশমান জ্ঞান আছে তা না জানা। এ বড়ই কৌতুকের কথা—আমার জ্ঞান আছে, অথচ আমি তা জানি না। আমার ধন আছে, আমি তা জানি না। এ যেন না-জানার একটা ভান। আমি এবং আমার জ্ঞানের মধ্যে একটি মায়ার পর্দা টেনে দেওয়া আছে। এই মায়ার পর্দাকে কোন তুলনা দিয়ে বুঝান মুস্কিল। এ এক অতুলনীয়া মায়া। মায়ার উপমাও মায়াময়। যেমন—মায়াও তিনি, জ্ঞানও তিনি আর আমিও তিনি। তিনি লীলার জন্য আনন্দের জন্য জ্ঞানরূপে ভিতরে আছেন, জীবরূপে বাইরে আছেন। তার মাঝখানে মায়াপর্দারূপে থেকে নিজের সঙ্গে নিজেই লুকোচুরি খেলছেন অনাদিকাল থেকে। এই পর্দার কৌশলে জীব নিজের স্বরূপ বুঝতে পারছে না। ফলে পর্দার কেরামতিও ধরতে পারছে না, পর্দার পিছনে জ্ঞানের সন্ধানও পাচ্ছে না। নিজের স্বরূপ জানতে হলে জ্ঞানের আলো চাই। কিন্তু পর্দা না সরা পর্যন্ত জ্ঞানের আলো মিলছে না। এ হল মায়া-পর্দার জাদুবিদ্যা।

সমস্ত জীবের মধ্যে চলছে এই মায়ার খেলা। ঈশ্বর তত্ত্বতঃ এবং স্বরূপতঃ সর্ব পদার্থ হয়েও এই মায়া-পর্দার সাহায্যে নিজেকে সমস্ত বস্তুজগৎ থেকে আলাদা করে রেখেছেন। এজন্য মায়া তাঁর লীলা-সহায়কারিণী। এই মায়াপর্দা তুলবার শক্তি জীবের নেই। পর্দা হটাবার জন্য মায়ার নিকটই প্রার্থনা জানাতে হবে। মায় নিজে হটে না গেলে, কেউ তাকে হটাতে পারে না। তাই জ্ঞানরূপী ঈশ্বরের সঙ্গে যুক্ত করে দেবার জন্য মায়াকে যোগমায়ারূপে আরাধনা করা। একবার মায়া-পর্দা সরে দাঁড়ালে জীব জ্ঞানের আলোতে দেখতে পায়—সেও যে বস্তু, ঈশ্বরও সেই বস্তু। তখন জীব শিব হয়ে যায়। সে-ই আমি, অমিই সেই, এরূপ জ্ঞান হয়। অদ্বয়তত্ত্ব লাভ হয়। সকল দুঃখ বেদনা বিরহের অবসানে আনন্দের কণা আনন্দ-সাগরে মিলিত হয়।

১৬২। একমাত্র একনিষ্ঠ সেবায় নিজকে ভুলে যাওয়া যায়, অহংভাবের নাশ হয়। অহংভাবের লয় না হওয়া পর্যন্ত নিষ্কামভাব আসবে না। এই সেবা তখনি শুদ্ধ সেবা যখন প্রতি জীবকে শিব-জ্ঞানে, কৃষ্ণজ্ঞানে সেবা করা হয়। যখনি কোন প্রাণীর সেবা করছি, সেই মূর্তিতে ভগবানের সেবা করছি—এই ভাব না নিলে সেই সেবা ঈশ্বরের কাছে পৌঁছায় না। আর ঈশ্বরে কর্ম নিবেদিত না হলে সে কর্মের কর্মফলরূপ বীজ নষ্ট হয় না। অর্থাৎ সে কর্ম নিষ্কাম কর্ম হয় না। নিষ্কাম সেবাই ঈশ্বরের সেবা।

১৬৩। ব্রাহ্মণের অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞানীর ভিক্ষাবৃত্তি চিরগৌরবের। তিনি গৃহস্বামীর নিকট করেন অন্নভিক্ষা এবং জগৎস্বামীর নিকট করেন ব্রহ্মজ্ঞান ভিক্ষা। ভিক্ষালব্ধ বস্তুতে অহংভাব বা রাজসিক-তামসিক ভাব থাকে না। একারণে ভিক্ষা একটি শুদ্ধ বৃত্তি যা সত্ত্ব গুণকে ফুটিয়ে তোলে। উপনয়নের সময়ে ব্রহ্মচারীকে যে দণ্ডী-ভিক্ষুর বেশে দেখি তার মূল উদ্দেশ্যও তাই। চার বর্ণের ভিতর ব্রাহ্মণকে শ্রেষ্ঠ বলা হয়েছে কারণ, তার অন্যতম কাজ হচ্ছে অপর তিন বর্ণকে ভগবৎমুখী করান। এই কাজের জন্যই ব্রাহ্মণ ভগবানের প্রতিভূ। আলোর ধর্ম হচ্ছে অন্ধকারস্থানকে আলোকিত করা। ব্রহ্মজ্ঞানীর ধর্মও হচ্ছে অপরের অজ্ঞান-অন্ধকার দূর করা। এই ব্রাহ্মণের পূজাই ভগবানের পূজা।

১৬৪। আমরা সকলেই একটি অভিন্ন "আমি" শব্দ ব্যবহার করে এক অভিন্ন তত্ত্বের পরিচয় প্রকাশ করছি। বস্তু বা তত্ত্ব এক এবং অভিন্ন বলেই তার পরিচয়সূচক শব্দও এক এবং অভিন্ন। এই অভিন্ন তত্ত্বটি-ই হচ্ছে অদ্বয় তত্ত্ব। অদ্বয় অর্থে দ্বিতীয়রহিত, দ্বিতীয়শূন্য। তত্ত্বের অর্থ হচ্ছে সংবাদ। অদ্বয়তত্ত্ব আমাদের যে সংবাদটি দিচ্ছে সে বিষয়ে আর দ্বিতীয় কোন প্রকার সংবাদ নেই। অদ্বয়তত্ত্ব মানে কেবল একটি-ই তত্ত্ব, একটিই সংবাদ।

সে সংবাদটি হল—বিশ্বের সবই এক বস্তু। শুধু আমরা মানুষেরাই যে 'আমি' বলছি তা নয়। যদি জীবজন্তু পশুপাখীর ভাষা বুঝতে পারতাম তা হলে শুনতে পেতাম তারাও 'আমি' বলে নিজের পরিচয় দিচ্ছে। এভাবে প্রতি বস্তুই 'আমি' বলে আপন পরিচয় দিচ্ছে। জগৎময় 'আমি'। এ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে 'আমি' ছাড়া দ্বিতীয় কোন পরিচয় নেই। 'আমি' ছাড়া দ্বিতীয় কোন সত্তা নেই, বস্তু নেই। বিরাট 'আমি' প্রতি জীবের ভিতর দিয়ে 'অণু আমি' রূপে আপন পরিচয় দিয়ে চলছেন, আর বলতে চাইছেন- আমি সর্ব বস্তুতেই হাজির আছি, সর্ব বস্তুই আমি। যে কোন বস্তু থেকেই আমাকে পাওয়া যায়। ইহাই অদ্বয়তত্ত্বের মূল কথা এবং আমরা সকলেই মূল গানের মূল সুর 'আমি' গেয়ে বেড়াই।

১৬৫। বিদ্যার অর্থ—'বি' মানে বিশেষ বস্তু বা ব্রহ্ম; 'দ্যা' মানে দেয়, দান করে। যা ব্রহ্মবস্তু দান করে অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞান দান করে তাই বিদ্যা। শুধু শাস্ত্রপাঠেই ব্রহ্মজ্ঞান হয় না। তৎসঙ্গে গুরুবৈষ্ণব ভগবানের সেবা চাই। শাস্ত্রসেবা, গুরু-বৈষ্ণব-ভগবানের সেবা শুদ্ধভাবে নিষ্কামভাবে করতে গেলেই সর্বজীবের সেবা এসে পড়ে। এই শুদ্ধ সেবারূপ বিদ্যা দ্বারাই ব্রহ্মকে জানা যায়। সেবা-বিদ্যাই শ্রেষ্ঠ বিদ্যা। পঞ্চরসের ভজনেও সেবাবিদ্যা। মধুর রসের ভজনে তো গোপিনীরা সেবাবিদ্যার ষোলকলায়ই পারদর্শিনী ছিলেন।

১৬৬। বড়কর্তার সঙ্গে সহজে সাক্ষাৎ করতে চাইলে তার একান্তপার্ষদের সঙ্গে আগে ভাব জমাতে হয়। তার মন পেলে তার সাহায্যে বড়কর্তার কাছে পৌঁছান খুবই সহজ। তেমনি ভগবৎকৃপা সহজে পেতে হলে আগে ভগবানের প্রিয়ভক্তের অনুগত হতে হয়। ভক্ত ভগবানের অতি কাছের জন। তার কাছে ভগবানের দরজা সর্বদাই খোলা। ভগবানের অন্দরমহলের খবর একমাত্র ভক্তই রাখে। কি উপায়দ্বারা ভগবানের প্রীতি

উৎপাদন করা যায় তাও তার জানা। তার কাছেই ভগবৎ প্রাপ্তির সহজ উপায় জানা যায়। এ জন্যই ভগবৎ ভজনে আগে ভক্তের দাস হতে হয়। ভক্তের কৃপা পেলে ভগবৎ কৃপা সুলভ হয়। ভক্তকে ভগবানের অদেয় কিছুই নেই। ভক্তের জন্য ভগবান নিজ প্রতিজ্ঞা পর্যন্ত ভঙ্গ করেন। ভগবান কারো অপরাধ ক্ষমা করেন না। কিন্তু ভক্ত কারো মহা অপরাধও ক্ষমা করলে ভগবান সেই মহাপাতকীকেও কৃপা করতে কোন প্রকার বাছবিচার করেন না। ইহাই ভগবানের ভক্তবৎসলতা, ভক্তাধীনতা। ভগবান তাঁর ভক্তকে কতখানি স্নেহ করেন তা শাস্ত্রপুরাণও পরিমাপ করতে পারেন নি। এ প্রেম এ ভালবাসা এতই গভীর যে ভক্তের গৌরব বাড়াতে মান বাড়াতে ভগবান স্বেচ্ছায় ছোট হন ভক্তের কাছে। ভক্তের কাছে ছোট হয়ে যেন ভগবান অধিক আনন্দ পান, তৃপ্তি পান। অনন্দ-ঘনকেও আনন্দ দিতে পারে তাঁর প্রিয় ভক্ত। ভক্ত সুখস্বরূপেরও সুখদায়ী। তাই ভক্তের স্থান এত উচ্চে। এ বড়ই দুর্লভ স্থান। বড়ই লোভনীয় স্থান। ভক্তের ইচ্ছাই ভগবানের ইচ্ছা। ভক্তের তৃপ্তিই ভগবানের তৃপ্তি। আসলে ভগবানের তো কোন সুখ বা তৃপ্তির অভাব নেই। তিনি পূর্ণকাম। ভক্তি-তত্ত্বের তথা ভক্তের মহিমা বাড়াবার জন্যই ভগবানের এই লীলা। ভগবৎকৃপা লাভের জন্য যত তত্ত্ব যত মতপথ আছে তার মধ্যে ভক্তি-তত্ত্বই যে ভগবানের প্রিয়তম তত্ত্ব তাই তিনি প্রকাশ করছেন ভক্তাধীন হয়ে। বেদ পুরাণ শাস্ত্রাদি এই তত্ত্বকে পুনঃপুনঃ আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন বহু উপাখ্যান আচার অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বহু ভাবে। কৃষ্ণ রাধার অনুগত, শিব পার্বতীর অনুগত, নারায়ণ লক্ষ্মীর অনুগত। এসব তত্ত্বের মূল বক্তব্য হচ্ছে ভগবান ভক্তির বশ। রাধা পার্বতী লক্ষ্মী হচ্ছেন ভক্তির প্রতিমূর্তি, ভক্তির এক-একটি বিগ্রহ।

১৬৭। কিছু পেতে হলে আগে কিছু দিতে হয়। কিছু না ছাড়লে

কিছু পাওয়া যায় না। বড় কিছু পেতে হলে বড় কিছু ছাড়তে হয়। কিছু না দিয়ে, কিছু ত্যাগ না করে কেউ কিছু পায় নি। তোমার কিছু চাহিদা থাকলে, কিছু পাবার আকাঙ্ক্ষা থাকলে আগে চিন্তা কর— তুমি কি করেছ, কি দিয়েছ, কি ত্যাগ করেছ সেই কাম্যবস্তু লাভের জন্য। প্রশ্ন করতে পার—ভগবান তো পূর্ণকাম, তিনি কি আবার কিছু চান? উত্তরে বলা যায়—হা, তিনিও চান। তুমি সেই বস্তু পাবার উপযুক্ত কি না, পেলে তুমি তা রক্ষা করতে পারবে কি না, তার মর্যাদা দিতে পারবে কি না—এসব অবশ্যই দেখতে চান ভগবান। দাতাকে অবশ্যই দেখতে হয়—দান সৎপাত্রে পড়ে কিনা। নইলে যে দাতার অপাত্রে দান করার দোষ লাগবে। ভগবানের কাছ থেকে কৃপাদান গ্রহণ করাব পূর্বে তোমাকে অবশ্যই সে দানের যোগ্য হতে হবে। তা হতে গেলে তোমাকে লজ্জা ঘৃণা ভয় মান অভিমান কাম ক্রোধ অহংকার প্রভৃতি অনেক বস্তুই ত্যাগ করতে হবে। আগে তুমি আমিত্বের মুঠি খোল, তারপর ভগবান তাঁর কৃপার ঝুলি খুলবেন। আগে তুমি এক পা ভগবানের দিকে হাট, দেখবে—ভগবান তোমার দিকে তিন পা চলে এসেছেন। কিছু ত্যাগ কর, নিশ্চয়ই কিছু পাবে। ত্যাগ করাও একটি কর্ম। কর্ম করলেই কৃপা পাবে।

১৬৮। ভগবান শুধু অন্তর্যামী নন, তিনি অতি সূক্ষ্ম বিচারকও বটে। অথবা বলা যায়, তিনি একখানা পরিষ্কার আয়নার মত। তুমি যেমনটি আচরণ করবে আয়নার ভিতরও তেমনটি দেখতে পাবে। তুমি সত্ত্বগুণের পোষাক পরলে আয়নার ভিতরও সত্ত্বগুণ দেখতে পাবে। সুতরাং কি রূপে কি ভাবে কি বেশে ভগবান দর্শন দিবেন তা নির্ভর করছে তোমার ভাবনার উপর। তুমি যেমনটি চাইবে তেমনটি পাবে। তোমার চাওয়াতে যদি ভুল থাকে তবে প্রাপ্তিতেও সেই গোলমাল থাকবে। চিত্তশুদ্ধি না হলে, আত্মজ্ঞান না হলে, চাওয়া কখনই শুদ্ধ হয় না, খাঁটি হয় না। ফলে ভজনপথে অগ্রসর

হওয়া যায় না। এজন্য কিছুই চাইতে নাই। শুধু তাঁর লীলা কীর্তন কর। তাঁর রূপ ধ্যান কর। তাঁকে প্রাণ থেকেও প্রিয়তম বলে গ্রহণ কর। "ভাল যদি বেসে থাক মুখে বলো না, যত পার দিতে থাক ফিরে চেও না।" শুদ্ধ প্রেমে কোন চাহিদা নেই বলে ভগবানের ভাবনাও বেশী। কি দিয়ে এমন নিষ্কাম ভক্তের মনে আনন্দ দেবেন, তা ভেবে না পেয়ে ভগবান আপনাকেই ভক্তের কাছে বিকিয়ে দিয়ে ভক্তাধীন হয়ে বসে থাকেন। না চাইতে সব পাওয়া।

১৬৯। প্রেমের অঙ্কুর গজায় তিনি উপায়ে—নাম শ্রবণে বা বা কীর্তনে (নামামৃত পানে), গুণ শ্রবণে বা কীর্তনে (লীলামৃত পানে) আর রূপদর্শনে—বিগ্রহরূপ, প্রত্যক্ষরূপ বা চিত্রপট দর্শনে (রূপামৃত পানে)। গজানো কথাটা ঠিক হল না, প্রেম জেগে ওঠে বলাই ঠিক। কারণ, প্রেম আমাদের ভিতর সর্বদাই গজিয়ে আছে, উন্মিষিত হয়ে আছে। তবে তার লক্ষ্য পড়ে আছে সংসারের উপর। সংসার থেকে তা তুলে নিয়ে, অনিত্য বস্তু থেকে তুলে নিয়ে নিত্য বস্তুতে আরোপ করাই ঈশ্বর-প্রেম। আমাদের ভিতর ঈশ্বর আছেন তো প্রেমও নিশ্চয় আছে। ঈশ্বর এবং ঈশ্বর-প্রেম যখন একি তত্ত্ব তখন জীবের ভিতর ঈশ্বর আছেন আর প্রেম নেই—এটা অবাস্তব কথা। আমাদের প্রেম অপাত্রে দান করে অপরাধী সেজে বসে আছি। আর এই অপরাধের জন্য প্রেম থাকতেও প্রেম হতে বঞ্চিত আছি।

১৭০। যখন গীতা পাঠ করবে তখন মনে মনে ছবি দেখবে যেন শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে উপদেশ দিচ্ছেন। আর একটু এগোলে দেখবে যেন শ্রীভগবান তোমাকেই গীতা-উপদেশ করছেন। যখন কোন ভজন-কীর্তন গাইবে বা শুনবে তখন সেই গানের পদকর্তা এবং আরাধ্য দেবতার ছবি ভাববে। পদকর্তা যে ভাব নিয়ে আত্মনিবেদন করছেন সেই ভাব প্রার্থনা করবে। এ ভাবে শ্রবণ-কীর্তনে নিজেকে

সম্পূর্ণভাবে মিশিয়ে দিতে অভ্যাস করবে। এতে শীঘ্র অনুভূতি লাভ হয়।

১৭১। সংসার ধর্মে—আগে চোরের চেলা হয়ে থাকলে পরে সাধুর চেলা হও। কিন্তু সাধন পথে—আগে সাধুর সেবক হও পরে চোরের চেলা হবে।

আগে শুদ্ধব্রহ্ম পরাৎপর রামের সেবক হও, পরে চিত্তচোর-চূড়ামণি রাধারমণের চেলা হবে। আগে বৈধীপথে সিদ্ধিলাভ কর, পরে রাগানুগার রসমাধুরী আস্বাদনে লোভ করবে। সাধন পথের উলটো রীতি। সংসারে দিবায় জাগরণ, রাত্রে নিদ্রা। সাধনে দিবায় নিদ্রা, রাত্রে জপে জাগরণ।

১৭২। শ্যাম এবং স্বামী একই কথা। শ্যাম-ই জগৎ-স্বামী, সকলের স্বামী। রামনাম রক্ষক, রক্ষা করে। সমস্ত পাপ হতে রক্ষা করে। ভববন্ধন হতে রক্ষা করে, মুক্ত করে। কৃষ্ণনাম পাবক। পবিত্র করে, প্রেম দান করে। রাম নামে চিত্তভূমি চষা হলে শ্যামনাম তাতে প্রেমের বীজ বপন করে।

১৭৩। মহাসমুদ্রের তীরে দাঁড়িয়ে একটি আঙ্গুল দ্বারা একটু জল স্পর্শ করলে মহাসমুদ্রকেই স্পর্শ করা হয়। ভগবৎপ্রেমের এক কণা অনুভব করতে পারলেও তাঁকেই অনুভব করা বা আস্বাদন করা হয়। তাতেই জীবন ধন্য হয় পূর্ণ হয়। পূর্ণতমকে স্পর্শ করলেই পূর্ণতা লাভ।

১৭৪। হৃদয়ে শ্রীগুরুর ধ্যান, আজ্ঞাচক্রে যোগমায়ার ধ্যান এবং সহস্রারে যুগলের ধ্যানই প্রশস্ত।

১৭৫। নিরাকারের ভিতর সাকার ঘুমিয়ে আছে, আবার সাকারের ভিতর নিরাকার লুকিয়ে আছে। এ বিশ্ব ভগবানের সাকার বিশ্বরূপ, আর স্বয়ং তিনি নিরাকার। সাকার রূপ চোখে দেখা যায়। নিরাকার ভাব ধ্যানে দেখা যায়। আমাদের সকলের সর্ববিধ মঙ্গলবিধানের জন্য

তাঁর অসংখ্য হস্ত। সকলের কাছে একই সময়ে শীঘ্র পৌঁছানোর জন্য তাঁর অসংখ্য পদ। সকলের সব কথা শুনবার জন্য তাঁর অজস্র কর্ণ। সকলের প্রতি সর্বদা দৃষ্টিরাখার জন্য তাঁর সহস্র সহস্র চক্ষু। বিশ্বের সব প্রাণীর সকল মুখ হস্ত পদ চক্ষু কর্ণ প্রভৃতি নিয়েই তাঁর বিশ্বরূপ। জীবের ভিতর অবস্থান করত ঐ সব ইন্দ্রিয়দ্বারা তিনি আপনার রস (আনন্দ) আপনি আস্বাদন করছেন। তিনি এক, আবার তিনিই বহু।

১১৬। সুন্দর ফুল দেখলে তার রূপের ছটায় আমরা মোহিত হই। সুশ্রী নারীপুরুষ দেখলে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকি। আমরা সবাই সৌন্দর্যের প্রতি সহজেই আকৃষ্ট হই। সৌন্দর্যে ডুবে যেতে চাই। কিন্তু, কেন এই আকর্ষণ? কার আকর্ষণ? তা ভাবি না। সৃষ্টির যদি এত মোহিনী শক্তি তবে স্রষ্টা কতখানি মোহিনীশক্তি ধরেন তা কি আমরা একবারও ভাবি! যদি ভাবতাম তবে স্রষ্টাকে ছেড়ে শুধু তাঁর সৃষ্টি নিয়ে মেতে থাকতাম না। আমরা অধিক পেলে আর অল্প নিতে চাই না। কিন্তু ভজনের বেলায় আমাদের উলটো স্বভাব। এ সময়ে শুধু সৃষ্টির রূপেই অন্ধ হতে চাই। ঐ রকম শত সহস্র রূপের স্রষ্টা যে তাঁর সৃষ্টির মধ্যে লুকিয়ে থেকে আমাদের হাতছানি দিয়ে ডাকছেন, সে দিকে আমাদের দৃষ্টি নেই। যে রূপে মোহিত হই তা স্রষ্টার রূপসাগরের একটি বুদ্‌বুদ্‌ মাত্র। স্রষ্টার এই রূপের পসরার উদ্দেশ্য আমাদের মোহিত বা পথভ্রষ্ট করা নয়। আমাদের চোখ ধাঁধিয়ে দেওয়াও নয়। এর আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে—আমরা রূপে আকৃষ্ট হয়ে যেন রূপকারের অন্বেষণ করি। যে রূপে মোহিত হয় সে যেমন সাধু নয়, আবার যে রূপ উপেক্ষা করে সেও সাধু নয়। যে রূপের ভিতর দিয়ে রূপকারকে চিনতে পারে সে-ই সত্যিকারের সাধু। রসিক বলি তাকে যে শিল্পের গুণবিচারে শিল্পীর মনের খবর ধরতে পারে, শিল্পের ভিতর শিল্পীকে দেখতে পারে।

১৭৭। তোমরা যে প্রত্যহ আকণ্ঠ বিষয়-রস পান করছ, অধিক অর্থের জন্য প্রাণপাত করছ, বাড়ী গাড়ীর পিছনে ছুটছ, চোব্য-চোষ্য চাইছ তাতে একটুও দোষ হত না যদি ওসবের মধ্যেও ভগবানকে একটু খোঁজ করতে। মুখেই বল, ভগবান সর্বত্র আছেন। কিন্তু কাজের বেলায় তাঁকে বেমালুম ভুলে আছ। শুধু এই ভুলে থাকার জন্যই বিষয়-রস বিষে পরিণত করেছ। ফলে অর্থ অনর্থ ঘটাচ্ছে। গাড়ী বাড়ী আজ তোমাকেই চাপা দিচ্ছে। চোব্য-চোষ্য তোমাকে চুষছে। তোমার ভুল ভাঙ্গ, দেখবে—প্রতিকুল জিনিষ অনুকুল হয়েছে।

১৭৮। ভোগে দোষ নেই, দোষ লোভে। লোভেও দোষ নেই যদি তাঁর প্রতি লোভ থাকে। লোভে মোহ জন্মে। মোহ মনকে অপ্রকৃতিস্থ করে। অপ্রকৃতিস্থ মন নিয়ে কেউ কখন কোন বস্তু পরিপূর্ণভাবে ভোগ করতে পারে না। সুতরাং লোভীর বিষয়-ভোগও হয় না। লোভী কেবল লোভই ভোগ করে। নির্লোভ নির্লিপ্ত পুরুষই পরিপূর্ণভাবে সববিষয় ভোগ করে। বিষয়ের প্রতি লোভ করলে লোকসান। বিষয়দাতার প্রতি লোভ করলেই লাভ।

১৭৯। রাম-রসে যদি লোভ থাকে তবে বিষয় চিবিয়ে খেলেও দোষ হয় না। ভক্ত হনুমানের মত মুক্তার মালা চিবালেও যখন তাতে রাম-রস মিলবে না তখন আপনা থেকেই তা ছুড়ে ফেলে দেবে। রামে লোভ থাকলে শ্রীরামেরই ভাবনা হবে তোমাকে কি উপায়ে অমৃতপান করাবেন। তার উপায় তিনিই করে দেবেন। জীবের কি সাধ্য আছে যে আপন ক্ষমতায় সে অমৃত আস্বাদন করে!

১৮০। ভজন করতে গিয়ে স্ত্রী পুত্র আত্মীয় স্বজন যদি বিরোধী বিবাগী হয় তবে তা শুভ লক্ষণ মনে করবে। বুঝবে, ভজন শুরু হয়ে গেছে। যতই ভগবানের নিকটবর্তী হবে আত্মীয়স্বজন ততই দূরবর্তী হবে। ইহা ভগবানের প্রথম করুণা, স্ত্রীপুত্রের

মোহে যাতে আটকা না পড়। এভাবেই তিনি স্বয়ং আমাদের মায়ার বাঁধন কেটে দেন। সংসারের স্বজনগণ দূরে সরে না গেলে ভগবান যে সবচেয়ে আপনজন, এ জ্ঞান হয় না। এ জ্ঞান না হলে তাঁর সঙ্গে প্রেমের সম্পর্কও স্থাপন হয় না।

১৮১। সর্বদা ইষ্টচিন্তা ইষ্টধ্যান ইষ্টনাম করলে কাম ক্রোধ লোভাদি ভিতরে প্রবেশ করার ফাঁক পায় না। যদি মনে কাম ক্রোধাদি উঁকি দেয় তবে বুঝবে মনে কোথাও ছিদ্র আছে। তখনই সাবধান হবে এবং ধ্যানজপ দ্বারা মনকে সংযত রাখবে। সাধন-পথে পা বাড়াতেই আগে দেহস্থিত রিপুরূপী আত্মীয়গণ বিদ্রোহ করে, পরে সংসারের স্বজনগণ রুখে দাঁড়ায়। সংসার সৃষ্টিমুখী। ভজন লয়মুখী। অর্থাৎ সংসার এবং সাধনা বিপরীতধর্মী। তাই আমরা যখন সৃষ্টিমুখী পথ ছেড়ে লয়মুখী পথ ধরি তখন সৃষ্টির সহায়কারী রিপুগণ বিদ্রোহ করে, ভজন পথে বাধা দেয়। যেহেতু রিপুগণও মহামায়ার শক্তিতে শক্তিমান সেজন্য রিপুগণের বিনাশ সম্ভব নয়। তবে ভজনদ্বারা তাদের ক্রূরতা পরিহার করিয়ে তাদেরকে ভজনপথের সহায়ক করা চলে। যারা এই পথ ধরে তারাই সমরে জয়ী হয়। কত মুনি ঋষি সিদ্ধ মহাত্মা এই রিপুর খপ্পরে পড়ে পথভ্রষ্ট হয়েছেন তার অসংখ্য কাহিনী রামায়ণ, মহাভারত পুরাণাদিতে আছে। অতি সাবধানী ছাড়া ভজনপথ পার হতে পারে না। যেসব জ্ঞান থাকলে অতি সাবধানী হওয়া যায় তার মধ্যে গুরুগোবিন্দে অবিচল নিষ্ঠাভক্তিই প্রধান। যারাই রিপুকে ধ্বংস করতে গেছে তাদের সাধনাই ধ্বংস হয়েছে। প্রতি-কুল রিপুকে অনুকুলে আনাই সাধনার কৌশল। এখানেই প্রকৃত জ্ঞানের পরিচয়।

১৮২। ঠাকুর রামকৃষ্ণের 'পাকা আমি' 'কাঁচা আমি' বুঝতে চেষ্টা করবে। তুমি যখন "আমি" বলছ সেটা কাঁচা আমি, তোমার

শ্রীগুরু যখন "আমি" বলছেন তখন সেটি পাকা আমি। কাঁচা আমি জীবাত্মা, আত্মার জীবভাব। পাকা আমি পরমাত্মা, আত্মার ব্রহ্মভাব। একটি আমের দু অবস্থা—কাঁচা অবস্থায় কাঁচা আম, পাকা অবস্থায় পাকা আম। শিষ্যের কাজ হচ্ছে তার কাঁচা আমিকে পাকা আমিতে পরিণত করা। এর সহজতম পথ হচ্ছে, কাঁচা আমিকে পাকা আমির কাছে রেখে দেওয়া। কিছুদিন পর দেখবে পাকা আমির সংস্পর্শে কাঁচা আমিও পাকা হয়ে গেছে।

১৮৩। যিনি তোমার সবচেয়ে নিকটে, যিনি তোমার একান্ত আত্মীয়, যাঁকে ছাড়া তোমার এক মুহূর্ত সময় চলছে না তাঁকেই তুমি জীবনভর খুঁজে বেড়াচ্ছ! এর চেয়ে আশ্চর্য হবার কথা আর কি হতে পারে! শুধু এই কথাগুলি সদাসর্বদা চিন্তা কর। দেখবে, তোমার ভিতরে বসে তিনি সাড়া দিচ্ছেন। তোমার সঙ্গে কথা বলছেন। তুমি তাঁর কথায় কান দিচ্ছ না, তাই তিনি তোমার কাছে দূরের বস্তু হয়ে আছেন। তুমি তাঁকে স্বীকার করছ না তাই খুঁজে মরছ। আপন বস্তুকে তুমিই পর করে নিয়েছ। যিনি তোমার জীবনপ্রদীপ জ্বেলে ধরে আছেন তাঁকেই দেখার জন্য আজ তুমি আলো খুঁজছ। যেখানে কোন আড়াল নেই সেখানেও তুমি কাল্পনিক পর্দা টাঙ্গিয়েছ। এ সব সমস্যা যখন তোমারই সৃষ্ট তখন এদের খণ্ড খণ্ড করে খণ্ডন করতে তোমাকেই অস্ত্র ধারণ করতে হবে না কি? সৃষ্টিকর্তারই ধ্বংসে অধিকার।

১৮৪। মন কর্ম বাক্য এই তিনটি ফলক একত্র করে একটি ত্রিশূল তৈরী করে সাধন পথে চলবে। তখন কোন শত্রুই আর তোমাকে কাবু করতে পারবে না। ত্রিশূল শক্তির প্রতীক। মন কর্ম বাক্য একমুখী হলেই এই অমোঘ শক্তি লাভ হয়। মন যদি এক দিকে ছুটে, বাক্য যদি ভিন্ন কথা বলে, কর্মে যদি মন ও বাক্যের মিল না থাকে, তবে তা সাধনভজন না হয়ে সাধনের ভঞ্জন হবে।

১৮৫। ভগবান যেমন আমাকে সৃষ্টি করেছেন, আমিও তেমনি ভগবানকে সৃষ্টি করি মাটি ইত্যাদি দিয়ে। আর তাঁতে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করি আমার ভিতরে যে সৃষ্টিধর্মী ভগবান আছেন তাঁর শক্তি দিয়ে। তাঁর সৃষ্টিতে আমি মুগ্ধ, আমার সৃষ্টিতে তিনিও মুগ্ধ।

১৮৬। যখন কিছু খাও তখন তুমি খাচ্ছ তোমার ক্ষুধা পেয়েছে, এ ভাব ভুলে গিয়ে গোপালের ক্ষুধা পেয়েছে, তাঁকে খাওয়াচ্ছ— এই ভাব নিবে। এতে সত্ত্বগুণ বৃদ্ধি পাবে। লোভ দমন হবে। যখন স্নান কর তখন গোপালকে স্নান করাচ্ছ এই ভাব নিবে, তাতে দেহ শুদ্ধ হবে। তিনি তোমার ভিতরে যতক্ষণ আছেন ততক্ষণই তোমার স্নানাহার। তিনি নেই তো তোমার স্নানাহারও নেই। তিনিই তোমার ভিতরে বসে স্নানাহার করছেন না কি!

১৮৭। গৃহীরা কৃষ্ণ পাবে অতিথিনারায়ণের সেবাদ্বারা। তাদের অন্য সাধনের আবশ্যক হয় না। অতিথিকে নারায়ণজ্ঞানে সেবা করলেই সাক্ষাৎ নারায়ণ-সেবার ফল হয়। এ ভাবে সেবা করতে করতে গৃহীর মন নারায়ণের প্রতি আসক্ত হবে। এই আসক্তি ক্রমে ভক্তিতে পরিণত হলে নারায়ণ একদিন অতিথিরূপে আসেন ভক্তের সেবা গ্রহণ করতে। সেই পরীক্ষায় গৃহী পাশ করলেই বাঞ্ছিত ধন লাভ হবে। সেবা সবসময়েই পরম ধর্ম। কিন্তু গৃহীর কাছে উহা একমাত্র ধর্ম।

১৮৮। শক্তি ছাড়া ভক্তি হয় না। দুর্বলের ভক্তি নেই। কি মানসিক কি শারীরিক যে কোন শক্তি লাভ করতেই শক্তিপূজার আবশ্যক। চাই মহাশক্তির কৃপা। ভজনশক্তি অর্জনের জন্যই শক্তি-পূজা অপরিহার্য। পশুরাজ সিংহ শক্তির প্রতীক। সিংহ মা দুর্গার বাহন। অর্থাৎ মা দুর্গা শক্তির অধিষ্ঠাত্রী দেবী। মা দশ-ভুজার দশ হাতেও দশটি শক্তি বা অস্ত্র। এ সকলই মহাশক্তি-প্রকাশক। অসুর অশুভের প্রতীক, অমঙ্গলের প্রতীক। মহা-

শক্তিময়ী মা দশহস্তের অস্ত্রদ্বারা সাধকের দশদিকের সমস্ত অশুভ অমঙ্গলগুলি বিনাশ করেন। মা শুধু অসুর-নাশিনী নন, তিনি লক্ষ্মী সরস্বতী কার্তিক গণেশ পরিবৃতা। অর্থাৎ মায়ের সঙ্গে আছেন ঐশ্বর্যের প্রতীক লক্ষ্মী, পরাবিদ্যার প্রতীক সরস্বতী, বীর্যবত্তার প্রতীক কার্তিকেয় এবং ঋদ্ধিসিদ্ধির প্রতীক গণপতি। অসুরমুক্ত করে মা সাধককে ঐশ্বর্য পরাবিদ্যা বীর্য এবং সিদ্ধি প্রদান করেন। সাধনলভ্য যা কিছু সবই মায়ের অধীন। মাতৃরূপা মহাশক্তির কৃপা ভিন্ন সন্তানের সাধনরথ অচল। শক্তিকে উপেক্ষা করে ভুক্তি মুক্তি চাওয়া আর ছাগীর গলস্তন থেকে দুধ দুইতে যাওয়া—উভয় কর্মের একই ফল।

১৮৯। যাকে শাসন করা যায় তাকে যেমন শিষ্য বলে, আবার যাকে শিষে বা শিরে বা শীষে রাখা যায় তাকেও শিষ্য বলে। উপযুক্ত শিষ্য গুরুর এতই আদরের বস্তু যে গুরু তাকে সদা উঁচুতে রাখেন। গুরু নিজের কথা ভুলে গিয়ে শিষ্যের মান বাড়ান, যেমন ভগবান ভক্তের মান বাড়ান। এমত স্তরে শুধু শিষ্যই গুরুকে শ্রদ্ধা করে না, গুরুও শিষ্যকে শ্রদ্ধা করেন। শ্রদ্ধাভাজন গুরুর পক্ষে শ্রদ্ধা করাই স্বাভাবিক। গুরু যদি শিষ্যকে শ্রদ্ধা না করেন তবে তিনি কি করে শিষ্যের শ্রদ্ধা আশা করবেন? গুরুর শ্রদ্ধাসম্পদ আছে বলেই শিষ্য সে সম্পদের অধিকারী হয়।

১৯০। কাম আর প্রেমের বাইরের চেহারা একই রকম। তবে তাদের বিপরীত ভাবের জন্য গতি উলটোমুখী। কাম নীচে নামায়, প্রেম উপরে ওঠায়। কামে কলহ, প্রেমে পরমানন্দ। যেমন জল আর অগ্নি তেমনি কাম আর প্রেম বিপরীতধর্মী। অগ্নির জন্ম যেমন সমুদ্রে, তেমনি প্রেমের জন্ম কাম হতে। সুতরাং কাম ঘৃণার বস্তু নয়। কামে গুরুত্ব দিলে কামও একদা গুরুরূপ ধারণ করতে পারে। বারবনিতা চিন্তামণির কামে একদা অন্ধ বিল্বমঙ্গল

চিন্তামণিকেও গুরুর আসনে বসিয়ে ছিলেন। গুরুত্ব দিলেই গৌরব বাড়ে।

১৯১। কৃষ্ণকে বিষস্তন্য পান করাতে গিয়ে পূতনা রাক্ষসী যখন মুক্তিলাভ করেছে, নিশ্চই তখন কৃষ্ণপ্রেমের নিন্দুকরাও মুক্তি পাবে। কিন্তু তারা ভক্তি পাবে না। ভক্তিতে আর মুক্তিতে অনেক পার্থক্য। অনেক অসুরই ভগবানের হাতে মুক্তি পেয়েছে কিন্তু তারা ভক্তি-বৃক্ষের সুপক্ক সরস ফল প্রেম আস্বাদন করতে পারে নি। কৃষ্ণ-ভজন করার জন্য তুমি কৃষ্ণের দাস। কেউ তোমার নিন্দা কলঙ্ক রটালে তোমার তাতে বিচলিত হবার কথা নয়। তুমি যাঁকে ভজন করে আজ নিন্দার ভাগী, এ ভাবনা তাঁর। যখন তোমার সবকিছু কৃষ্ণপদে সমর্পণ করে তাঁর দাস হয়েছ, তখন কি তোমার লজ্জা ভয় ভাবনা মান অপমান তাঁকে অর্পণ কর নি? যদি কলঙ্কভয় তাঁকে অর্পণ না করে থাক তবে তোমার আত্মসমর্পণ পূর্ণ হয়নি। তুমি তাঁর দাস হতে পার নাই। তোমার একাদশ ইন্দ্রিয় কৃষ্ণকে অর্পণ কর। দেখবে, তোমার কাছে সবই কৃষ্ণস্তুতি।

১৯২। একটা মনের কিছু অংশ যদি বিষয়-ভাবনায় থাকে আর বাকী অংশ ভজনে থাকে, তবে আধখানা মনের ভজনদ্বারা আধখানা ফলও লাভ হবে না। কখনই কোন বস্তুকে পূর্ণরূপে লাভ করা যাবে না। মনকে বলা হয় ইন্দ্রিয়গণের রাজা। এমনিতেই পরা-ক্রমশালী না হলে রাজা হওয়া যায় না। কিন্তু মন শুধু পরাক্রম-শালী নয়, অতীব পরাক্রমশালী রাজা। তার শক্তির পরিচয় শুধু শাস্ত্রপুরাণাদিতেই নয়, আদ্দিকাল হতে আজ পর্যন্ত সমাজ-সংসারের সর্বত্রই দেখা যায়। তার এত শক্তির বাহাদুরী ততক্ষণ যতক্ষণ সে অখণ্ড অটুট থাকে। একবার সে খণ্ড বা টুকরা হলে আর তার কোন দাম নেই। ভাঙ্গা মন দ্বারা কোন কাজই সুসম্পন্ন করা যাবে না।

১৯৩। একটি পাত্র একই সময়ে বিষপূর্ণপাত্র এবং অমৃতপূর্ণ পাত্র হতে পারে না। কিছু বিষ কিছু অমৃত মিশিয়ে পাত্রটি পূর্ণ করা যায়। তাতে বিষ এবং অমৃত উভয়ের গুণ নষ্ট হয়। আমাদের অবস্থাও তাই। আমরা কিছু বিষয়চিন্তা কিছু বিষ্ণুচিন্তা দ্বারা মন ভরে রেখেছি। তাতে কোনটারই পূর্ণফল পাচ্ছি না। যদি বিষয়বাসনার নিবৃত্তি না হয়ে থাকে তবে আকণ্ঠ বিষয় ভোগ করে নাও। ভোগে যখন বিতৃষ্ণা আসবে তখন ভজন পথে এলে দ্রুত পথ এগোনো যাবে। শীঘ্র সুফল পাবে। বিষয়-বাসনা মনে চেপে রেখে সাধু সাজা যায়, সাধু হওয়া যায় না।

১৯৪। ভজন করলেও দুঃখ সুখ আসবে, ভজন না করলেও সুখ দুঃখ আসবে। সুখ যেথায় যায় দুঃখও তার পিছু যায়। উলটো করেও বলা যায়—দুঃখকে দেখা গেলে কিছু দিন পর সুখের সন্ধানও মিলবে। এই মায়ার জগতে সুখদুঃখও মায়ার কার্য। শুধু মানুষের কথা নয়, সকল প্রাণী তরুলতা কীট পতঙ্গ সকলেই সুখদুঃখের অধীন। তবে এদের থেকে মানুষের একটা বিশেষ সুবিধে আছে। সে সাধনভজন দ্বারা এমন একটা মানসিক স্তরে পৌঁছতে পারে যেখানে সুখদুঃখের উপস্থিতি আছে কিন্তু ক্রিয়া নেই। অর্থাৎ সেখানে সুখদুঃখের অনুভূতি নেই। সাধনপ্রভাবে এমন একটা আনন্দলোকে পৌঁছান যায়, যে আনন্দের গাঢ়তা ভেদ করে দুঃখের জ্বালা ভিতরে পৌঁছতে পারে না। ফলে সেখানে সদানন্দভাব ব্যাহত হয় না। এ ভাবটি সংসারীর চোখে ধরা পড়ে না। সংসারী নিজে যেমন সুখদুঃখ ভোগ করে, তার চোখে সকলেই সুখদুঃখে ডুবে আছে । সাধুর অন্তর্জগতের খবর কখনই সংসারী জানতে পারে না।

১৯৫। সুখ বা দুঃখ বলে কোন স্থায়ী বস্তু নেই। ও একটি মানসিক অবস্থা মাত্র। একজন যাতে সুখ পায় অন্য একজন

তাতেই দুঃখ পায়। এমন কোন পার্থিব বস্তু বা ভাব নেই যাতে সবাই সমানভাবে সুখ বা দুঃখ পায়। সুখদুঃখের মাপকাঠি কোন বস্তু নয়। সুখদুঃখের তরতম বিচার করে মন। যার যেমন মন সে তেমন বিচার করে। আবার এই সুখদুঃখ ভোগও করে মন। তাই একজন যাতে সুখ পায় অন্যজন তাতে সুখ পায় না।

সাধনা দ্বারা সুখদুঃখ ভোগকারী মনের লয় ঘটিয়ে বিবেক বা বিশুদ্ধ জ্ঞানকে জাগ্রত করা যায়। এই জ্ঞানের কাছে সুখদুঃখ ঘেঁষতে পারে না। ইহাই মুক্তি বা জীবন্মুক্ত অবস্থা। ভক্তগণ ভগবানের সহিত ভক্তিভাবে জীবিত অবস্থায় যুক্ত, আর অসুরগণ ভগবানের সহিত বৈরীভাবে মৃত্যুর পরে যুক্ত। ভক্ত সর্বদাই মুক্ত। সর্বদা ব্রহ্মানন্দ আস্বাদন করে। তার সুখও নেই দুঃখও নেই।

১৯৬। আমরা এই মুহূর্তে যাকে প্রণাম করি, শ্রদ্ধা করি পরমুহূর্তেই তাকে অশ্রদ্ধা অবহেলা করতে পারি। এর কারণ, শ্রদ্ধার মূল্যবোধ আমাদের নেই। ফলে আমাদের অন্তরে শ্রদ্ধার বীজ অঙ্কুরিত হয় না। চিত্তে শ্রদ্ধা না জন্মালে ভজনপথ পাওয়া যায় না। শ্রদ্ধাভক্তি না জন্মানোর কারণ গুরুজ্ঞানের অভাব, গুরুভক্তির অভাব। গুরুর গুরুত্ব না দিলে গুরুভক্তি জন্মে না। গুরুতে শ্রদ্ধা ভক্তি জন্মালে সকলের প্রতি শ্রদ্ধাভক্তি আসবে। যার হৃদয়ে শ্রদ্ধাভক্তি আছে তার ভিতর কখনও অশ্রদ্ধা-অবহেলার ভাব ঠাঁই পায় না।

১৯৭। তোমরা অনেকেই 'যোগ' শব্দের অর্থ জান। কেঁউ বা যোগ অভ্যাস কর। গীতার 'যোগঃ কর্মসু কৌশলম্' বাক্যও জান। কিন্তু তোমরা সকলেই যে যোগী তা জান কি? যোগ মানে ঈশ্বরের সঙ্গে যুক্ত থাকা বা যুক্ত হওয়া। আমরা কিন্তু সকলেই সর্বদা ভগবানের সহিত যুক্ত আছি। আমাদের দেহস্থিত আত্মা সর্বদাই পরমাত্মা পরব্রহ্মের সঙ্গে যোগযুক্ত, যোগ রক্ষাকরে চলছে। আমরা

সকলেই যোগী। কিন্তু যোগী হয়েও যোগী নই। কারণ, তাঁর সঙ্গে আমার এই চিরন্তন যোগের কথা বেমালুম ভুলে বসে আছি মহা-মায়ার প্রভাবে। এই বিস্মৃতির জন্যই আমরা যোগী হয়েও যোগী নই। ঐ বিস্মৃতিকে যখন বিস্মৃত হতে পারি, যখন মহামায়ার প্রভাব হতে মুক্তি পাই তখনই আমরা প্রকৃত যোগী হই, যোগের সুফল লাভ করি।

১৯৮। "যোগঃ কর্মস্থু কৌশলম্" বাক্যটির গূঢ় রহস্য বুঝতে হবে। কৌশলম্ শব্দটির ভিতর একটু বুদ্ধির খেলা বা চতুরতার ইঙ্গিত আছে। আমরা কোন কঠিন কাজকে কৌশল প্রয়োগ করে চতুরতার সঙ্গে অনেক সময়ে অতি সহজে সম্পন্ন করে থাকি। লোকে তখন আমাদের চতুর বলে। এই চতুরতায় কোন প্রকার শঠতা নেই। আছে কঠিনকে সহজ করার তাৎক্ষণিক উপায়। শ্রীনরো-ত্তম ঠাকুর বলেছেন—যেই জন কৃষ্ণ ভজে সে বড় চতুর। এই চাতুর্য এবং কৌশল একই তত্ত্ব বহন করে। কৃষ্ণভজন কঠিন হতেও কঠিন কাজ। ব্রহ্মাদি দেবগণ যাঁকে ধ্যানে পায় না, তাঁকে ভজন করা মানুষের পক্ষে কত কঠিন তা সহজেই অনুমান করা চলে। এই কঠিনতম কাজটি মানুষ কেবল কৌশল ও চতুরতার সঙ্গেই করতে পারে। অন্য উপায়ে নয়। ঐ কৌশল ও চাতুর্য-কলার প্রধানটি হচ্ছে—মন বাক্য কর্ম এক বিন্দুতে এনে মহন্তের পদধূলি দ্বারা নিজকে অভিষিক্ত করা। কি উপায় মন বাক্য কর্মকে এক করা যায় তা আলোচনা করা যাক।

প্রথমে মনের কথাই ধর। মনকেই তুমি ইষ্টদেবতা ভাব। কোন কাজ করার আগে আমরা ভেবে নেই। পরিকল্পনা করি, সেই মত কাজ করি। তুমি মনকে কৃষ্ণ ভেবে সেই কাজের কথা কৃষ্ণরূপী মনকে জিজ্ঞাস করে করতে থাক। কোন কঠিন কাজ হলে আমরা কোন অভিজ্ঞ লোকের পরামর্শ নেই। তুমিও

তেমনি তোমার মনগুরুর পরামর্শ নাও। তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ কর। তাঁর উপদেশ শুনতে বুঝতে অভ্যাস কর। বহির্মুখী মনকে অন্তর্মুখী করে একটু স্থির হলেই মনগুরুর নির্দেশ ধরতে পারবে। সমস্ত কাজই ঈশ্বরের কাজ এবং ঈশ্বরের নির্দেশেই তা করা হচ্ছে এই ভাব নিয়ে করলে মনে ইষ্ট জাগ্রত হতে থাকবেন। তখন শুভ কাজ সহজেই সুসম্পন্ন হবে। অশুভ কাজে মন যাবে না এবং কর্মফলজনিত বন্ধনও ভোগ করতে হবে না। দৈনন্দিন কাজের ভিতর দিয়ে স্বাভাবিক ভাবেই কৃষ্ণের সহিত সদা যুক্ত থাকবে। এ ভজনে কোন কঠিনতা নেই। এইরূপ প্রতি বাক্যে কৃষ্ণকে প্রতিষ্ঠিত কর। শব্দকে ব্রহ্ম জ্ঞান কর। আমরা যত কথা বলি যত শব্দ উচ্চারণ করি তার ভাব আগেই মনের মণিকোঠায় জন্ম নিয়েছে, পরে মুখ থেকে নির্গত হচ্ছে। মনে যখন কৃষ্ণ অধিষ্ঠান তখন শব্দসকলও কৃষ্ণ হতে বা ব্রহ্ম হতে উৎপন্ন হয়েছে এবং ব্রহ্মের মত শব্দও অমর অবিনাশী। এই জ্ঞান হলে জিহ্বায় কখন মিথ্যা উচ্চারিত হবে না। সহজেই সত্যাশ্রয়ী হবে। এ অবস্থায় মহতের কৃপাকণা পেলেই ব্রহ্মসাক্ষাৎ লাভ। মন কর্ম বাক্যের একতায় ক্ষেত্র প্রস্তুত হলে মহাজন ব্রহ্মবীজ বপন করেন।

১৯৯। জ্যেষ্ঠ-শ্রেষ্ঠকেই আমরা প্রণাম করি। আমাদের থেকে যারা বয়সে গুণে জ্ঞানে শ্রেষ্ঠ তাদেরকে প্রণাম করি। প্রণাম মানে প্রকৃষ্টভাবে বিনম্র হওয়া। একবার যাকে প্রণাম করবে, জানবে চিরতরে তার পায় নিজকে বিকিয়ে দিলে। প্রণাম করলে তা আর ফেরৎ নেওয়া যায় না। একবার যাকে জ্যেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ মহৎ বলে স্বীকার করেছি তাকে যখন অবহেলা অবজ্ঞা করি তখন নিজকেই অবজ্ঞা করি। তখন আমি নিজেই নিজের কাছে অশ্রদ্ধার পাত্র হই। একদিন আমার ভিতর শ্রদ্ধাভক্তি ছিল তাই সেদিন তাকে প্রণাম করেছিলাম। আজ আমার সেই শ্রদ্ধাভক্তি লোপ

পেয়েছে তাই তাকে প্রণাম করছি না। অপরকে সম্মান দেওয়ার অর্থ নিজেকে সম্মানিত করা। অপরকে অপমান করা মানে নিজেকে অপমান করা।

২০০। কোন স্থানে এক বেদীতে বরাবর ৺শ্রীশ্রীকালী পূজা হয়। শ্রীশ্রীমহামায়ার মূর্তি যখন বিরাজ করেন তখন সকলেই সেখানে প্রণাম জানায়। কিন্তু শ্রীমূর্তির অবর্তমানে সেই শূন্য বেদীকে ক'জনা প্রণাম জানায়? তখনও যে প্রণাম জানায় তার প্রণামই খাঁটি প্রণাম। একবার যে দেহ-বেদীতে সৎগুণরূপী ভগবৎ সাক্ষাৎ পেয়ে প্রণাম জানিয়েছ সেই দেবগৃহকে আর তুমি অশ্রদ্ধা করতে পার না। তা করলে গবৎ মহিমাকে - গবানকেই অশ্রদ্ধা করা হয়।

২০১। একজন অজ্ঞ অন্ধ হলেই সে অপরকে অপমান করতে বা দুঃখ দিতে পারে। তোমাকে যখন কেউ দুঃখ দেয় তখন কি তুমি বিজ্ঞ হয়ে সেই অজ্ঞের প্রতি ক্রোধ- অভিমান করবে? না, তার প্রতি করুণা করবে? ক্রোধ করায় বা প্রতিহিংসা করায় তোমার নিজের অজ্ঞতাই প্রকাশ পায়। সবার ভিতর ইষ্টদর্শন করতে অভ্যাস কর, প্রতিহিংসাবৃত্তি পালিয়ে যাবে।

২০২। যেমন 'গুরু মিলি লাখ লাখ শিষ্য নহি এক', তেমনি ভগবান যত্রতত্র ভক্ত কুত্র? কৃষ্ণভাবের অভাব নেই কিন্তু রাধাভাবের বড়ই অভাব। রাধাভাবের বা আরাধিকাভাবের অভাব বলেই আনন্দের অভাব। সাধনভজন করে প্রায় সকলেই কৃষ্ণ সাজতে চায়, সেবা নিতে চায়। কিন্তু কজনে আরাধিকা সাজতে রাজী! কজনে সেবা দিতে প্রস্তুত! আনন্দ পেতে হলে আনন্দ দিতে হয়, সেবা দিতে হয়। কাউকে আনন্দ দেওয়াই নিজে আনন্দ আস্বাদন করা। সেবাতেই আনন্দ। রাধাভাবেই আনন্দ।

২০৩। শত শত গোপীর সেবার চাইতে রাধার সেবার প্রতি কৃষ্ণের অত্যধিক লোভ। রাধার প্রেমেই কৃষ্ণের পরিপূর্ণ তৃপ্তি, আনন্দ। রাধাচরিত্র অনুকরণ করাই কৃষ্ণসেবার শ্রেষ্ঠ বিধি। রাধাময় হলেই রাধারমণ হাজির। ফুল ফুটে নিজে কখনই ভ্রমরকে ডাকে না। ভ্রমর আপনি আসে মধুলোভে। তোমার বুকে রাধাপ্রেম থাকলে কৃষ্ণভ্রমর আপনি আসবে। কৃষ্ণচিন্তা না করে আগে রাধাময় হতে চেষ্টা কর। কৃষ্ণলাভ সহজ হবে।

২০৪। আগে শরীরধর্ম রক্ষা করতে জান, পরে আত্মধর্ম রক্ষার কথা ভাববে। আগে শরীর পরে ধর্মচিন্তা। শরীর রক্ষা না পেলে ধর্মাচরণ করবে কে? শরীর রাখতে আগে লোভ দমন কর, আর ধর্ম রক্ষা করতে আগে কাম দমন কর। সুসাধনের জন্য চাই সুদেহ। দেহই ধর্মের গেহ, যার লোভ হচ্ছে সদর দরজা, কাম খিড়কি দরজা। এ দুটো দরজা বন্ধ করলে বাকী রিপুগুলো দম-বন্ধ হয়ে মরে যাবে।

২০৫। তর্ক করার প্রবৃত্তিতে ভক্তি উবে যায়। ভজনপথে তর্ককে সর্বদা এড়িয়ে যেতে হয়। বড় বড় তর্কবাগীশরা তর্কের মায়াজাল বিস্তার করে নাস্তিকতাও প্রমাণ করতে পারে মহা আস্তিকের সামনে। ওরকম পরিবেশে আপন ভক্তিবিশ্বাস নষ্ট হতে পারে। তাদের কাছে ঈশ্বর নাস্তিকবেশে হাজির। তর্ক-যুদ্ধে তাদের জয় করবে এমন সাহস না করাই শ্রেয়। বরং সব অবস্থাতে সব পরিবেশে আত্মগোপন করে নিজকে রক্ষা করবে, এই চেষ্টা থাকাই মঙ্গলজনক। মনে করবে—ভজনপথ হতে ভক্তির পথ হতে তোমাকে দূরে সরাবার জন্য তার্কিকরূপে মায়া তোমাকে তাড়া করছেন। কেউ গুরুনিন্দা করলেও তর্কে তার জবাব না দিয়ে শাস্ত্রের নির্দেশ মত সে স্থান তৎক্ষণাৎ ত্যাগ করবে। শাস্ত্রবিরুদ্ধ মতকে খণ্ডন করার জন্য অবতারকল্প আচার্যগণ আছেন।

২০৬। চরম ত্যাগ না হলে পরমলাভ হয় না। ভগবান বুদ্ধ রাজ-সিংহাসন, সুন্দরী স্ত্রী ও শিশু পুত্রকে ত্যাগ করে ছিলেন পরম জ্ঞান লাভের জন্য। ভগবান রামচন্দ্র রাজতিলক উপেক্ষা করলেন, বনবাসী হলেন, সীতা হারালেন তাঁর ভগবত্তা প্রতিষ্ঠার জন্য। চরম ত্যাগ মানে চরম দুঃখ বরণ। যিনি তাই করেছেন তিনিই আমাদের কাছে চিরআরাধ্য রূপে বিরাজ করছেন।

২০৭। গুরু যখন কানে মন্ত্র দেন তখন কেবল তোমার সমস্ত ভারই তিনি নেন না, বীজমন্ত্ররূপে তিনি সর্বদা তোমার ভিতরে অধিষ্ঠিত থেকে সর্ব আপদ্ হতে সর্বদা রক্ষা করত তোমাকে ঈশ্বর-সামীপ্য করাতে যত্নবান থাকেন। প্রথমে হৃদয়ে শ্রীগুরুর ধ্যান করে শ্রীনামকে জাগাও। নাম জেগে উঠলে স্বয়ংপ্রকাশ নামী আপনি এসে ধরা দেবেন।

২০৮। প্রেমের ভজন হল পরিপূর্ণ আত্মত্যাগের ভজন, পূর্ণ আত্ম-সমর্পণের ভজন। পূর্ণ আত্মসমর্পণ না হলে শুদ্ধ প্রেম আসে না। শুদ্ধ প্রেমে কোন প্রকার বাঞ্ছা বা চাহিদা নেই। ভালবেসে দান করে ত্যাগ করে সমর্পণ করে যে আনন্দ বা আত্মসুখ তাও এখানে নেই। এখানে নিজেকে একেবারে ভুলে যাওয়া। আপন দেহ মন প্রাণ পর্যন্ত ভুলে যাওয়া। [illegible] এ ভাবে সর্বস্ব সমর্পণ করলে আর চাইবে কে! তখন মনেপ্রাণে অন্তরে বাইরে শুধু তিনি। তিনিময়। অহং ঘুচিয়ে ত্বং হওয়া। যেমন একঘটি জল সমুদ্রে ঢেলে দেওয়া। প্রেম দ্বি-তত্ত্বকে ধ্বংস করে। দ্বৈত ভাবকে, দ্বি বস্তুকে প্রেম পুড়িয়ে গালিয়ে এক বস্তুতে পরিণত করে। দ্বিত্বভাব ধ্বংস করে অদ্বয়তত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত করে।

২০৯। মনের যতটুকু আবেগ স্নেহ প্রেম দিয়ে প্রিয়জনকে স্ত্রী পুত্র কন্যাকে বুকে টেনে নাও আদর কর, তার কণামাত্র দিয়ে যদি ভগবানকে আদর করতে তবে স্ত্রীপুত্রের চাইতে শতগুণে প্রিয়,

তাদের ভালবাসার চাইতে শতসহস্রগুণ বেশী ভালবাসার ধন পরম প্রেমময় ভগবানের অফুরন্ত প্রেমের সন্ধান পেতে। নিশ্চিত-রূপে জেনে রাখ, ভগবান প্রেমের বশ, জপতপের বশ নন। জপতপ যোগধ্যানে যা সম্ভব নয়, বুকের একটু ভালবাসায় তার চেয়ে অনেক বেশী সম্ভব। জপতপ পার্থিব ভাব। তার শক্তিও সীমিত। প্রেমভালবাসা অপার্থিব ভাব। তার শক্তি অসীম অনন্ত।

২১০। ভজনে দুঃখ নেই। সুখময়ের সন্ধানেও সুখ। কিন্তু ভজন করতে গেলে কিছু কিছু বাধা আসে, যেগুলো আমাদের কাছে দুঃখ বলে মনে হয়। এটাও মনের ভ্রম। মন শুদ্ধ হলে, এ বাধাকে দুঃখ বলে মনে না হয়ে সুখ বলেই মনে হবে। এর চেয়ে অনেক বেশী বাধা বড় দুঃখ সর্বদাই সংসারপথে আসে। কই, সেখানে তো আমরা থমকে দাঁড়াই না! ভজনের জন্য মন তৈরী না থাকলেই দুঃখবোধ আসে। ভজনকে পরম বাঞ্ছিত ধন ভাবতে পারলে, অমূল্য সম্পদ মনে হলে সব দুঃখকেই অতি তুচ্ছ মনে হবে। মুক্তার মত সামান্য ধন তুলতে ডুবুরীরা জীবন বিপন্ন করে গভীর সমুদ্রে ডুব দেয়। কিন্তু অমূল্য পরম সম্পদ সংগ্রহের জন্য জীবনসংশয় করতে হয় না।

২১১। ভজন তো ভবদুঃখ নাশ করে। যা দুঃখ নাশ করে তাতে আবার দুঃখ থাকবে কি করে! আসলে আমরা জলাতঙ্কের মত ভয়াতঙ্কে মরি। ভজনকে একটা ভয়ের বস্তু কল্পনা করে সেই কল্পিত ভয়ে ভেবে মরি। যাদের ভূতের ভয় তারা রাত্রে সবকিছুতেই ভূত দেখে। তেমনি যারা অজ্ঞান-অন্ধকারে আছে তাদের সব কিছুতেই ভয়। ভজনে ভয় তো নেই-ই, বরং এক কণা ভজন করলেই সব দুঃখের অবসান, মহাভয় নিবারিত। 'স্বল্পমপ্যস্য ধর্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ'—গীতা ২।৪০। যারা ভজনে দুঃখ দর্শন করে

তারা ভজন থেকে অনেক অনেক দূরে আছে। তারা নিজেরা তো ভজনের 'ভ' ও জানে না, জানে শুধু অপরকে জুজুভয় দেখাতে।

২১২। আত্মসমর্পণ সাধনের উচ্চতম অবস্থা। এ অবস্থা পেতে কয়েক জনম কেটে যেতে পারে। প্রতিদিন একতিল একতিল করে অহংভাব ছাড়তে হয়। নিজের আহার-বিহার পর্যন্ত তাঁকে অর্পণ করতে হয়। প্রাণটি পর্যন্ত তাঁর সম্পত্তি। তাই ইচ্ছামত প্রাণ বিসর্জন করাও চলে না। ঠিকভাবে এগোতে থাকলে যতটুকু তাঁকে অর্পণ করতে থাকবে তার শতগুণে আনন্দ ফিরে পেতে থাকবে। তুমি আত্মদান করলে তিনি তোমায় আনন্দ দান করবেন। আসল কথাটি হচ্ছে—তাঁর উদ্দেশে ত্যাগ করলে যে একটি সাত্ত্বিক শূন্যতা আসে সেই শূন্যস্থান তাঁর আনন্দস্বরূপ এসে দখল করে। তিনি পূর্ণকাম। তাঁর কোন চাহিদা নেই। তবু তাঁকে আমরা অর্পণ করি। এ অর্পণের বিনিময় তিনি তাঁর প্রেম প্রত্যর্পণ করেন না। জীবের প্রতি তাঁর স্বাভাবিক প্রেম। প্রেমময় সর্বদাই প্রেম বিতরণ করছেন। কিন্তু আমরা তা অনুভব করতে পারছি না কারণ, আমাদের অন্তরে সেই স্বর্গীয় প্রেমকে ঠাঁই দিতে পারছি না। আত্মসমর্পণ বা ত্যাগের বিশেষ প্রয়োজন হচ্ছে—সেই প্রেমের জন্য অন্তরে একটু জায়গা করে দেওয়া। মনের কামনা ও সংকল্প হটিয়ে নিষ্কাম প্রেমকে বসতে দেওয়া, বাড়তে দেওয়া। আত্মত্যাগে আত্মানুভূতি লাভ। ত্যাগে অনুভূতি-শক্তি লাভ।

২১৩। পণ্ডিত বলে, মূর্খ না শোনে।
মূর্খ বকে, পণ্ডিত না শোনে॥

২১৪। মৎস্য সমুদ্রে জন্মে এবং সমুদ্রে বাস করেও সমুদ্রের পরিমাপ করতে পারে না। আমরাও ব্রহ্মে জন্মে, ব্রহ্মে সদা ডুবে থেকে ব্রহ্মের পূর্ণ পরিচয় জানতে পারি না, পরিমাপ করতে পারি না।

২১৫। শত্রুভয় মৃত্যুভয় পাপভয় নরকভয় সর্দবিধ ভয় হতে মুক্ত না হলে পূর্ণানন্দ আসে না। ভয় না গেলে ভগবৎ অনুভূতি আসে না। সর্বানন্দ সদাস্থায়ী হলেই ব্রহ্মের অনুভূতি হয়। আনন্দই অনুভূতির ভূমি।

২১৬। ইষ্টমূর্তির সামনে যেমনটি পকার্য চলে তেমনটি অন্যত্র হতে চায় না। যদি সর্বত্র সর্ববস্তুতে ইষ্টমূর্তি দর্শন করার অভ্যাস করা যায় তবে জপ সহজ হয়ে যায়। সবদা জপের অভ্যাসের সঙ্গে সঙ্গে সর্বত্র ইষ্টদর্শনের অভ্যাস করা দরকার। এতেই ভজন দ্রুত এগিয়ে যায়।

২১৭। আপন দেহে আঘাত করলে তখনই ব্যথা পেতে হবে। পরদেহে আঘাত করলে একটু পরে ব্যথা পাবে। নিজদেহ ও পরদেহ একই তত্ত্ব। তুমি সে তত্ত্বে এখনও পৌঁছাওনি তাই পরদেহে আঘাত করে পরে ব্যথা পাচ্ছ। সে তত্ত্বে যে পৌঁছে গেছে সে ওতে তৎক্ষণাৎ ব্যথা পায়। যে নিজদেহে-পরদেহে দ্বিভাব দ্বৈত-ভাব পোষণ করে তাকেই দৈত্য বলা যায়।

২১৮। সুখ যেখানে আছে অবশ্যই সেখানে দুঃখ আছে। সুখদুঃখ একই বস্তুর দুটি দিক। যেমন গ্রামোফোন রেকর্ড। একটি পিঠ ফেলে দিয়ে অপরটি পাওয়া যায় না। ভজনের উচ্চমার্গে উঠতে হলে সুখ এবং দুঃখ উভয়ের আওতার বাইরে আসতে হবে—যেখানে সুখও নেই, দুঃখও নেই। আছে নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ আস্বাদন। এরূপ আনন্দ আস্বাদনের উপায় বলেছেন শ্রীমদ্ভাগবত। ভাগবতের মতই মত। ব্রজের পথই পথ। ব্রজগোপীরা কৃষ্ণপ্রেমে এতই তন্ময়তা প্রাপ্ত হয়েছিল যে সুখ তাদের স্পর্শ করতে পারে নি। কারণ, তারা তিলেকের তরেও আত্মসুখের কল্পনাও করে নি। তাদের কাছে সুখ পৌঁছতে পারে নি বলে দুঃখও তাদের স্পর্শ

করতে পারে নি। একমাত্র কৃষ্ণভজনে কৃষ্ণপ্রেমেই জীব সুখদুঃখের অতীত হতে পারে। প্রেমের রাজ্যে সুখদুঃখের প্রবেশাধিকার নেই।

২১৯। অনন্ত নীল আকাশ হচ্ছে ঘনশ্যাম আর কোটি কোটি গ্রহনক্ষত্র হচ্ছে ব্রজবালা। অনন্তকাল ধরে এদের নিত্যরাস।

২২০। সব চেয়ে তিক্ত বস্তু হচ্ছে 'সত্য'। আবার সবচেয়ে মধুর বস্তুও হচ্ছে ঐ 'সত্য'। এর কারণ হচ্ছে তোমার জিহ্বা।

২২১। তোমরা তো সবদাই স্বর্গসুখ চাও! নরকের নাম শুনলেও নাক সিঁটকাও! কিন্তু ভগবানকে নরকেও যেতে হয় সেখানের খবর নিতে। নরক তো আর তাঁর রাজ্যের বাইরে নয়। তেমনি সাধুসন্তদেরও পাপরাজ্যে যেতে হয় পাপীর মঙ্গলার্থে। সাধুর স্বর্গসুখে যেমন লোভ নেই, নরকেও তেমনি ডর ভয় নেই। নির্বিকার হলেই মুক্ত। মুক্ত হলেই সাধু।

২২২। বৈরীভাবে যেমন রাবণ-কংসাদি ভগবানের সাক্ষাৎ পেয়েছে, নাস্তিক ভাবেও কেউ তাঁকে পেতে পারে যদি 'ঈশ্বর নেই, ঈশ্বর নেই' এই জপ তার মধ্যে সর্বদা দৃঢ়ভাবে চলতে থাকে। আসলে ভাবগ্রাহী জনার্দন সব ভাবেই বিদ্যমান। ভাবে দৃঢ়তা গভীরতা না থাকলে মধুর ভাবেও তাঁকে পাওয়া যাবে না। যে ভাবই ধর অতি দৃঢ় করে তা ধর। তবেই তিনি ধরা দেবেন। কেবল দৃঢ়ব্রত দ্বারাই তাঁকে ধারণ করা যায়।

২২৩। আমি ভজন করি, আমি জপ করি, পূজা করি—এ সব ভাবও অহংভাব, প্রেম বা শুদ্ধজ্ঞানের অন্তরায়। সর্বদা গুরু স্মরণ করে ভাববে—হে গুরু, তুমি যা করাচ্ছ তাই করছি। তুমি পথ দেখাও। আমি শুভাশুভ জ্ঞান বিবর্জিত। এতে অহংভাব দূর হয়ে সমর্পণের ভাব আসবে। প্রেমের ভাব আসবে।

২২৪। যা কিছু করতেছ সবটাতেই তুমি কর্তা সাজ। যেন সব কর্মই তোমার ইচ্ছামত হচ্ছে। কিন্তু একটু ভেবে দেখলেই দেখতে পাবে, তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধেই বেশী কর্ম হচ্ছে। তা হলে মুখে যে 'আমি' বল সে 'আমি' থেকেও একটা তেজী 'আমি' তোমার ভিতরে বসে আছে, যে মোটেই তোমার ইচ্ছামত চলে না। উপরের আমিটা নকল আমি। ভিতরেরটা আসল আমি। আমরা নকল আমির গর্বে এতই বিভ্রান্ত এতই অন্ধ যে আসল আমিকে পাত্তাই দেই না। কিন্তু আসল আমিও ছাড়বার পাত্র নয়। সে চায় নকল আমিকে হটিয়ে দিতে। এ নিয়ে দু আমির টানাহেঁচড়ায় আমাদের জীবন জেরবার। নকল 'আমির' তাবেদারী করে সর্বদাই নাজেহাল হচ্ছি, তবু আসল'আমির' কথা শুনতে চাইনে। এই দুই 'আমির' দ্বন্দ্বকলহই আসল জীবনসংগ্রাম। আসল 'আমি' জয়ী হলে বিশ্বজয় সম্ভব। আর নকল 'আমি' জয়ী হলে নরকবাস নিশ্চিত।

২২৫। প্রলোভন প্ররোচনা ও প্রশংসা বিষবৎ ত্যাজ্য। এই ত্র্যহস্পর্শ যাকে স্পর্শ করে, এ জনমের মত তার সবটাতেই ইতি ঘটে।

২২৬। হরিবাসরে হরিকথা আলোচনাকালে কীর্তনকালে বা ব্যাসাসনে বসে পরনিন্দা পরচর্চা মহা অপরাধ। পরনিন্দা পরচর্চা এমনিতেই পাপ। কিন্তু হরিবাসরে তা হয় মহাপাপ। হরিকথার মাহাত্ম্য হল চিত্তশুদ্ধিকর। তার জন্যই হরিবাসর বা কীর্তন আসর। শাস্ত্রে আছে, এক সময়ে ভগবান দেবর্ষি নারদকে বলেছিলেন—আমি বৈকুণ্ঠে থাকি না, যোগীদের হৃদয়েও থাকি না, যেখানে ভক্ত আমার কীর্তন করে আমি সেখানেই থাকি। হরিবাসরে এবং কীর্তন আসরে শ্রীভগবান সর্বদা বিরাজমান। তাঁকে সামনে রেখে পরনিন্দা পরচর্চা করলে সাক্ষাৎ ভগবানেরই নিন্দা করা

হয়, অথবা ভগবানের সামনে ভক্তের নিন্দা করা হয়। এ কারণে এতে মহাপাপ এবং তার জন্য কঠিন দণ্ড ভোগ করতে হয়। চুনের কাজ বস্ত্রাদি পরিস্কার করা। কিন্তু চিত্তরূপ বস্ত্রে হরিকথারূপ চুন লাগিয়ে যদি পরনিন্দা-পরচর্চারূপ হলুদ লাগান যায় তবে বস্ত্রের সে দাগ তোলা বড়ই কঠিন। সে দাগ তুলতে বস্ত্রের আয়ু শেষ। অর্থাৎ জীবন শেষ। সুতরাং সাবধান!

২২৭। তোমরা পাপ জান। তার পরিণামও শুনেছ। আর পুণ্যও জান এবং তার ফলও জান। কিন্তু পুণ্যের বেশে পুণ্যের ছলে পাপ করলে তার কি ভয়াবহ পরিণাম হয় তা বুঝতে পার কি? পাপের জন্য পাপ করলে, বা না বুঝে পাপ করলে তার ক্ষমা আছে। কিন্তু জেনে বুঝে পুণ্যের ছলে পাপ করলে তার ক্ষমা নেই। তার ফল অবশ্যই ভোগ করতে হবে। সাধারণ পাপীর ক্ষমালাভ সহজ। কিন্তু সাধুর বেশে বা সাধুর ছলে পাপ করলে তা হয় ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ। শাস্ত্রে তার জাজ্বল্যমান উদাহরণ—লংকাধিপতি রাবণ, তস্য মামা কালনেমি এবং রাহু।

২২৮। কখনও কোন ব্রাহ্মণের প্রাণে এতটুকু কষ্ট দেবে না—হোক্‌না সে সমাজের চোখে অনাচারী। মহাসুকৃতির ফলে ব্রাহ্মণকুলে জন্ম হয়। বাইরের আচরণ দেখে বিচার করলে তার পুণ্য সুকৃতির প্রতি অবিচার-অপরাধ করা হবে। তা ছাড়া ব্রহ্মতেজের বলে সে অতি অল্পে তার সাময়িক দোষত্রুটি শুধরে নিতে পারে। শাস্ত্রে তার বহু প্রমাণ আছে। বহু শাস্ত্রে এ কথা স্পষ্ট করে বলা আছে যে ব্রাহ্মণের অপমান ভগবান কখনই সহ্য করেন না। সুতরাং কোন ব্রাহ্মণের ভালমন্দের বিচার কখনই করবে না। কারো ভালমন্দেরই বিচার করতে নেই, বিচার করবে নিজের। দোষ ধরবে নিজের। তবেই আত্মশুদ্ধি হবে। আত্মশুদ্ধি হলে আর অপরের দোষে দৃষ্টি যাবে না। বাইরের আচরণ দেখে বিচার করতে গেলে

বহু সিদ্ধ মহাত্মাকেই শুধু চিনতে ভুল করবে না, মহতের কাছে এমন মহা অপরাধ করে বসবে যে বহু জনমেও সে দুর্ভোগ কাটবে না।

২২৯। কাউকে ভাল লাগে না বলে তার সঙ্গে তিক্ততা ঘটাতে হবে, এমন কথা হতে পারে না। অনেককেই অনেকের ভাল না লাগাটা স্বাভাবিক। কিন্তু তাদের মধ্যে বৈরীতা সম্পূর্ণ অস্বাভাবিক। ভাল না লাগে তো নিরপেক্ষ থাক। মনেপ্রাণে নিরপেক্ষ থাক। সব সাধুসন্তকেই আমার ভাল লাগবে, তা হয় না। আর আমার কোন সাধুকে ভাল লাগে না বলে তিনি সাধু নন, এ কথাও ঠিক নয়। অতএব, সাধুসজ্জন সম্পর্কে খুবই সাবধান! ভাল লাগে কাছে যাও, ভাল না লাগে শতহাত দূরে থাক। সাপের লেজ দিয়ে কানখোঁচাতে যেও না। এর পরিণাম ভয়াবহ। সিদ্ধমহাত্মারা ভগবানের প্রাণের জন। ভগবানকে নিন্দা-মন্দ করলে ভগবানের ক্ষমা পাওয়া যায়। কিন্তু তার প্রিয়জন সাধুভক্তদের নিন্দা করলে ভগবান কিছুতেই ক্ষমা করেন না।

২৩০। পূতসলিলা গঙ্গাকে মা ভগবতীজ্ঞানে শ্রদ্ধা করতে হয়। মা পতিতপাবনী পাপহারিণী জ্ঞানে গঙ্গাস্নান করলে দেহমন শুদ্ধ হয়। ভক্তিতেই শুদ্ধি। দেহমন শুদ্ধ হবে ভক্তিতে। ভক্তিবিহীন স্নানে শুদ্ধি নেই। মা গঙ্গার প্রতি অকৃত্রিম শ্রদ্ধা থাকলে নদী সাগর বিরাট জলাশয় প্রভৃতি দেখলেই সেই মাতৃভাবের উদয় হবে। মা গঙ্গার সঙ্গে পৃথিবীর জলরাশি যুক্ত। এই অখণ্ড জলরাশিই আমাদের অখণ্ড মা। অখণ্ড মাতৃজ্ঞান জন্মালে যেখানেই স্নান কর তাতেই গঙ্গাস্নানের ফল হবে। মা গঙ্গার জন্ম শ্রীহরির পাদপদ্ম হতে। তাই তাঁর এত পাবনীশক্তি। মাকে শ্রদ্ধা জানালে শ্রীহরিকেই শ্রদ্ধা জানান হয়। শ্রীহরি প্রীত হন।

২৩১। দৃশ্য অদৃশ্য স্থূল সূক্ষ্ম প্রাণী অপ্রাণী যাবতীয় বস্তুই ব্রহ্ম। কিন্তু বাণী বাক্য শব্দ একটু বিশেষ শক্তিসম্পন্ন ব্রহ্ম। এই বৈশিষ্ট্যের কারণ, নাদ বা শব্দ আদি সগুণ ব্রহ্ম। নাদব্রহ্ম হতেই পর্যায়ক্রমে সব বস্তু জাত হয়েছে। নাদ আদি নির্ণয়। তাই নাদের সঙ্গে নির্গুণ ব্রহ্মের নিবিড়তা। নাদই নির্গুণকে নির্ণয় করে। একারণে মন্ত্রউচ্চারণ জপতম স্বাধ্যায় দ্বারাই ব্রহ্ম নিরূপিত হন। বাণীতে ব্রহ্মজ্ঞান এলে শীঘ্রই ব্রহ্মানুভূতি। সাধনপথে বাণী বা বাক্য উচ্চারণে সাবধানী-সংযমী হওয়া একান্ত প্রয়োজন। বাক্যের অপচয় ভজনের অপচয়।

২৩২। নিজে যদি মান-মান্যতা পেতে চাও তবে শাস্ত্র গুরু ভগবান আর ভক্ত বৈষ্ণব ব্রাহ্মণকে কায়মনপ্রাণে মান্য করবে। মান দিলে মান পাবে। যা দ্বারা কোন বস্তু মাপা যায় তাকে মান বলা হয়। তুমি অপরকে কতটুকু মান সম্মান দাও তা দ্বারা তোমার মনুষ্যত্ব মাপা হয়।

২৩৩। কভু বিষ আর অমৃত একসঙ্গে মিশিয়ে খেতে নেই। শুধু বিষ খেলে তার ক্রিয়া হয়ত বা নষ্ট করা যায়। সামান্য বিষ কখন উপকারও করে। কিন্তু বিষ-অমৃত মিশিয়ে খেলে তা মহাবিষ হয়। মৃত্যুর কারণ হয়। তেমনি পুণ্য অর্জন করতে কভু পাপাচরণ করবে না। পাপকে ভজনের সাথী করলে তা মৃত্যুর কারণ হয়। বিষপানকারীর মত মহাপাতকীর পরিত্রাণের খবর শাস্ত্রে দেখা যাবে। কিন্তু বিষামৃতভোগীর মত কপট পুণ্যার্থীর পরিত্রাণের খবর কোথাও নেই। চুরি করতে সাধুর বেশ নিও না।

২৩৪। গুরুকরণ থেকেই ভজন আরম্ভ। গুরুকরণের পূর্বে আবশ্যক গুরুতত্ত্ব উত্তমরূপে অবগত হওয়া। তাতে ভজনপথ যেমন সহজ সুগম হয় তেমনি ইষ্টলাভও ত্বরান্বিত হয়। অবশ্য কিছু ক্ষেত্রে

গুরুলাভের পর গুরুতত্ত্ব লাভ হয় এবং ভজনে সিদ্ধিলাভও হয়। কিন্তু এতে পদস্খলনের একটি সম্ভাবনা থাকে, গুরুর মূল্য আগে থেকে না জানার জন্য। গুরুতত্ত্ব সম্পর্কে কোন জ্ঞান না থাকলে তাঁকে ইষ্ট জ্ঞান করা কষ্টকর হতেই পারে। ফলে ভজন তো হয়ই না, পতনের পথ প্রশস্ত হয়। কোন বস্তু প্রাপ্তির পূর্বে সেই বস্তুর মূল্য-জ্ঞান থাকলে বস্তুর সদ্‌ব্যবহার সুনিশ্চিত হয়। প্রাপ্তিতেই পূর্ণতা আসে না। পূর্ণতা আসে পরিপূর্ণ সদ্‌ব্যবহারে।

২৩৫। শ্রীগুরুদেহেই শ্রীগোবিন্দকে ধ্যান করতে হয়। গুরুর দেহই ইষ্টের দেহ। গুরুই ইষ্ট- এই ধ্যান। ধ্যানে গুরুর দেহ গোবিন্দের দেহে রূপায়িত করতে হয়। এই ধ্যান যত নিরবচ্ছিন্ন যত গাঢ়, ইষ্টসাক্ষাতের দিন ততই নিকটবর্তী। এভাবে চললে ইষ্টদর্শন গুরুর ভিতরেও হতে পারে, বাইরেও হতে পারে। কিভাবে কিরূপে তিনি দর্শন দিবেন তা সবরকম যুক্তি কল্পনার বাইরে। এ তাঁর ইচ্ছা। তাই চোখ কান মন সর্বদাই তাঁর জন্য প্রস্তুত রাখতে হয়। এমন অনেক ঘটনা আছে, ভগবান দর্শন দিলেন কিন্তু ভক্ত তা বুঝতে পারলে না।

এর উপরের স্তরে যাওয়াই শ্রেয়। সেখানে ভিন্নভাবে ইষ্ট-দর্শনের কোন লালসা লোভ নেই। সেখানে "গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণুঃ গুরুর্দেবো মহেশ্বরঃ গুরুরেব পরং ব্রহ্ম" — এই ভাব এই ধ্যান। যেমন গুরুই আদ্যাশক্তি, গুরুই বিশ্ব, গুরুর বাইরে কিছু নেই। "গোবিন্দ যেন গুরুর রূপ-চেহারা নিয়ে সর্বদা বিরাজ করছেন। শ্রীগুরুর অঙ্গ শ্রেষ্ঠতম পীঠস্থান যাঁহা সর্ব দেবের অধিষ্ঠান। "সর্বদেবময়ো গুরুঃ"—এই ভাবে লাভ বেশী। কারণ, তখন ভগবানকে ভক্তের খুঁজতে হয় না। ভগবানই তখন ভক্তকে খুঁজে বেড়ান। ভগবানকে বাঁধবার একমাত্র কৌশল হল নিষ্কাম ভজনা।

২৩৬। সম্পদ সংগ্রহ করতে সম্পদ চাই। আর্থিক শারীরিক বা মানসিক যে কোন সম্পদ না থাকলে ধন সম্পদ সঞ্চয় হয় না। জ্ঞান সঞ্চয় করতেও জ্ঞান থাকা চাই। জ্ঞান বিশ্বের অমূল্যতম বস্তু—এ জ্ঞান না থাকলে কি সে জ্ঞান সঞ্চয় করতে পারে! অজ্ঞানীর জ্ঞানলাভ হয় না। জ্ঞানীই সর্বদা জ্ঞানান্বেষণে রত। জহুরীর চোখেই জহরত ধরাপড়ে।

২৩৭। তুমি অজ্ঞ বলেই বিজ্ঞের কাছে যাও। নিগূঢ় তত্ত্ব জান না বলেই গুরুর কাছে যাও। তত্ত্বজ্ঞকে পরিপূর্ণভাবে জানতে পারলেই তত্ত্ব জানা হবে। গুরুকে সম্যক্‌রূপে জানতে পারলেই গূঢ় তত্ত্ব জানা হবে। আগেই তত্ত্ব জানতে গেলে তা জানা যাবে না। আগে তত্ত্বজ্ঞকে—গুরুকে জানার সাধনা কর। গুরু প্রীত হলে তত্ত্ব আপনি প্রকাশিত হবেন।

২৩৮। আগেই ভগবানকে জানতে চেও না। আগে তোমাকে নিজেকে জান। তার আগে তোমার ভিতর তমঃ রজঃ গুণগুলিকে চেন। তাদের খুঁজে বের কর। যেই তুমি তমোরজের মুখোমুখী হবে অমনি তারা পালাবে। ওরা পালাবামাত্রই তুমি সত্ত্বগুণে প্রবেশ করবে। তখন তুমি ঈশ্বর-অনুসন্ধান করলে সেই চেষ্টায় বিনাকষ্টেই সফল হবে। একবার শুদ্ধ সত্ত্বগুণে প্রতিষ্ঠিত হলে দেখবে—তোমার কাছে সবই সুন্দর, সবই সত্য, সবই আনন্দময়। শুদ্ধসত্ত্বগুণের কাছে ভূবন মধুময়। সর্বদাই অমৃত আস্বাদন। তখন অসত্য অন্তর্হিত, মৃত্যু বিতাড়িত।

আসলে অসত্য বলে কিছুই নেই। সত্যেই বিশ্ব বিধৃত। সত্য ছাড়া অপর কোন সত্তা নেই। আমাদের একাদশ ইন্দ্রিয় রজোতমের এঁধো ডোবায় ডুবে তার রঙ্গিন জল চোখেমুখে লাগিয়ে সব কিছুই রঙ্গিন দেখছে-বুঝছে। রজোতমের রং ধুয়ে শুদ্ধ হলে আর অসত্য দর্শন হয় না। আমাদের ভিতরের

অসত্য ইন্দ্রিয়ের দরজা দিয়ে বাইরে বেরিয়ে এসে কাল্পনিক রূপ বা অসত্যরূপ ধারণ করে।

২৩৯। গুরুর অভিষাপ লঘুকে ভোগ করতে হয়, এ কথা আমরা জানি। আবার কখন লঘুর অভিষাপও যে গুরুকে ভোগ করতে হয়, একথা সকলে মনে রাখি না। রামায়ণ মহাভারত খুললে এর অসংখ্য উদাহরণ পাওয়া যাবে। সুতরাং উভয় পক্ষকেই সংযমী সাবধানী হতে হয়। পথ বড়ই পিচ্ছিল। কে কখন কিভাবে হোঁচট খাবে তা দেবতারাও বলতে পারেন না। দেবতারাও যে কখন হোঁচট খান নি তা তো নয়! নইলে অসুরের কাছে বার বার হারতে হল কেন! নিজ নিজ অধিকারেব বাইরে কখনই কারো যাওয়া বিধিসম্মত নয়।

২৪০। সাধুর নিজের কোন সত্তা নেই। সব সত্তা বিকিয়ে বসে আছে তার অন্তর্যামীর কাছে। তাই সাধুর মান-অপমান বোধ নেই। সাধুকে মান-অপমান করলে তাতে সে হৃষ্টও হয় না, কষ্টও হয় না। কিন্তু তার অন্তরে যিনি বসে আছেন—সাধুর অন্তর্যামী দেবতা, তিনি সেই মান অপমানেব বিচার করে সমুচিত ফল দেন মান-অপমানকারীকে। সাধুর সেবাই ভগবৎ সেবা যেমন, সাধুর অপমানও তেমনি সাক্ষাৎ ভগবানের অপমান। সাধু যদি হতে চাও তবে সাধুর প্রতি সাবধান হও। শ্রীমদ্ভাগবত একাধিকবার বলেছেন—মহতের পদধূলিদ্বারা অভিষেক ভিন্ন যোগতপস্যাদিতে ব্রহ্মলাভ হয় না। এই শাস্ত্রবাক্যের মর্ম গ্রহণ করে চললে ভজনপথ সহজ হতে সহজতর হবে। মহতের অবমাননায় ভজন সমূলে নষ্ট হবেই হবে।

২৪১। 'কাল'কে কালা বল আর কালীই বল, কাল কিন্তু মোটেই কালা নয়। সে সবই শুনতে পায়। সব কিছুই তার খাতায় লেখা হয়ে যায়। কাল বা সময় বড়ই কঠিন। বড়ই ক্রূর, রূঢ়।

কালের বাধ্য কে নয়? কাল সর্বশক্তিমান। সে কাউকে ভয় পায় না। কাউকে ক্ষমাও করে না। মৃত্যুর পরোয়ানা নিয়ে একদিন সে সকলের দরজায় হাজির হবেই। সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা থেকে আরম্ভ করে পাঞ্চভৌতিক সমস্ত পদার্থকেই কাল কবলিত করে, গ্রাস করে। অথবা বলাযায়—কালের সৃষ্টিকারী স্বয়ং ভগবানও কালের নিয়ম মেনে চলেন, মেনে চলেন ধর্ম, শাস্ত্রাদিও। এই কালকে সর্বদাই খেয়াল করবে। প্রতি ক্ষণেই সে একটু একটু করে আমাদের দেহ মন প্রাণ জ্ঞান বিদ্যাবুদ্ধি প্রভৃতি হরণ করছে। এ রোধ করার কোন উপায় নেই। একমাত্র উপায় হল—কাল তিল তিল করে যেমন লয় [illegible] তেমনি সেই তালে প্রতিপলে আমাদের ভজন বাড়িয়ে যা[illegible]য়া। একমাত্র বস্তু হচ্ছে ভজন, যাকে কাল লয় করে না। কেবল ভজনই কালজয়ী। ভজন-সম্পদই অক্ষয় থাকে ইহকালে এবং পরকালে। এ ধনে যার লোভ হয় সে-ই প্রকৃত লোভী। এ ধন যার লাভ হয় সে-ই প্রকৃত ধনী। কালকে ফাঁকি দেবার এটাই একমাত্র কৌশল।

২৪২। সুন্দর ফুল বা ফল দেখলে তা সুন্দরতমকে নিবেদন করতে ইচ্ছে হয়। অন্যভাবে বলা যায়—সুন্দর বস্তু দেখলেই চির-সুন্দরের কথা মনে পড়ে। পার্থিব সৌন্দর্যের সঙ্গে চিরসুন্দরের এই যোগাযোগ দেখেও আমরা আমাদের জীবনের সুন্দরতম বস্তু যৌবনকে ভগবৎপূজার ডালিরূপে সাজাই না। ফল পচে গেলে, ফুল বাসী হলে তা দ্বারা দেবতার পূজা হয় না বলে কখনই সে ফলফুল দিয়ে পূজার ডালি সাজাই না। কিন্তু জীবন-বৃক্ষের যৌবন-ফুল ঝড়ে গেলে, প্রেমফলে পচন ধরলেই তবে আমরা ভজন-পথে পা বাড়াবার উপযুক্ত সময় মনে করি! এই গতযৌবনের ভজন যে বাসীপচা ফুলফল দ্বারা পূজার ডালি সাজাবার মত অর্থহীন তা জেনেও মানতে চাইনে। যেন ভগবানকে ফাঁকি দেবার

জন্যই ভজনের আয়োজন! সংসারের বুড়োবুড়ীরা উপদেশ দেন—যৌবনে ভোগ কর, বুড়ো হলে ভজন করবে। ঐ উপদেশ প্রবঞ্চনায় পরিণত হয় যখন যৌবন ফুরালেও ভোগের বেগ ফুরায় না। তখন বার্ধক্যও কেটে যায় যৌবনে কি পাইনি আর কি পেয়েছি তার হিসেবনিকাশে। জীবন-দেবতার পূজা জীবন থাকতে আর হয়ে ওঠে না। হয়ত তাঁর পূজা ঠিকই হয় জীবনের শেষ মুহূর্তে, কিন্তু পূজার প্রসাদ আর পূজারী খেয়ে যেতে পারে না।

২৪৩। বার্ধক্য শুধু পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় ও পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়কেই দুর্বল করে ক্ষান্ত হয় না, এদের রাজা মনকেও দুর্বল দুর্মনা করে ছাড়ে। মনরাজা হীনবল হবার ফলে দশেন্দ্রিয়-প্রজাগণ লাগামহারা হয়ে দশদিকে ছুটতে থাকে। তখন কে কার কথা শোনে! কে কাকে চালনা করে! এই চরম দৌর্বল্য দৌর্মনস্য অবস্থায় কে কার ভজন করে! উপনিষদ্ বলেছেন—নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যো (মুঃ ৩।২।৪)—দুর্বলের আত্মদর্শন হয় না। দৈহিকশক্তি না থাকলে আধ্যাত্মিক শক্তি দাঁড়াবে কোথায়! ইন্দ্রিয়সকল দুর্বল হলে তাঁকে পাবার মত পাওয়া হয় না। আস্বাদনের ক্ষমতা না থাকলে ভগবানের রূপ রস ঐশ্বর্য কে ভোগ করে! কে আস্বাদন করে! তাই বলছি—বার্ধক্যে ভজন হয় না, হয় তার অভিনয়। যদি তাঁকে পাবার মত পেতে চাও, যদি জগতের সর্বোৎকৃষ্ট বস্তুকে সর্বতোভাবে ভোগ করতে চাও তবে তার উপযুক্ত সময় সুন্দর সুমধুর যৌবন—যখন সর্বেন্দ্রিয়বৃত্তি পূর্ণশক্তিতে শক্তিমান, পূর্ণ-বিকশিত দেহকুসুম মধুভরা, মনযমুনায় প্রেমের বান। তখন এতই তেজ যে অতি সহজে সে তার সর্ব ঐশ্বর্যকে একত্রিত করে মনকে একবিন্দুতে নিয়ে এক ডাকে ভগবানের সাড়া জাগাবে। হে সাধু, যদি সাধনে রস পেতে চাও তবে যৌবনের কুঞ্জবনে কুঞ্জবিহারীর সাথে বিহারে রত হও।

২৪৪। গীতাশাস্ত্রের মূল শিক্ষা 'যোগ'। এখানে যোগ শব্দের অর্থ ভগবানের সহিত যুক্ত হওয়া, মিলিত হওয়া, সম্বন্ধ স্থাপন করা। গীতা শেখাচ্ছেন ভগবানের সহিত জীবের মিলনের উপায়, বলছেন বিভুর সহিত অণুর সম্বন্ধ স্থাপনের উপায়। এ উপায়ের কথা, এই যোগের তত্ত্ব জীব জানে না। জানেন ভগবান। তাই গীতায় "শ্রীভগবান উবাচ", ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন। জীবের অজ্ঞাত তত্ত্ব ভগবান জীবকে জানিয়ে দিলেন। শ্রীভগবানের এই উপদেশসমূহকে মুখ্যত তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়—কর্ম জ্ঞান ও ভক্তি সম্বন্ধে উপদেশ। অর্থাৎ, কর্মযোগ—কোন্ কর্মদ্বারা কি ভাবে তাঁর সঙ্গে যুক্ত হওয়া যায়। জ্ঞানযোগ—জ্ঞান কি বস্তু এবং কোন জ্ঞানে তাঁকে জানা যায়। ভক্তিযোগ—অনন্যা ভক্তি দ্বারা তাঁকে লাভ করা যায়। শুধু তাই নয় শ্রদ্ধাবান ভক্ত ভগবানের অতীব প্রিয়। নিষ্কাম কর্ম দ্বারা তথা ভগবদুদ্দেশে কর্মসম্পাদন দ্বারা শুদ্ধজ্ঞান লাভ হয় এবং জ্ঞানমিশ্রিত কর্মদ্বারা ভক্তিলাভ। জ্ঞানযোগেও কর্ম আছে, ভক্তিযোগেও কর্ম আছে। কর্মই প্রধান। কর্ম ছাড়া যোগ হয় না। শ্বাস-প্রশ্বাস কর্ম থেকে আরম্ভ করে যত কর্মই আমরা করি, সব কর্মই ঈশ্বরকে অর্পণ করে করলে যোগপথ সহজে পাওয়া যায়। শুধু মুখে ভগবানকে চাইলে ভগবানকে চাওয়া হয় না, পাওয়া তো দূরের কথা। অর্থ ও কাম পূরণের জন্য আমরা তদনুযায়ী কর্ম তৎক্ষণাৎ করি। কিন্তু ধর্ম বা মোক্ষের জন্য শুধু মুখেই জল্পনা করি। কর্ম না করলে যেমন অর্থ ও কাম্যবস্তু পাওয়া যায় না, তেমনি কর্ম না করলে ধর্ম ও মোক্ষলাভ কখনই হয় না। কর্ম-ই সাধনা, কর্ম-ই ভক্তির মূল।

২৪৫। পূজাঘরে বসে শুধু ফুল তুলসী, বিল্বই দেবতার চরণে অর্পণ করবে না, তার সঙ্গে আপন অন্তরটিও তাঁর পদে নিবেদন করবে। কোন পূজাই পূর্ণ হবে না যদি না তাতে আত্মসমর্পণ

থাকে। প্রথমদিকে মানসপূজায় আমাদের মন আসে না, তাই পত্র পুষ্প দিয়ে পূজা আরম্ভ করি। গুরু-গোবিন্দের কৃপায় যখন মনের জড়তা খানিকটা কেটে যায় তখন পূজার মূল লক্ষ্য বুঝা যায়, পত্র পুষ্পের বদলে হৃৎপদ্ম নিবেদিত হয়। যদি রাশি রাশি ফুল দিলেই দেবতা খুশী হতেন তবে যে গাছে অসংখ্য ফুল ফোটে সেই গাছটাই আগে ভগবানকে পেয়ে যেত।

দেবতাকে ভোগ নিবেদনের সময়ে মনের সকল মাধুরী তাতে মিশিয়ে দিবে। মনের সব ভোগবাসনা তাঁকে নিবেদন করবে। আমরা কিছু পাবার আশা নিয়ে দেবতাকে কিছু নিবেদন করি। এটা পূজার পর্যায় পড়ে না। পূজার প্রকৃত উদ্দেশ্য—নিজকে বিলিয়ে দেওয়া। সম্পূর্ণভাবে রিক্ত হওয়া। রিক্ত হতে পারলেই ভক্তি আসবে। ভক্তিই ভগবানের আগমনবার্তা।

২৪৬। ভজনে প্রথম প্রয়োজন মনকে দ্বেষমুক্ত করা। মনের দ্বেষ হিংসা ঈর্ষা অসূয়া ক্রমে ত্যাগ করতে করতে এমন একটা সময় আসবে যখন পরম শত্রুকে দেখলেও পরম মিত্র মনে হবে। মানুষের জন্যই যদি হৃদয়ে একতিল স্থান না থাকে তবে সে হৃদয়ে দেবতার আসন পাতা যাবে কি? আগে সমস্ত বিভেদ ভুলে সব মানুষকে ভালবাস। দেবতা আপনি এসে ধরা দিবেন। ভজনপথে চলতে কখন কেউ অনর্থক বৈরীতা করতে পারে। তখন নিজে আরো ধীর স্থির হয়ে যাবে। আত্মস্থ হয়ে চিন্তা করবে নিজের কোন ভুল হয়েছে কি না। তোমার মন ইষ্টে নিবদ্ধ থাকলে সব বাধা আপনা থেকেই সরে যাবে। বাধার জন্য ভাবনা না করে সে সময়-টুকু ইষ্টচিন্তায় ব্যয় কর। বাধা যিনি দিয়েছেন তিনিই তা সরিয়ে নিবেন। এ সবই তাঁর পরীক্ষা।

২৪৭। এ প্রপঞ্চ প্রবঞ্চনাময়। মায়ার খেলা। প্রবঞ্চনা বুঝতে

পারলে তার ফাঁদে কেউ পড়ে না। প্রপঞ্চের প্রবঞ্চনায় না ভুলে প্রপঞ্চ-প্রণেতার শরণ লও। তবেই এ থেকে অব্যাহতি পাবে। তাঁর শরণ নিচ্ছ না বলে তিনি মায়াপিশাচীদ্বারা দুঃখ যন্ত্রণা দিচ্ছেন। দুষ্ট ছেলেকে সুপথে আনতে শাস্তি দিতেই হয়। ভগবানের এ লীলার উদ্দেশ্যও তাই। তিনি এই মায়ার খেলা খেলছেন আমাদের মায়াতীত করার জন্য। তিনি মায়াদ্বারা মায়া-কণ্টক তোলেন।

২৪৮। ভগবান শরণাগতপাল। শরণাগতকে পালন করাই ভগবানের ব্রত। যে কেউ তাঁর শরণ নিলে ভগবান তাকে রক্ষা করেন। এ সময়ে তিনি শরণাগতের কোনরূপ পাপপুণ্যের ভাল-মন্দের বিচার করেন না। ভগবানের এই শরণাগতপাল রূপটি একবার মনেপ্রাণে ধরে নিতে পারলে মহাপাপীরও ভয়ের কারণ থাকে না। আমরা যখন অঘ অনর্থ দুষ্কৃতি দুষ্কর্মের হাত থেকে কোন উপায় পরিত্রাণ পাই না তখন একমাত্র বাঁচার পথ ভগবানের শরণাগতি। কোথাও যেতে হবে না, কোন অনুষ্ঠান করতে হবে না, শুধু মনেপ্রাণে ভগবানের শরণাগত হওয়া। পূর্ণরূপে তাঁকে আত্ম-সমর্পণ করা। মনপ্রাণ বস্তুটি ভগবানের আশ্রয়নীড়ে রেখে দেওয়া। পাপতাপের অগম্য পুরীতে আত্মাকে রেখে দেওয়া। সর্বদা ভগবানের কৃপাছায়ায় বাস করা। একবার এখানে প্রবেশ করতে পারলে জীবের অনাদি অনন্ত জ্বালা জুড়িয়ে যায়। মহাভয় বিদূরিত হয়ে সদাসুখ জাগ্রত হয়। পাপতাপকে ফাঁকি দেবার এর চেয়ে সহজ উপায় আর নেই।

২৪৯। শাস্ত্রবাক্য ভগবদ্‌বাক্য গুরুবাক্য অনুসারে যখন চলবে তখন মনে করবে গুরু বা গোবিন্দ সামনে দাঁড়িয়ে তোমায় উপদেশ দিচ্ছেন। এতে শুধু গুরুগোবিন্দে নিষ্ঠাভক্তি বাড়বে না, সৎপথে চলতেও সাহস বাড়বে। দেহমনপ্রাণে এক অভূতপূর্ব শক্তি

সঞ্চারিত হবে। সব সময়ে চিন্তা করবে, দর্শন করবে—গুরুমূর্তি তোমার সাথে সাথে আগে আগে চলছেন, তুমি তাঁর পিছু পিছু চলছ। যিনি তোমাকে পথ দেখিয়ে নিচ্ছেন পথের ভাবনা তাঁর।

২৫০। তুমি যে কাজ একা করতে পার না তাতে কেউ সাহায্য করলে নিশ্চয়ই তোমার আনন্দ হয়! যে ভাবনার শেষ তুমি পাচ্ছ না তখন কেউ সঠিক সিদ্ধান্তটি জানিয়ে দিলে তোমার হাতে চাঁদ পাবার অবস্থা হয় না কি? আবার এমন নির্ভরযোগ্য বান্ধবটিকে যদি তোমার দরকারমত সর্বদা হাতের কাছে পাও তবে জীবনটা ধন্য মনে কর না কি? সর্বকালের এমন বান্ধবটি কিন্তু তোমার ভিতরেই বসে আছেন! তুমি তাঁকে বান্ধব বলে জানছ না। তাঁর সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন করছ না। তাঁর সঙ্গে কোনই যোগাযোগ রাখছ না। তাই তোমার এই অসহায় অবস্থা। এত দুঃখভার। দুর্বলের বলকে ভুলে গিয়ে, পরম আপনকে অনাদর করে শুধু অহংকারের জোরে পথ চলতে গিয়ে পথ বন্ধ হয়ে গেল। এর সমাধান কেবল ভিতরের ঐ বন্ধুটিই করতে পারেন। অন্য কারো দ্বারা সম্ভব নয়। তবে, গুরুও সমাধান করতে পারেন যদি তাঁকে বকলম দাও।

২৫১। গঙ্গার ভিতর ঘর করে বাস করলেও পাপ ছাড়ে না যদি মা গঙ্গার প্রতি শ্রদ্ধাভক্তি না থাকে। দিনরাত হরিনাম নিলেও মুক্তি হবে না যদি 'যেই নাম সেই কৃষ্ণ'—এই জ্ঞান না জন্মে। জ্ঞান ছাড়া মুক্তি নেই।

২৫২। পাপ করে কে? দেহ না মন? পাপ প্রথম করে মন। তারপর দেহ। দেহে পাপ থাকে না। পাপ থাকে মনে। মনে মনে কারো অনিষ্টচিন্তা করলেই পাপ হয়ে গেল। অনিষ্ট কাজ না করতেই পাপ করা হয়ে গেল। অনিষ্ট করলেও যে পাপ, অনিষ্ট

চিন্তায়ও সেই পাপ। দেহে পাপ করার চেয়ে মনে পাপ করা বেশী ক্ষতিকর। দেহ অশুচি হওয়ার চেয়ে মন অশুচি হলে অধিক ক্ষতি। মনে পাপ না রেখে দেহদ্বারা পাপ করলে সে অতি তুচ্ছ। কখন কখন তার জন্য কোন ফলও ভোগ করতে হয় না। কিন্তু মনের পাপে পরিত্রাণ নেই। শুধু তাই নয়। মনের এই পাপবীজ বিরাট আকার ধারণ করে অতিশীঘ্র ইহকাল পরকাল ধ্বংস করবেই। অপরের অনিষ্টচিন্তায় আপন অনিষ্ট অবধারিত।

২৫৩। জাগতিক ধনদৌলত হস্তান্তরিত হয়। কিন্তু পারমার্থিক সম্পদ সর্বদাই স্বোপার্জিত। গুণবান পিতার জমিদারী অগুণবান পুত্র কিছুকাল ভোগ করতে পারে। কিন্তু পরমার্থের বেলায়' এ নিয়ম অচল। জমিদারের পুত্রকে যত সহজে জমিদার হতে দেখি, সাধুর পুত্রকে তত সহজে সাধু হতে দেখি না। পূর্বসুকৃতির ফলে কেউ সাধুর গৃহে জন্ম নিয়ে ভজনগুণে সাধু হয়। তাই আমরা কখন সাধুর পুত্রকে সাধু হতে দেখি। চুরি না করেও চোরাই মালের ভাগ পাওয়া যায়। কিন্তু ভজন না করে ভজন-সম্পদের কণাও লাভ হয় না।

২৫৪। এখন যারা বড় বড় অঙ্ক কষতে পারে তারা একদিন ছোট ছোট অঙ্কে হাত দিয়ে আরম্ভ করে ছিল। ক্ষুদ্র জয় দিয়েই বৃহৎ জয়ের সূত্রপাত। বিরাট ভগবানকে জানার ইচ্ছা হলে ক্ষুদ্রবস্তু জানা দিয়ে আরম্ভ করতে হয়। সৃষ্টিকর্তাকে জানার সূত্রপাত তাঁর সৃষ্টপদার্থকে জানার মধ্য দিয়ে। আগে ভগবানের সৃষ্ট জীবজন্তুর ভাব জান, তাদের প্রেম পাও, তবে ভগবানের প্রেম লাভের কথা চিন্তা করবে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বস্তু জানতে বুঝতে দর্শনশক্তি অনুভূতিশক্তি ক্রমশঃ বাড়বে। তখন বিরাটকে দেখা সম্ভব হবে।' ব্রহ্মানুভূতি লাভের প্রথম পাঠ ক্ষুদ্রানুভূতি। বিভুকে জানার আগে অণুকে জানা। ব্রহ্মাণ্ডকে জানার আগে ভাণ্ডকে (দেহকে) জানা।

ইহাই দর্শনক্রম। ক্রমে ক্রমে যে প্রাপ্তি তাই স্থায়ী প্রাপ্তি। হঠাৎ প্রাপ্তির ঝটিতি বিলুপ্তি।

২৫৫। পরশপাথরের পরশে লোহা সোনা হয়। সাধুর পরশে অসাধুও সাধু হয়। পুণ্যের পরশে পাপও পুণ্য বলে গণ্য হয়। ষড়-রিপুর মধ্যে 'লোভ'ই আগে পা বাড়ায়। তার পিছু পিছু অন্য পঞ্চজন চলে। মানুষের লোভ যদি না থাকে তবে কাম ক্রোধ মোহ মদ মাৎসর্য এরা কোনই অঘটন ঘটাতে পারে না। লোভের ধর্ম হচ্ছে লাভ করিয়ে দেওয়া। লোভ থেকে লাভ। এমন শক্তি-মান দানবকে যদি সৎ বস্তুর দিকে লেলিয়ে দেওয়া যায় তবে সৎ-চিৎ-আনন্দময় বস্তু সহজেই হাতের মুঠোয় আসে। আসলে সৃষ্টি-কর্তা যে আমাদের এই ছয়টি ব্রহ্মাস্ত্র দিয়ে পাঠিয়েছেন তার মূল উদ্দেশ্য হল, এদের সাহায্যে ভজনপথকে বিপদমুক্ত রাখা। এগুলির সদ্‌ব্যবহার দ্বারা ভজন ত্বরান্বিত করা। কিন্তু এ সব উদ্দেশ্য ভণ্ডুল করে দিচ্ছেন মায়াশক্তি। মায়াশক্তির জালে পড়ে আমরা ওগুলির উলটো ব্যবহার করে ভজনপথকে আরো বিপদ্‌-সংকুল করে নিয়েছি। ষড়রিপুর যে কোন একটির পাল্লায় পড়ে কত মুনি ঋষি যে পথচ্যুত হয়েছেন তার হিসেব নেই। তেমনি অনেক সুদুরাচারও ঐ সব দুর্দমনীয় রিপুর একটি দ্বারা যখন ভগবানের সহিত কোন রকম সম্পর্ক স্থাপন করতে পেরেছে তখনই তারা যোগধ্যানের অলভ্য বস্তু পরমপদ লাভ করে ভজন-জগতে অমর হয়ে আছে। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি মাৎসর্যবশতঃ পুতনা রাক্ষসী যোগীরও দুর্লভ স্থান লাভ করেছিল। মহা অনিষ্টকারী ষড়রিপুকে ইষ্ট সাধনে লাগাতে পারলে ভজন সহজ হয়। তখন তাপপ্রদায়ী ষড়রিপু শুভদায়ী হয়। ভগবানের সহিত যুক্ত হবার এও একটি কৌশল। মনেহয় সহজিয়া ভজনপদ্ধতির মালমসলা এখান থেকেই সংগ্রহ করা হয়েছে।

২৫৬। শ্রীশ্রীকালী এবং শ্রীরাধা একই পরাশক্তির দুটি রূপ। একই বস্তুর দুটি স্তর। পরমপদ লাভে বাধাস্বরূপ সত্ত্বরজোতমাদি গুণময় কালিমা নাশ করেন বলে কালী। তাই তাঁর হাতে অশুভ নাশ করার প্রতীক খড়্গ। যে ত্রিগুণের অতীত পরমপদ সেই ত্রিগুণের অধিশ্বরী মা কালী। তিনি প্রসন্না হলে তবেই সাধক গুণ-গণ্ডির বাইরে যেতে পারে। নতুবা নয়। ত্রিগুণের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়াই মুক্তি। একমাত্র মা-ই মুক্তিদাত্রী। মুক্তিদাতা বলে কেউ নেই। এই কালীশক্তি সর্ব বস্তু সর্বগুণের ভিতর নিরাকাররূপে অদৃশ্যরূপে সর্বদা বিরাজ করেন বলে তিনি বিবসনা। এই শক্তি যখন পুরুষোত্তমকে আহ্লাদয়ে আনন্দদান করেন তখন তিনি হ্লাদিনী শক্তি অর্থাৎ শ্রীরাধা। এই হ্লাদিনী শক্তির বা আনন্দের একটা বহিঃপ্রকাশ আছে, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপ আছে যা লক্ষ করা যায়। আনন্দের এই বহিঃপ্রকাশকে বুঝাবার জন্যই শ্রীরাধার তপ্তসোনার রং। পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ যে গুণাতীত তত্ত্ব তা বুঝাবার জন্য তাঁর অসীম নীলিম আকাশের রং। হ্লাদিনী শক্তি যে সচ্চিদানন্দ হতে উদ্ভূত তা বুঝাবার জন্য শ্রীকৃষ্ণের জলদবরন আর শ্রীরাধার বিদ্যুৎবরন। মেঘ হতেই বিদ্যুতের জন্ম। বিদ্যুতের আলোতে মেঘের স্থিতি জানা যায়। রাধার আলোতে শ্যামকে জানা যায়। একই পরা প্রকৃতি—কালীরূপে মুক্তিদাত্রী, রাধারূপে প্রেমদাত্রী। শক্তির সম্মতি ছাড়া শক্তিমানকে ছোঁয়া যায় না। শক্তিমানকে পেতে শক্তিই অবলম্বন। শক্তিকে ডিঙ্গিয়ে শক্তিমানকে পেতে চাওয়া যেন ফাঁদ পেতে চাঁদ ধরতে যাওয়া।

২৫৭। তেলভাণ্ডে ভরতি তেল। কিন্তু তা থেকে আলো পাওয়া যাবে না যদি একটা পলতে জ্বালা না হয়। তেলে পলতে দিয়ে আলো জ্বাললে তাতে তেলপাত্রের ভিতরটাও দেখা যাবে,

বাইরেরদিকটাও দেখা যাবে। ব্রহ্মময় জগতে ব্রহ্মের ভিতর ডুবে থেকেও আমাদের ব্রহ্মজ্ঞান হবে না, যদি গুরুরূপ পলতে না জ্বালাই। ব্রহ্মভাণ্ডে সদ্‌গুরুরূপ পলতে দিয়ে তাতে ভক্তিবহ্নি ধরিয়ে দিলে সে আলোতে আত্মদর্শনও হবে ব্রহ্মদর্শনও হবে।

২৫৮। ভুলেও সুখের সন্ধান করো না। সুখ যদি তোমাকে খুঁজে নেয়, নেক। নিজেথেকে তাকে খুঁজ না। খুঁজতে গেলেই দুঃখ তোমার পিছু নেবে এবং সুযোগ বুঝে তোমার উপর জুলুম করবে। স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে দুঃখকে কেউ আবাহন করে না বলে দুঃখের বেশ একটা আক্রোশ-অভিমান আছে। তাই সে ওৎপেতে থেকে দেখে, কে তার বন্ধু সুখকে খুঁজছে। তেমন কাউকে পেলে দুঃখ তার ঘাড় মটকানোর জন্য প্রস্তুত হয়। দুঃখের হাত থেকে বাঁচার উপায় সুখের পিছু ধাওয়া না করা।

২৫৯। কভু যদি কারো কাছ থেকে আঘাত পেতে না চাও তবে ভুলেও কারো নিকট কিছু প্রত্যাশা করো না। প্রত্যাশা থাকলে হতাশা আসবেই। কিছু চেও না, আঘাত পাবে না।

২৬০। ভালবাসা যদি অক্ষয় করে রাখতে চাও তবে ভালবাসার কথা ভালবাসার পাত্রকে কভু বলবে না। জানাজানি হলেই ভাল-বাসার মৃত্যু। ভগবানকে যদি ভালবাস তবে সে কথা মুখে এনো না। ভজন করলে লোকে তা জানবে না। ইষ্টমন্ত্র যেমন অপরকে বলতে নেই, ভজনও তেমনি অপরকে জানাতে নেই। গুহ্য তত্ত্ব ধরতে চাও তো নিজে গুপ্ত হয়ে যাও।

২৬১। শান্তি চাও তো শামুকের মত হও। নিজেকে নিজের ভিতর গুটিয়ে নাও।

২৬২। মনের দরজা খুলে দেখ, ভাণ্ডার পরিপূর্ণই আছে। রাজা

হয়ে ভিখারী সাজতে কি বিবেকে বাধবে না! যে আত্মাকে অবমাননা করে সে কি আত্মদর্শন আশা করতে পারে!

২৬৩। খাঁটি প্রেমের কণামাত্র লাভ হলেই বুকখানা কানায় কানায় ভরে ওঠে। তখন পার্থিব অপার্থিব কোন বস্তুর চাহিদা থাকে না। আমরা বাইরে যে প্রেমকে খুঁজে বেড়াই সে প্রেম নয়, কাম। কাম বাইরের বস্তু। প্রেম অন্তরের বস্তু। প্রেমিক কখনো বাইরে প্রেম খুঁজে মরে না। বাইরে যে প্রেম খোঁজে তার নিজের ভিতরেই কাম লুকিয়ে আছে।

২৬৪। জপের সঙ্গে সঙ্গে কৃষ্ণসঙ্গসুখ আস্বাদন করতে অভ্যাস করলে শুধু যে নীরস জপ সরস হয় তাই নয়, রসময়ের সন্ধানও শীঘ্র পাওয়া যায়।

২৬৫। যে হরিভজন করে সে সর্বদাই হরিভজন করে। তার প্রতিটি কর্মই হরিভজন। তার আহারনিদ্রাও হরিভজন। ভজন ভিন্ন তার অন্য কর্ম নাই। বাইরে তার সংসার চাকুরী হাট বাজার, ভিতরে ভজনানন্দের আনন্দবাজার। যারা অখণ্ড ভজনকে খণ্ড করে তারাই কেবল সকাল সন্ধ্যায় সময় খোঁজে। ভজন তৈলধারাবৎ নিরবচ্ছিন্ন।

২৬৬। যে মহামায়া কৃপণার মত সত্যস্বরূপকে ঢেকে আগলাচ্ছেন, সেই মায়াই পূজিতা হলে প্রসন্না হয়ে যোগমায়া হন। মহামায়ারূপের নিজ আবরণ উন্মোচন করে তিনিই আবার সত্যস্বরূপকে প্রকাশ করেন। ইনি-ই যোগমায়ারূপে নির্গুণের সহিত সগুণকে যুক্ত করে দেন। যখন তমোগুণের আবরণে ত্রিজগৎ ভুলিয়ে রাখেন তখন তিনি মহাকালী। যখন রজোগুণে রিপু জয় করেন তখন তিনি মহালক্ষ্মী বা দুর্গা। যখন সত্ত্বগুণে যুক্ত করেন তখন মহাসরস্বতী বা যোগমায়া। সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের তিনটি ঘুড়ির তিনটি নাটাইও তাঁর হাতে। এ বিশ্ব-রঙ্গনাট্যে তিনিই নাট্যের গুরু। মা-ই গুরু।

২৬৭। ভঙ্গই দুঃখ। অভঙ্গই আনন্দ। কোন আশা বা সুখ ভঙ্গ হলেই দুঃখ। যতক্ষণ তা অভঙ্গ অটুট থাকে ততক্ষণই আনন্দ। যা কখনও ভঙ্গ হয় না, চিরকাল অভঙ্গ অখণ্ড থাকে তাই চরম সুখের। একমাত্র সদ্‌বস্তুই সদা অভঙ্গ অখণ্ড অবিচ্ছিন্ন থাকে। সদ্‌বস্তুই সদাসুখের।

২৬৮। তীর্থক্ষেত্রের পাণ্ডা বা পূজারীকে তীর্থদেবতার প্রতিভূ বা তদ্ভক্ত জ্ঞানে শ্রদ্ধা না করলে তীর্থদেবতার কৃপালাভ হয় না। তাই পাণ্ডারা তীর্থগুরু। এই জ্ঞানে তীর্থগুরু গ্রহণ করলে তীর্থদর্শন সফল হয়। তীর্থে যাবার মূল উদ্দেশ্য—মনকে তীর্থময় করা। তীর্থভ্রমণ দ্বারা মনকে পরিপূর্ণভাবে তীর্থময় করতে পারলে তখন ঘরেই মহাতীর্থ, মনেই ত্রিবেণী। তীর্থ মানুষকে মনীষী করে। তীর্থ ত্রিবিধ —

১) স্থাবরতীর্থ—গঙ্গাদি পুণ্যবারি ও পুণ্যক্ষেত্রাদি।

২) জঙ্গমতীর্থ—সাধু গুরু বৈষ্ণব প্রভৃতি ব্রহ্মজ্ঞগণ।

৩) মানসতীর্থ—সত্য ক্ষমা দয়া দম দান ব্রহ্মচর্য, জ্ঞান প্রভৃতি মনঃশুদ্ধিকারক বস্তুগুলি।

তীর্থ মানবকে ত্রিগুণাতীত করে। আবার ঐ ত্রিগুণাতীত সাধুর স্পর্শে স্বয়ং তীর্থ আপনাকে পবিত্র মনে করে।

২৬৯। দিনের শেষলগ্নে সন্ধ্যা আগমনের পূর্বমুহূর্তেই সাধারণতঃ বিধ্বংসী ঝড় ওঠে। বছরের শেষে নূতন বৎসর আরম্ভের মুখেই কালবৈশাখী ঝড় আসে। এখন আমরা কলির শেষলগ্নে পৌঁছেছি। সম্মুখে নূতন যুগ আসছে। প্রলয়ঝড় আরম্ভ হতে আর দেরি নেই। এ মহাপ্রলয় থেকে বাঁচতে চাও তো বেদরূপ বিরাট বটবৃক্ষের আশ্রয় নাও। এখন আর পলাশ-শিমুলের মত শাখা-ধর্মের আশ্রয় নিলে চলবে না। বিরাট কিছুর অবলম্বন ছাড়া এ বৃহৎ ভয় নিবারিত হবার নয়।

২৭০। অধ্যাত্মজগতে "তত্ত্ব" শব্দটির একটি বিশেষ স্থান আছে, যদিও আমরা কুটুম্বের বাড়ীতে ভেট পাঠানো থেকে শুরু করে প্রায় সর্বক্ষেত্রেই এটির ব্যবহার করে থাকি। 'তত্ত্ব' শব্দের সাধারণ অর্থ হচ্ছে—তথ্য, সংবাদ, প্রকৃত অবস্থা ইত্যাদি। মূল অর্থে (তদ্+ত্ব ভাবে) দেখাযাবে—'তদ্' মানে ব্রহ্ম, আর 'ত্ব' মানে স্বভাব। অর্থাৎ ব্রহ্মের স্বভাব বা ব্রহ্ম বিষয়ক জ্ঞান, ব্রহ্মজ্ঞান। 'তত্ত্ব' শব্দটি ভগবানের বা ব্রহ্মের সর্ববিধ রহস্য-সূত্র বা প্রকাশ-শক্তির অনুসন্ধানে এবং তাঁর পরিচয়-পরিবেশনায় ব্যবহৃত। সুতরাং 'তত্ত্ব' শব্দের মূল অর্থ হল ব্রহ্মজ্ঞান। নির্গুণ নিরাকার ব্রহ্মকে জানতে গিয়ে বুঝতে গিয়ে নানা মুনি নানা খবর আহরণ করেছেন এবং নানা ভাষায় তা প্রকাশ করেছেন। এ সমস্তই তত্ত্ব শব্দের আওতায় পড়ে। বিভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শক্তি যখন বিভিন্ন দিক থেকে এক অসীম অনন্ত সত্তাকে জানবার চেষ্টা করে তখন স্বাভাবিক নিয়মেই অনুসন্ধানকারীর সামর্থ্য অনুযায়ী ফল লাভ হয়। যে যেমন পাত্রটি নিয়ে নদীতে জল আনতে যায়, সে সেই পরিমাণে জল আনতে পারে। ছোট বড় সব পাত্রের জলই নদীর জল। তবু পরিমাণের পার্থক্যহেতু তাদের পিপাসা মেটাবার শক্তিতেও পার্থক্য থাকবে। সব তত্ত্বই সমভাবে সকলার মন ভরিয়ে দিতে পারে না। অন্য দিকে, তত্ত্ব দ্বারা তত্ত্বজ্ঞের অন্তর্জগতের পরিচয় জানা যায়। যিনি যত গভীরে প্রবেশ করতে পেরেছেন তিনি তত স্বাদু রস আহরণ করতে পেরেছেন। ভগবৎ তত্ত্ব আস্বাদন করাই ভগবংরস আস্বাদন করা। তত্ত্বরূপ ছিপ ফেলে ব্রহ্মরূপ জলাশয় থেকে রসরূপ মাছ ধরা। তত্ত্বে যিনি লোভ জন্মাতে পেরেছেন তিনিই ভগবৎ কৃপা লাভ করেছেন।

২৭১। আমাদের প্রত্যেকের ভিতর সত্ত্ব রজঃ এবং তমঃ এই তিনটি গুণই আছে। কারো একটি খুব বেশী, অন্য দুটি এত

কম যে নেই বললেই হয়। কম-বেশী হিসাবে গুণগুলি আমাদের ভিতর থাকে। এমন কেউ নেই যার ভিতর কোন একটি গুণ একদম নেই। গুণময় দেহ হতে কোন একটি গুণকে সমূলে উচ্ছেদ করা যায় না। তবে তাকে সম্পূর্ণরূপে নিষ্ক্রিয় নির্বিষ করে রাখা চলে। আবার কোন অসাবধান মুহূর্তে সেটি নিজরূপ ধরতেও পারে। পরিমাণের তারতম্য হিসাবে যার ভিতর সত্ত্বগুণ প্রধান এবং অপর দুটি কম বা অপ্রধান তাকে সাত্ত্বিক প্রকৃতির লোক বলি। এইরূপ যাদের রজো বা তমো প্রধান তাদের রাজসিক বা তামসিক লোক বলি। প্রধান গুণের প্রধান কাজ হল—বাইরের সমধর্মী গুণকে সহজে আকর্ষণ করা এবং গ্রহণ করা। ফলে সাত্ত্বিক প্রকৃতির লোক অপর সাত্ত্বিক লোকের প্রতি সহজেই আকৃষ্ট হয়। রাজসিক এবং তামসিকের পক্ষেও একই নিয়ম। সুতরাং আমরা কে কোন গুণের কর্তৃত্বাধীনে আছি তা সহজেই বুঝতে পারি কোন গুণের প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছি তা দেখে। এতটুকু আত্মানুসন্ধান করলেই আমরা নিজের দোষ ত্রুটি বুঝে তা সংশোধন করে সত্ত্বগুণ গ্রহণে অগ্রসর হতে পারি। গুরু বা উপদেষ্টা আঙ্গুল দিয়ে আমার দোষ ত্রুটি যতই দেখিয়ে দিন না কেন, যতক্ষণ না আমি আমার দোষ বুঝতে পারছি ততক্ষণ পর্যন্ত সেগুলি ত্যাগ বা সংশোধন সম্ভব নয়। আমার কাজ আমার কাছে দোষদুষ্ট হলেই সে কাজ থেকে নিবৃত্ত হবার আন্তরিক চেষ্টা আসবে। এভাবে নিজ চেষ্টায় নিজেকে উজ্জীবনের পথে নিয়ে যেতে হয়। ব্রহ্মজ্ঞানের আগে চাই আত্মজ্ঞান। আত্মজ্ঞানের আগে চাই আত্মানুসন্ধান।

২৭২। বিগ্রহদেবতার আরতিপ্রদীপের তেজ-তাপ চোখে লাগাও আর প্রার্থনা কর, যেন ঐ পুণ্যতেজস্পর্শে তোমার

অন্ধত্ব দূর হয়ে দিব্যদৃষ্টি লাভ হয়। প্রদীপশিখাস্পর্শকে দেবতার স্পর্শ মনে করবে।

২৭৩। সখীরা যুবতী। মঞ্জরীরা অল্পবয়স্কা। শ্রীগুরু স্বরূপতঃ মঞ্জরী। সখী আর মঞ্জরীর মূল প্রভেদ হল—রাধাকৃষ্ণের কুঞ্জ-বিলাসকালে কুঞ্জের ভিতরে একমাত্র অল্পবয়স্কা মঞ্জরীরাই প্রবেশ করতে পারে যুগলের সেবার জন্য। সখীদের এ অধিকার নেই। তাই কুঞ্জসেবার অধিকার কেবল মঞ্জরীর আনুগত্যেই লাভ হতে পারে। তাদের অনুগ্রহ হতে বঞ্চিত হলে কুঞ্জসেবার অধিকারও হারাতে হয়। সুতরাং ভজনে কাম্যবস্তু লাভের পরেও গুরুকৃপার আবশ্যক সেই লব্ধবস্তুকে রক্ষার জন্য। গুরুরূপে শ্রীগোবিন্দ ভক্তের যোগ ও ক্ষেম (অপ্রাপ্ত বস্তুর প্রাপ্তি এবং প্রাপ্ত বস্তুর সংরক্ষণ ভার) বহন করেন।

২৭৪। বিধি হচ্ছে—যে কোন পূজা পাঠ যাগযজ্ঞাদির প্রারম্ভে সিদ্ধিদাতা শ্রীশ্রীগণেশদেবের পূজাধ্যান করা। সর্বাগ্রে সিদ্ধি-দাতার পূজা না হলে সে পূজানুষ্ঠান সিদ্ধ হয় না। মন্ত্রদাতা গুরুর পূজা গণেশপূজার আগেই করে নিতে হয়। গুরুর আশীর্বাদপুষ্ট হয়ে পূজানুষ্ঠান করলে অনুষ্ঠানজনিত সব দোষ ত্রুটি খণ্ডন হয়ে যায়। গুরু হৃষ্ট থাকার জন্য কোন অমঙ্গল ঘটে না। "কৃষ্ণ রুষ্ট হলে গুরু রাখিবারে পারে। গুরু রুষ্ট হলে কৃষ্ণ রাখিবারে নারে॥" ত্রিসন্ধ্যাবন্দনাদিতেও সর্বাগ্রে গুরুর ধ্যান অবশ্য কর্তব্য। গুরু আর গণপতি অভেদ তত্ত্ব। গণপতির পূজা না করলে গুরুপূজা পূর্ণ হয় না। গণপতির ধ্যান করলে সিদ্ধি সুনিশ্চিত হয়।

২৭৫। ভজনের প্রধান অঙ্গ অনুধ্যান—সর্বক্ষণ মনকে ইষ্টচিন্তায় নিবদ্ধ রাখা। অনুধ্যান না হলে অনুভূতি অসম্ভব। সর্বক্ষণ

ভগবদ্চিন্তার ফ:ল হৃদয়ে ভগবানের একটি রূপ বা ছবির ছাপ পড়ে। শ্রদ্ধাভক্তিযুক্ত অনুশীলনের গাঢ়তায় সেই ছাপ স্পষ্ট হতে হতে এক সময়ে অন্তরে তাঁর সাড়া পাওয়া যায়। তারপর কি করণীয় তা অনুভূতি থেকেই জানা যাবে। পরের পথ পরমাত্মাই বলে দেবেন।

২৭৬। অবহেলা আর অসাবধানতাই ভজনপাত্রের বড় ছিদ্র, যা দিয়ে সব ভজনফল গলে পড়ে যায়। ভজনারম্ভের পূর্বে পাত্র নিচ্ছিদ্র করে না নিলে সারা জীবন ছিদ্র কলসীতে জলভরা ছাড়া অন্য কিছুই হবে না।

২৭৭। ধূলীময় ধরণীকে ঝাট দিয়ে যেমন ধূলীমুক্ত করা যায় না, মায়াময় জগতে বাস করে তেমনি মায়াশূন্য হওয়া যায় না। যতক্ষণ কায়া আছে ততক্ষণ মায়া আছে। মায়া দিয়েই কায়া তৈরী। এই মায়াই ভজনের বাধা। মায়াকে ভজনের সহায়কারিণী-রূপে বরণ করলে তবেই ভজন চলতে পারে। অন্যথায় ভজন অচল। মায়াকে মাতৃরূপে বরণ করে তাঁর কৃপা প্রার্থনা করলে তিনি প্রসন্না হয়ে বৈরীতা ত্যাগ করেন। প্রার্থনায় প্রতিকূল শক্তি অনুকূল হয়। মাতৃবোধনে—মাতৃবোধ সম্পাদনে মোহময়ী মা করুণাময়ী হন। সন্তানবিরূপা মা সন্তানবৎসলা হন।

২৭৮। মান পরিত্যাগ কর, মন সংযত হবে। মনের তেজ মানে। মান-ভারে মন ভারী হয়ে থাকে। মান-অপমানবোধ ত্যাগ করলে মন হালকা হতে থাকবে। মন প্রথমে হালকা, পরে সূক্ষ্ম তারপর অণু হলে অনুভূতি লাভ হবে।

২৭৯। সত্যই শুদ্ধ বস্তু। মনকে শুদ্ধ শোধন করতে হলে সত্যের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করবে। সর্বদা সত্য কথা, সত্য

আচরণ, সত্য ভাব অবলম্বন করবে। সর্বদা এই ধ্যান রাখবে —সত্যস্বরূপ আত্মা ভিতরে জাগ্রত আছেন। সত্যেই তিনি সুখী হন, প্রীত হন। অসত্যে অসুখী হন। তিনি খুশী হলেই আত্মদর্শন। তাঁর প্রীতিতেই জগৎ প্রীত হয়।

২৮০। হিমাচলে দেবাদিদেব অমরনাথ আর নীলাচলে পুরুষোত্তম জগন্নাথ। সুউচ্চ আর সুসমতল। বহির্লোক আর অন্তর্লোক। এ দুটি তত্ত্বকে একই ভক্তিসূত্রে গাঁথবার চেষ্টা করবে। এ তত্ত্বদুটি ভজনের দুটি দিগ্‌দর্শন। উচ্চে দুর্গম দুর্লঙ্ঘ্য গিরিশ্রেণী পরিবেষ্টিত হিমগিরিগহ্বরে হিমশুভ্র স্বয়ম্ভু অনাদিকাল ধরে ধ্যানমগ্ন। নিম্নে প্রেমসায়রের সুগম্য সমতল বেলাভূমে নাতিশীতোষ্ণ দেউলে সদাচঞ্চল লীলানটরাজ রস-লীলায় লগ্ন। শিব বিরাজে শৈলভূমে, মাধব বিহরে বেলাভূমে। স্বয়ম্ভু-বিগ্রহ প্রকৃতিজাত, মাধব-অঙ্গ ভক্তরচিত। স্বয়ম্ভুতে শক্তি প্রধান, জগন্নাথে ভক্তি প্রধান। শিবে হৈম-কাঠিন্য, মাধবে নবনীত লাবণ্য। শুভ্র সরল স্বয়ম্ভু শুদ্ধসত্ত্বগুণের প্রতীক, দারুময় নীলমাধব নির্গুণব্রহ্মের প্রতীক। অমরনাথ পরম বৈষ্ণবতত্ত্ব, জগন্নাথ পরম বিষ্ণুতত্ত্ব। ধ্যানী মৌনী শিব আস্বাদয়ে রামনাম। জগন্নাথ আস্বাদয়ে ভক্তি-প্রেম-কাম। শিবতত্ত্বের সুকঠিন আবরণে মাধবের মাধুর্যরস সম্পুটিত। শিব-শক্তির অমর যোগরহস্য গুপ্ত গুহায় নিহিত। মাধবের অনন্ত প্রেমবৈচিত্ত্য প্রকাশ্যে প্রকটিত। বৈষ্ণবতত্ত্বে পৌঁছতে বিপদসংকুল দুর্গম গিরিপথ। বিষ্ণুতত্ত্বের পথ অতীব সরল সহজ সুগম। অগ্রে বৈষ্ণবতত্ত্ব জয়, পরে বিষ্ণুতত্ত্বে লয়। অমরত্বের পরে প্রেমতত্ত্ব।

২৮১। আপন আত্মাকে অসম্মান করাই ভগবানকে অবমাননা করা। যে নিজকে সম্মান করে না, সে অপরকেও সম্মান জানাতে পারে না। সত্যই সম্মাননার সার বস্তু। সত্যাশ্রয়ী

হলে একসঙ্গে নিজেকে এবং অপরকে সম্মান করা হল। শুধু সত্যকে জয় করলেই শত শত জনকে জয় করা হয়। মিথ্যার এক মুখ, সত্যের শত মুখ।

২৮২। ব্রহ্ম নিঃসঙ্গ। ব্রহ্মের কোন সঙ্গী সাথী নেই। বিশ্বে ব্রহ্ম ছাড়া দ্বিতীয় বস্তু নেই বলেই ব্রহ্ম সদাই একাকী। তদ্রূপ ব্রহ্মজ্ঞও নিঃসঙ্গ নিঃসম্পর্ক নিঃস্পৃহ।

২৮৩। নির্গুণ ব্রহ্ম ছাড়া আর সবই প্রকৃতি। অর্থাৎ সগুণ-ব্রহ্ম প্রকৃতিময়। কালী লক্ষ্মী দুর্গা ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব সবই প্রকৃতি। সবাই সগুণ ব্রহ্ম।

২৮৪। তুমি যদি বৃক্ষকে কৃষ্ণ ভাব এবং অন্য কেউ যদি কৃষ্ণকে বৃক্ষ ভাবে তবে কার কি রকম লাভ হবে? অবশ্যই ভাবনা অনুযায়ী লাভ। কৃষ্ণ ভাবনায় কৃষ্ণ লাভ, বৃক্ষ ভাবনায় বৃক্ষ লাভ। সাক্ষাৎ কৃষ্ণ পেলেও কৃষ্ণলাভ হবে না যদি ভাবনা কৃষ্ণময় না হয়। মহাজনগণ ভাবনাকেই অমৃত বলেছেন। ভাবনামৃত। ভাবনাই অমৃত। ভাবনা দ্বারাই অমৃত লাভ। ভাবনা দ্বারাই অমৃত আস্বাদন। সব আবরণ ভেদ করে ভাবনা অন্তরে পৌঁছায় অমৃত আহরণে। অমৃতের সঙ্গে ভাবনাকে যুক্ত করলেই ভাবনামৃত।

২৮৫। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দৃশ্যপটে ভগবদ্‌লীলা দর্শন করতে অভ্যাস করবে। ক্ষুদ্র-দর্শন থেকেই মহৎ-দর্শনে পৌঁছবে। বাহ্যদৃষ্টিতে না দেখে অন্তর্দৃষ্টিতে দেখবে। প্রথম প্রথম বিফল হলেও নিরাশ হবে না। ষোল-আনা মন এক বিন্দুতে কেন্দ্রিভূত হলেই আত্ম-দর্শন শুরু হবে।

২৮৬। হেয়-জ্ঞান এবং প্রেয়-জ্ঞান হতে মুক্ত হয়ে শ্রেয়-জ্ঞানে পৌঁছবে। তবেই প্রেমানন্দ পাবে। হেয়জ্ঞানে এবং প্রেয়জ্ঞানে

বিচার আছে, আনন্দ নেই। শ্রেয়-জ্ঞানে নিষ্ঠা আছে ভক্তি আছে, তাই আনন্দ আছে।

২৮৭। তোমার সত্ত্বগুণ প্রধান হলে কৃষ্ণের সত্ত্বগুণ ধ্যান করে কৃষ্ণময় হবে। আবার রজো বা তমো প্রধান হলে কৃষ্ণের সেই সেই গুণ ধ্যান করে কৃষ্ণময় হতে চেষ্টা করবে। এভাবে নিজ নিজ অধিকার অনুযায়ী ভজনপথে অগ্রসর হলে কারো কৃষ্ণ পেতে অসুবিধে থাকে না। কৃষ্ণ-ভজনের অধিকার সকলেরই আছে। হয়ত প্রশ্ন করবে—কৃষ্ণে তমো গুণ থাকে কি? আমি জানি—নিশ্চয়ই থাকে। তিনি পূর্ণতম ব্রহ্ম। কোন গুণের অভাব থাকলে তিনি পূর্ণতম হতে পারেন না। এমন কোন বস্তু হতে পারে না, যা আমার মধ্যে আছে কৃষ্ণে নেই। একারণে পুরুষোত্তমের ভজনা করা আমাদের সকলের পক্ষেই সহজ। যে কোন উপায়েই হোক কৃষ্ণের প্রতি আকৃষ্ট হও। একবার তুমি আকৃষ্ট হলে বাকী পথটা তিনিই আকর্ষণ করে নিয়ে যাবেন। আকর্ষণ করেন বা তুমি আকৃষ্ট হও বলেই তিনি কৃষ্ণ। একবার ভগবদ্‌মুখী হলেই, তাঁর দিকে মুখ ফিরালেই আকর্ষণ অনুভব হবে। তিনি সর্বদাই জীবকে আকর্ষণ করছেন। কিন্তু আমাদের মন তাঁর প্রতি নেই বলে সে আকর্ষণ অনুভব করতে পারি না। মন-ধ্যান দিলেই সে আকর্ষণে আকৃষ্ট হবে। ভগবদ্‌মুখী হলেই মুক্তাবস্থা। ভগবদ্‌-বিমুখী হলেই বদ্ধনদশা।

২৮৮। গুণের যেমন আকর্ষণশক্তি আছে তেমনি তার বিকর্ষণ-শক্তিও আছে। অর্থাৎ সমধর্মী গুণকে কাছে টানে আবার বিপরীত-ধর্মী গুণকে দূরে ঠেলে দেয়। তোমার চিত্ত যতটা শুদ্ধ ততটা শুদ্ধচিত্ত লোকের প্রতি তোমার আকর্ষণ হবে এবং তোমার বিপরীত গুণসম্পন্ন লোকের প্রতি তোমার বিরূপ মনোভাব হবে। বলতে পার—হৃদয়ে যখন শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপ ভগবান বিরাজ

করছেন তখন মনে ময়লা বা রজো তমো গুণ থাকে কি করে? আমরা যাকে ময়লা বলি তা হচ্ছে মায়া। মায়া রজোতমো গুণরূপে শুদ্ধসত্ত্ব স্বরূপের উপর একটি আবরণের মত থাকে। এই মায়াশক্তির সাহায্যে ভগবান জীবজগৎ নিয়ে লীলা করছেন। লীলার সহায়কারিণীরূপে মায়ার আবরণকে ভগবান স্বীকার করে নেন। এটাই লীলার রহস্য যে শুদ্ধসত্ত্বগুণ তমো-রজো গুণের আবরণ স্বীকার করে নেয়। যেমন ভগবান ভক্তের অধীনতা মেনে নেন। এই মায়ার আবরণ উন্মোচন করাই সাধনা। আবরণ হটাতে পারলেই আত্মদর্শন—ভগবদ্দর্শন। ভজন শব্দের মূল অর্থ ভেঙ্গে ঢুকে যাওয়া। আবরণ বা বাঁধ ভেঙ্গে ভিতরে প্রবেশ করা। মায়ার আবরণ ভাঙ্গাই ভজন।

২৮৯। সুখের চেয়েও দুঃখ মঙ্গলদায়ী। মঙ্গল কাকে বলে, কিসে সত্যিকারের মঙ্গল হয়, তা জানা না থাকাতেই আমরা দুঃখ দেখলে মুষড়ে পড়ি। কোন না কোন প্রকার দুঃখের জ্বালায় জীব কাতর হয়েই ভগবানের শরণ নেয়। যে বস্তু জীবকে ভগবানের নিকটবর্তী করে তাকে শুধু মঙ্গলময় বললে খুবই কম বলা হবে। যে বস্তু আমাকে পরমপদে পৌঁছে দেয় একমাত্র সেই বস্তুই আমার পরম বান্ধব। দুঃখের মূল্য বুঝতে পারলে জীবনে দুঃখ বলে কোন বস্তু থাকে না। জীবন চিরসুখময় হয়। অজ্ঞতার জন্যই পরম বান্ধবকে চরম শত্রু ভেবে বসে আছি। এরূপ অজ্ঞানতা নিয়ে কখনই শুদ্ধ জ্ঞানের দরবারে পৌঁছান যাবে না। জীবনের প্রতিটি বিষয়ে পূর্ণ জ্ঞান লাভ হলেই পূর্ণতম জ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ সম্ভব।

২৯০। কি ব্যক্তিগত জীবনে, কি সমাজজীবনে অথবা ধর্মরাজ্য সংস্থাপনে দুঃখ হতেই সুখের জন্ম, মহত্ত্বের বিকাশ এবং ধর্মের অভ্যুদয় সর্বদেশে সর্বকালে। হরিকথা শুনবার জন্য তোমাদের

মনে যে এত আবেগ আগ্রহ তা পেলে কার কৃপায়? বিষয় ভোগ করে যদি পরিপূর্ণ সুখ পেতে, কণামাত্র ক্ষোভ-অভাব মনে না থাকত তবে কি হরিকথা শুনতে সময়-মন দিতে? নিশ্চয়ই মনে একটু ফাঁক আছে যা শত বিষয়রস ভর্তি করতে পারেনি। সেই সামান্য ফাঁকটুকু বয়সের সঙ্গে সঙ্গে বড় হতে থাকে। ফলে ক্রমে ক্রমে কৃষ্ণ-পিপাসা বাড়তে থাকে। ঐ পিপাসার জন্যই আজ হরিকথায় এত সুখ পাচ্ছ। এ কৃষ্ণ-পিপাসা হল কৃষ্ণ পাবার আশা। অথবা বলতে পার, ভিতরে যে আত্মারূপে কৃষ্ণ আছেন তাঁর পিপাসা। এ পিপাসা এতই তেজী যে একে কৃষ্ণ-রস ভিন্ন অন্য কোন রসে বশ করা যায় না। আত্মার খাদ্য আত্মতত্ত্বরস। "রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি" (তৈঃ উঃ ২।৭।২)—এই জীব সেই রসকে লাভ করেই আনন্দিত হয়।

২৯১। আমরা কোন না কোন প্রকার অনুষ্ঠান করি বা অনুষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত থাকি। কিন্তু অনুষ্ঠানের যে উদ্দেশ্য—অণুতে অধিষ্ঠান, অণুব্রহ্মে অধিষ্ঠান তা কজনে অনুভব করি বা লাভ করি! উদ্দেশ্যে অবিচল নিষ্ঠা না থাকার জন্য অনুষ্ঠান করেও অনুষ্ঠান-রূপ যজ্ঞের ফল পাই না। কারণ, অনুষ্ঠানের বহিরঙ্গ সাজসজ্জা আয়োজনেই ডুবে থাকি। এর অন্তর্নিহিত তত্ত্বে—অণুব্রহ্মের প্রতি আমাদের লক্ষ নেই। লক্ষ নেই বলে লক্ষ্যে পৌঁছিবার কোন কথাই ওঠে না। ফলে সমস্ত প্রচেষ্টাই পণ্ডশ্রমে পরিণত হয়। ভূমানন্দ পাবার উদ্দেশ্য নিয়ে অণু-আনন্দের আয়োজন। ক্ষুদ্র আনন্দকে ব্রহ্মজ্ঞানে আস্বাদন করতে হয় ক্ষুদ্র অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে। আনন্দকে ব্রহ্মের স্বরূপ জ্ঞান করলে অনুষ্ঠান সার্থক হয়।

২৯২। তোমাদের সঙ্গে ভগবৎপ্রসঙ্গ আলোচনার পর অথবা কোন অনুষ্ঠানে হরিকথা শোনার পর আমার চিন্তা আসে—এতে

আমার কি গ্রহণীয় বা বর্জনীয় আছে! তোমরাও এই চিন্তা নিয়ে চললে অবশ্যই কিছু না কিছু লাভ করতে থাকবে, যা অনুসরণ করে উর্ধ্বগামী হতে পারবে। সব সময়ে একটা শিক্ষার মনোভাব নিয়ে চলবে বা বলবে এবং নূতন তথ্য কি পেলে তার হিসেব রাখবে। আলোচনা করবে কিছু শিক্ষার জন্য, কাউকে তর্কে হারিয়ে দেবার জন্য নয়। তর্কের হাওয়া বুঝলে শত জানা কথাও চেপে যাবে। তর্কের সময়ে বোবা কালা হয়ে থাকাই মঙ্গল। কারণ, তর্ক শ্রদ্ধাভক্তিতে ঘুণ ধরিয়ে দেয়। লোকের কাছে হারলেই বা কি আর জিতলেই বা কি! যদি জিততে চাও তবে মায়ার খেলায় জিতে পরমপদ লাভ কর। বীরত্ব দেখাতে হলে মায়াকে জয় কর।

২৯৩। একটা সদ্‌গুণ বা সদ্‌ভাব অর্জন করা যদি খুব শক্ত মনে কর তবে একটা গুণকে বর্জন করতে পারবে না কি! ধরবার ক্ষমতা না থাকে তো ছাড়বার ক্ষমতা নিশ্চয়ই আছে! তোমার অহংভাবটাকে ত্যাগ কর দেখি! অহংভাবটা ছেড়ে দিলে দেখবে সব কাজই সহজ হয়ে গেছে। মস্তবড় একটা বাধা সরে গেছে। ভজন তখন জলবৎ সহজ হয়ে যাবে। কিছুই অর্জন করতে পারবে না, কিছুই বর্জন করতে পারবে না—এভাব নিলে সাধন কেন সংসার করতেও পারবে না।

২৯৪। ভোগময় জীবনকে যোগময় কর। ভোগের প্রতি যদি তোমার মন এতই আকৃষ্ট, ভোগ ছাড়া মন যদি কিছুই না জানে, তবে ঐ ভোগ্যবস্তুর মাধ্যমেই ভগবানের সাথে যুক্ত হবার চেষ্টা কর। ভোগ্য বস্তুতে কৃষ্ণ আরোপ কর। ভোগ্য বস্তু কৃষ্ণময় দেখ। সর্বদা চিন্তা কর—ভগবান ঐ ভোগ্যবস্তুরূপে তোমার সামনে আছেন। এভাবে ভোগের সঙ্গে কৃষ্ণকে যুক্ত করে আহারে বিহারে শয়নে স্বপনে জাগরণে কৃষ্ণভাবনায় কৃষ্ণময় হয়ে

যাও। স্মরণ কর গীতার অভয়বাণী—"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্"—যারা যে প্রকারে যে উদ্দেশ্যে আমাকে উপাসনা করে তাদের সেই ভাবেই অনুগ্রহ করি। শ্রীভগবানের এই 'যথা' বাক্যের ভিতর যেমন অষ্টাঙ্গ যোগের কথা আছে তেমনি সর্বাঙ্গ ভোগের কথাও আছে। কৃষ্ণধন শুধুই যোগীর নয়, ভোগীরও এতে সমান অধিকার। ভোগের ভিতর দিয়ে যোগ কর। যোগ সহজ হবে, সহজযোগী হবে। 'সহজিয়া' হবে।

২৯৫। ভজনের সহায়ক নিন্দা, স্তুতি নয়। যার প্রশংসায় লোভ আছে, যে প্রশংসা পাবার জন্যই সব কিছু করে, 'সাধু' বাক্য শুনবার জন্য যে হরিনাম করে তার ভজন হওয়া শক্ত। সংসার আর সাধনা—দুটি উলটো পথ। দুটির উলটো রীতি। সংসার নিম্নমুখী সৃষ্টিমুখী। সাধনা ঊর্ধ্বমুখী। সংসারের প্রশংসা সাধনাতে অন্তরায়। সাধনার প্রশংসায় সংসারে অশান্তি হয়। সাধনপথে প্রশংসায় বিবেক ভ্রান্ত হয়। নিন্দায় আত্মসচেতনতা বাড়ে। ভজনপথে যে দোষ দেখিয়ে দেয় সে-ই প্রকৃত বন্ধু। যে প্রশংসায় পথ গুলিয়ে দেয় সে শত্রুতা করে। নিন্দুক নিন্দা করেই চলে যায়, কাছে এসে ভজনের সময় নষ্ট করে না। কিন্তু প্রশংসাকারী শুধু মনকেই অহংকার অভিমানে পূর্ণ করে দেয় না, কাছে বসে ভজনের বিঘ্নও ঘটায়। নিন্দাকারীর মত প্রকাশ্য শত্রুর চেয়ে প্রশংসা-কারীর মত ছদ্মবেশী শত্রু বেশী ভয়ংকর।

২৯৬। ঈশ্বর তোমার আমার সকলের ভিতরই বর্তমান। তবু আমাদের তৃপ্তি নেই কেন? আনন্দঘনকে হৃদয়ে ধারণ করেও মনে কণামাত্র আনন্দ নেই কেন? ব্রহ্মানন্দ-সমুদ্রে ডুবে থেকেও নিরানন্দে জ্বলছি কেন? এত সঞ্চয়ের ভিতরেও এত বঞ্চনা কেন? বিশ্ববৈভবের মাঝে আমরা এত নিঃস্ব কেন? এসব

প্রশ্ন ঠিক ঠিক মনে জাগলে তার উত্তর একদিন পেয়ে যাবেই। আত্মবঞ্চনার জন্যই এই বিশ্ববঞ্চনা। সর্ববিধ বঞ্চনা। আত্ম-বঞ্চনা বন্ধ কর। আত্মাকে স্বীকার কর। তাঁকে কর্তা বলে মান। দেখবে, ফাঁকি দেওয়া বন্ধ হবার সঙ্গে সঙ্গে জীবনের সকল ফাঁক বন্ধ হয়ে গেছে। তখন আর কোথাও কোন অভাব নাই। আসল কর্তার হাতে জীবনতরীর হাল ছেড়ে দাও, অবহেলে ভবসাগর পার হয়ে যাবে।

২৯৭। কৃষ্ণ পাবার আগে কৃষ্ণের প্রতি প্রেম বা কৃষ্ণপ্রেম পেতে হয়। যদি কৃষ্ণের প্রতি কণামাত্র প্রেমভক্তি না থাকে তবে কৃষ্ণ পেলেও পাওয়া হয় না। আর যদি তাঁর প্রতি প্রেম থাকে তবে তাঁকে না দেখলেও পাওয়া হয়। কৃষ্ণকে পাওয়ার স্বাদ বা আনন্দ অনুভব করায় প্রেম। যেমন খাদ্য বস্তুর স্বাদ অনুভব করায় জিহ্বা। জিহ্বা খাদ্য বস্তুর রসগুণের বিচারক। প্রেম কৃষ্ণবস্তুর রসগুণের বিচারক। কৃষ্ণ-কারবারে প্রেমই মূলধন। সুতরাং আগেই ভগবানকে চেও না। আগে চাও, যেন তাঁর প্রতি একটু প্রেমভক্তি জাগে। তোমাদের ধারণা, সাধনায় বসলেই বুঝি ভগবানকে পাওয়া যায়। হয়ত পাওয়াও যায়! কিন্তু পেয়ে কি করবে তা ভেবে রেখেছ কি? কোন প্রিয়জন তোমার বাড়ীতে আসবে জেনে আগে থেকেই কত আয়োজন কর। কোথায় তাকে বসাবে, কি খাওয়াবে, কি কি প্রিয়কথা বলবে, আর কত কি! এই সব চিন্তা ভাবনা তোমার ভিতর যত গভীর, প্রিয়জনের প্রতি তোমার প্রেমও তত গভীর। কিন্তু প্রিয় হতেও প্রিয় যিনি, আপন হতেও আপন যিনি, তিনি তোমার কাছে এলে কি সম্পদে তাঁর মনোরঞ্জন করবে? সে সম্পদের কথা একটিবারও ভেবেছ কি? এজন্য তোমার দেহমন ইন্দ্রিয় প্রস্তুত রেখেছ কি? ঐ প্রস্তুতির গভীরতাই কৃষ্ণের প্রতি তোমার প্রেমের গাঢ়তা। এই গাঢ়তার

পরিমাণের উপর নির্ভর করে কতক্ষণে দর্শন পাবে তার পরিমাপ। প্রেমের গাঢ়তায় দর্শন ঘনায়।

২৯৮। শ্রীকৃষ্ণের সুদর্শন চক্র সদাই ঘুরছেন। তিল আধ স্থির নেই। নামটি সুদর্শন। অর্থাৎ দেখতে অতি সুন্দর। মনোমুগ্ধকর। এটি কৃষ্ণের লীলাচক্রের প্রতীক। অনন্তকাল ধরে বিরামবিহীন অনন্ত লীলার প্রতীক। সুদর্শনচক্রের যেমন বিশ্রাম নেই, সৃষ্টি-স্থিতি-লয় লীলারও তেমনি বিরাম নেই। চক্র রূপে মনোমুগ্ধকর। ঈশ্বরের অনন্ত লীলাও মনোহারী। সকল জীবের মনকে মোহিত করে। ঈশ্বরের লীলা সংঘটিত হচ্ছে মায়াশক্তির প্রভাবে। এ কারণে চক্রটিকে মায়াচক্রও বলা যেতে পারে। জীব এবং ব্রহ্মের মাঝখানে এই মায়াচক্র। যে মায়াচক্রের মনোহারী রূপে মুগ্ধ না হয়ে চক্রধারী বা মায়াধীশের কাছে পৌঁছতে চায়, সে সদাঘূর্ণমান চক্রের ভিতর একটি ফাঁক বা পথ খুঁজতে থাকে যার ভিতর দিয়ে সুকৌশলে চক্রধারীর কাছে পৌঁছান যায়। ইন্দ্রিয়গণকে এক বিন্দুতে এনে একাগ্রতারূপ যোগ দ্বারা সমস্ত ধ্যানজ্ঞান চক্রধারীর প্রতি নিবদ্ধ করে বিবেকরূপ বা বিজ্ঞানরূপ তীর দ্বারা লীলাচক্রকে ভেদ করে ব্রহ্মে পৌঁছান যায়। দ্রুপদ রাজসভায় অর্জুনের লক্ষ্যভেদ এই প্রকার অভীষ্ট লাভের শ্রেষ্ঠ উদাহরণ। অর্জুন তার সমস্ত ধ্যানজ্ঞান এক লক্ষ্যে নিবদ্ধ করেছিল বলে চক্রকে দেখতে পায় নি, দেখেছিল শুধু লক্ষ্য বস্তুটিকে। মায়াকে জয় করার এটাই উত্তম পথ। মায়াচক্রের ছিদ্র ভেদ করতে আবশ্যক নিচ্ছিদ্র একাগ্রতা। তবে এ স্তরে পৌঁছে মায়াচক্র ভেদ করার আগে সাধককে লোভচক্র সুখচক্র দুঃখচক্র কুচক্র প্রভৃতি ছোট বড় অনেক চক্র ভেদ করে হাত পাকিয়ে আসতে হয়। সুদর্শন সুধীজনের প্রাণদায়ী, অসাধুর প্রাণঘাতী।

২৯৯। জীব অণু বা ক্ষুদ্র। ভগবান বিভু বা বিরাট। বিভুর ধর্ম নিরন্তর অণুকে আকর্ষণ করা। বিভু যেন বিরাট চুম্বক আর অণু এক টুকরা লোহা। যদি ঐ ক্ষুদ্র লোহা ময়লামাখানো থাকে তবে তার কাছে চুম্বকের আকর্ষণশক্তি পৌঁছায় না। ময়লা বাধা হয়ে দাঁড়ায়। যে মুহূর্তে লোহা ময়লাশূণ্য হবে সেই ক্ষণেই সে চুম্বকের আকর্ষণে সাড়া দেবে। জীব আর ঈশ্বরের মধ্যেও একই ব্যাপার। যখনই আমরা মায়ামোহের ময়লা-বর্জিত হব তখনই ঈশ্বরের আকর্ষণ বা করুণা অনুভব করতে পারব।

৩০০। যাকে তুমি প্রাণদিয়ে ভালবাস তাকে তুমি দিয়েই খুশী। তার কাছে তুমি কিছুই চাও না। এই ভালবাসার গাঢ়তা প্রকাশ পায় যখন তুমি দিয়েও যেন তৃপ্তি পাও না, তোমার মন যখন আরো দিতে চায়। স্ত্রী পুত্র কন্যাদের প্রতি এরূপ ভালবাসাকেই শ্রেষ্ঠ ভালবাসা বা প্রেম বলে। এই যদি ভালবাসার প্রকৃত রূপ হয়, তবে ভগবানের কাছে সর্বদাই কিছু না কিছু প্রার্থনা করে চলছ কেন। তা হলে নিশ্চয়ই ভগবানকে ভালবাস না। তোমাদের ব্যবহার দেখে বুঝা যায়, ভগবান যেন তোমাদের ব্যবসায় একজন অংশীদারমাত্র। তাঁর সঙ্গে তোমাদের শুধুই লেনদেনের কারবার, প্রেম ভালবাসার কারবার নয়।

৩০১। তোমার আশা পূরণ হচ্ছে না বলে তুমি খুবই দুঃখ পাচ্ছ, ভগবানের কাছে সর্বদাই অনুযোগ করছ। কিন্তু আমি দেখছি, তুমি যতটা নিরাশ না হয়েছ তার চেয়ে অধিক নিরাশ হয়ে আছেন ভগবান স্বয়ং। তোমার তবু নালিশের একটা জায়গা আছে, ভগবানের তাও নেই। তোমার কামনা-বাসনার ফর্দ-ফিরিস্তার শেষ আইটেমটি তুমি নিজেই জান না। তোমার ফর্দটা সর্বদাই অসমাপ্ত, ফলে তোমার কামনা সর্বদাই অপূর্ণ। ভগবানের সামান্য একটাই বাসনা ছিল, তাও আজ পর্যন্ত পূরণ

হল না। তিনি শুধু চেয়েছিলেন, "সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ"—সব কিছু ধর্মাদি পরিত্যাগ করে একমাত্র আমার শরণাগত হও (গীতা ১৮।৬৬)। কিন্তু তুমি তাঁর এই সামান্য প্রত্যাশাটুকু পর্যন্ত পূরণ করলে না। এখন হিসেব করে দেখ, কে বেশী হতাশ—তুমি, না ভগবান! যিনি সর্বশক্তিমান তাঁর সর্ব-নিম্ন আশাটুকুও অপূর্ণ রইল ; আর তুমি সব চাইতে দুর্বল, তোমার অনেক আশাই কি এর মধ্যেই পূরণ হয়নি!

৩০২। আমাদের ভক্তির বহর কি রকম তার একটা নমুনা দিচ্ছি। একস্থানে শ্রীশ্রীনামযজ্ঞ চলছে। বহু ভক্তশ্রোতার সঙ্গে বসে শ্রবণ করছি। গাইয়েরা প্রেমছে বিভিন্ন রাগরাগিণী সহযোগে মহামন্ত্র গাইছেন। মধুর পরিবেশে তন্ময় হয়ে গেছি। হঠাৎ যেন একটু আনমনা হয়ে পড়লাম। দেখি, এক ভক্ত-শ্রোতা এক গাইয়েকে জড়িয়ে প্রেমালিঙ্গনে ব্যস্ত। স্বাভাবিক কারণেই গাইয়ের ভাব ব্যাহত হল, সুর-লয় একটু কেটে গেল। রসস্রোতে যেন ছেদ পড়ল। নিথর-নীরব সভা একটু চঞ্চল হল। মনের স্বপ্নভঙ্গ হল। তোমরা তো জান, এসব বস্তুতে মনকে যতই নিবিষ্ট করবে, যতই অনন্যমনা হবে ততই রস পাবে। আনন্দের গভীরতা নির্ভর করছে তন্ময়তার গভীরতার উপর। যাইহোক, কীর্তন চলছে। আমরা একটু পাশ ফিরে বসতে না বসতেই দেখছি—পিছন থেকে কয়েকজন শ্রোতা উঠে এসে সামনের সারিতে ঠাঁই নিলেন। ভাবলাম, নিবিড় রসা-স্বাদনের জন্য বুঝি ঐ আয়োজন। আমার ভুল ভাঙ্গতে দেরি হল না। ঐ শ্রোতাগণ সুযোগ বুঝে একের পর এক গাইয়েদের প্রণাম-আলিঙ্গন করার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। ক্ষণে ক্ষণেই গাইয়েদের উপর যেন আলিঙ্গনের আক্রমণ চলতে লাগল। অথবা আলিঙ্গনের এক প্রতিযোগিতা চলল। এ অবস্থায় কীর্তন-রসের

কি হাল হতে পারে তা আর বুঝিয়ে বলার অপেক্ষা রাখে না। আমরা রস বিস্মৃত হয়ে রঙ্গতে উলটি-পালটি খেলাম কতক্ষণ। না পারলেন গায়করা প্রাণভরে গাইতে, না পারলেন কোন রসিক শ্রোতা রসে ডুবে যেতে। ঐ বিদগ্ধ শ্রোতাগণ ঐভাবে কীর্তনের মাঝে প্রেমালিঙ্গনরূপ কসরত না করে তন্ময়তার জন্য একটু চেষ্টা করলে কি বেশী লাভবান হতেন না! আমার ধারণা, ঐরূপ আচরণ যতটা না প্রেমাস্বাদনের জন্য তার চেয়ে বেশী লোকের কাছে ভক্ত-প্রেমিক সাজবার জন্য। সত্যিকার প্রেমে তো হাত পা অবশ হয়ে যাবার কথা, গোপনে অশ্রুত্যাগের কথা!

৩০৩। প্রেমরাজ্যে পৌঁছতে নববিধা ভক্তির নয়টি দরজা একের পর এক পার হতে হয়। "শ্রবণ" অঙ্গ দিয়ে শুরু। যখন সর্বেন্দ্রিয় দিয়ে ভগবৎ নাম-মহিমা শ্রবণ হয় তখন আপন অজ্ঞাতেই সে প্রথম দরজা পেরিয়ে "কীর্তন" অঙ্গে প্রবেশ করে। এভাবে এক-একটি ভক্তি-অঙ্গের পরিপূর্ণতায় আপনা থেকেই তৎপরবর্তী স্তরে পৌঁছে যায়। এর জন্য বাইরে কোন প্রকার চেষ্টা-কসরত করতে হয় না। কসরত যা করতে হয় তা কেবল অনন্যমনা হবার জন্য। বাইরের ব্যায়াম বা লম্ফঝম্ফ দ্বারা প্রেম-ভক্তি লাভ হয় না। এটা সম্পূর্ণ অন্তর্জগতের ব্যাপার। মানসিক ব্যায়ামের ব্যাপার।

৩০৪। কণ্টক বা কাঁটার সঙ্গে আমাদের সকলেরই কিছুটা পরিচয় আছে। হাতে পায়ে কাঁটা ফুটেনি এমন লোক নিশ্চয়ই কেউ নেই। কাঁটার সঙ্গে শরীরের কোন স্বাভাবিক সম্পর্ক নেই। কিন্তু কোনক্রমে ঐ অস্বাভাবিক সংযোগ ঘটলেই ব্যথা বেদনা অস্বস্তির একশেষ। ধর্মেরও ঐরূপ কাঁটা আছে। ধর্ম-কাঁটা। ধর্মের সঙ্গে ধর্ম-কাঁটার কোনই আত্মিক যোগ নেই। তথাপি ধর্ম যত না লোককে সুখ দিয়েছে তার চেয়ে অনেক বেশী দুঃখ দিয়েছে ধর্মের কাঁটা। আর এ কাঁটা ছোট বড় সব ধর্মকেই বিদ্ধ করেছে।

হিন্দুদের শাক্ত—বৈষ্ণব দ্বন্দ্বরূপ কাঁটা, আগম-নিগমরূপ তর্ক-কাঁটা। মুসলমানদের শিয়া—সুন্নিরূপ কলহের কাঁটা। খ্রীষ্টানদের ক্যাথলিক-প্রোটেষ্ট্যাণ্টরূপ দ্বৈতমতের কাঁটা। সর্বত্রই কাঁটা। একে এড়িয়ে চলতে পারলেই এর খোঁচা থেকে প্রাণ বাঁচে। নিষ্কণ্টক হওয়া চলে। আর তা না হওয়া পর্যন্ত ব্যথা ঘুচবে না।

৩০৫। দীক্ষাগুরু একজনই হন। শিক্ষাগুরু একাধিক হতে পারেন। একাধিক শিক্ষাগুরু গ্রহণে শাস্ত্রের সম্মতি আছে। শুধু মনুষ্য-গুরুর কাছে শিক্ষা নিলেই শিক্ষা পূর্ণ হয় না, পূর্ণ জ্ঞান লাভ হয় না। পশুপক্ষী বৃক্ষলতা কীটপতঙ্গ সবার কাছ থেকেই শিখতে হয়। তবেই পূর্ণতম জ্ঞান লাভ বা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ। তখন দেখবে, সবাই তোমার গুরু।

৩০৬। গুণবতী মা একটি বেগুন দিয়ে তোমার জন্য সিদ্ধ পোড়া ভাজি চর্চরী ঝাল অম্বল—কতরকম স্বাদু ব্যঞ্জন তৈরী করে দিতে পারেন। আমাদের বেদমাতাও তেমনি নির্গুণ ব্রহ্মরূপ বেগুন বা বিগুণ দিয়ে তাঁর বিভিন্ন রুচিসম্পন্ন সন্তান-দের জন্য রকমারি শাস্ত্র প্রণয়ন করেছেন। তোমাদের যেমন রুচি তেমনটিই আস্বাদন কর। রুচি অনুযায়ী আস্বাদন। তাই বলে তোমরা সকলেই যে বিগুণ খাচ্ছ, এই নির্ভেজাল সত্যি কথাটি উপলব্ধি করতে চেষ্টা করবে কি! তোমাদের মুস্কিলটা তো ওখানেই—খাচ্ছ বিগুণ, বলছ সগুণ!

৩০৭। সৎ-অসৎ বা ভাল-মন্দের দ্বন্দ্ব-কলহটা যে কতই দুঃখের কতই নিদারুণ তা ভেবে দেখেছ কি? একজন অসৎপরায়ণ ব্যক্তি অপর এক অসৎকর্মার সঙ্গে যতটুকু সৌজন্যবোধ নিয়ে আচার-আচরণ করে, একজন সৎব্যক্তির সঙ্গে সেটুকু সৌজন্যও দেখতে চায় না। বরং তার উলটো ব্যবহার করে। সৎ ব্যক্তিকেই

বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করে চলতে হয়। সৎ'এর সংস্পর্শে এসে অসতের যে পরিবর্তন হবার কথা তা কিন্তু এ যুগে বিরল। বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই বিপরীত ফল দেখা যায়। সুতরাং আপন সততা রক্ষায় খুব সাবধান !

৩০৮। শাস্ত্রের কদর্থ গ্রহণের জন্যই সাধনক্ষেত্রে বেশীর ভাগ সময়ে আমাদের পিছিয়ে পড়তে হয়। পরিণামে সাধনে সুফলের স্থলে কুফলই লাভ করি। এরূপ কদর্থের বহু কারণ, তার মধ্যে দুটি প্রধান। প্রথমতঃ উপযুক্ত আচার্যের অধীনে শাস্ত্রপাঠ গ্রহণ না করা। দ্বিতীয়তঃ আপন লোভ-লালসা চরিতার্থের জন্য সুবিধে-সুযোগ অনুসারে শাস্ত্রার্থ করা। আবার যে সব পুস্তক শাস্ত্রপর্যায় পড়ে না, তা অনুসরণ করেও বিপত্তি ঘটে। ভ্রান্ত পথে চললে শুধু নিজেরই অমঙ্গল নয়, সংসারের সমাজের দেশের অমঙ্গল ডেকে আনা হয়। অনাচার কদাচার ছড়িয়ে পড়ে। যেমন ভাগবতে আছে—বৈরীভাবে, বন্ধুভাবে, ভয়ে বা কামভাবে কৃষ্ণপ্রাপ্তি হয়। এখন যদি কেউ সকলের সঙ্গে বৈরীতা শুরু করে দেয়, বা কামচর্চায় রত হয়, তবে তার পরিণাম কি কৃষ্ণপ্রাপ্তি ? বৈরীভাব যে বন্ধু-ভাবের চেয়েও কঠিন, কৃষ্ণের প্রতি কামভাব আরোপ যে অতি উচ্চস্তরের কথা—এসব ভাগবতীয় জ্ঞানে পূর্ণ দখল না থাকলে ঐরূপ ভ্রান্ত আচরণের পরিণাম ভয়াবহ হবেই।

৩০৯। তোমার কোন দুঃখ-বিপদ হলে কাঁদবার লোক অনেক পাবে। কিন্তু তোমার আনন্দ ঐশ্বর্যের দিনে আনন্দ করার জন্য একজনও পাবে কিনা সন্দেহ। তোমার সুখ তোমাকে আনন্দ দিলেও তোমার প্রতিবেশীকে আনন্দ দিবে কিনা তা বলা খুবই শক্ত।

৩১০। আমি আলো নিয়ে ছুটছি অপরকে আলো দেখাতে। কিন্তু আমার পিছনেই যে একটা অন্ধকার সর্বদা আমাকে তাড়া

করে ফিরছে, সে হুঁশ না। রাখলে ঐ অন্ধকারই একদিন আমাকে গ্রাস করবে।

৩১১। চিরপরিবর্তনের মধ্যেই একটা চিরস্থিতি। নিত্য নূতনের মধ্যে এক চিরপুরাতন। যুগের পরিবর্তন কালের পরিবর্তন ঋতুর পরিবর্তন সর্বদাই ঘটছে। আবার এর ভিতরই চিরপুরাতন সত্য সদা বিরাজ করছে। হাজারো পরিবর্তনের মধ্যেও সূর্যোদয়ের পরিবর্তন নেই। আমাদের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত অসংখ্য পরিবর্তনের মধ্যেও নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস ও খাদ্য পানীয় গ্রহণ ঠিকই চলছে। তেমনি, প্রতি মুহূর্তের জাগতিক পরিবর্তনের মধ্যেও ধর্মচিন্তা বা ঈশ্বরোপাসনা আদিকাল থেকে চলে আসছে এবং অনাদিকাল পর্যন্ত চলবে। সত্য সদা অপরিবর্তিত।

৩১২। চুন সুরকি সিমেন্ট প্রভৃতি মসলা ছাড়া শুধু ইট সাজিয়ে বাড়ী হয় না। তবু লোকে বলে—ইটের বাড়ী বা পাকা বাড়ী ইত্যাদি। কিন্তু যে বস্তুর একান্ত গুণে ইটগুলি স্ব স্ব স্থানে দাঁড়িয়ে থাকতে পেরে বাড়ীর রূপ দিয়েছে সেই মসলার কথা পরে কেউ মুখেও আনে না। আমাদের সমাজের বা দেশের অসংখ্য লোককে একমাত্র ধর্মই একত্রিত বা গ্রথিত করে সমাজ ও দেশের রূপ দিয়েছে। ইটের মসলা কমজোরি হলে যেমন বাড়ী ধ্বসে পড়ে, তেমনি ধর্মের বাঁধন শিথিল হলেও সমাজের পতন শুরু হয়। শান্তিপ্রিয় সমাজ তৈরী করতে ধর্মের কোন বিকল্প বস্তু নেই।

৩১৩। লৌকিক প্রেম আজ নূতন, কাল পুরাতন। কিন্তু অলৌকিক প্রেম সদা নবীন, নিত্য নূতন। নববধূ গৃহে এলে প্রথম প্রথম অতি গোপনে পতির সহিত কথা বলে। এই প্রেম পুরাণ হলে প্রকাশ্যে আলাপ শুরু হয়। কিন্তু বিশ্বপতির সঙ্গে প্রেম কোন দিন পুরাণ হয় না। তাই তাঁর সঙ্গে আলাপ চলে মনে বনে কোণে।

৩১৪। দুঃখতাপই সংস্কারের রূপ। কেউ সংস্কারমুক্ত কিনা তা বুঝাযাবে তার গায়ে দুঃখতাপের আঁচ লাগে কিনা তাই দেখে। যার কোনরূপ সংস্কার নেই, তার দুঃখতাপেরও বালাই নেই।

৩১৫। তোমার সঞ্চিত অর্থে আমার কোন উপকার নাও হতে পারে। তা দ্বারা তুমি আমার অমঙ্গলও করতে পার। কিন্তু তোমার পরমার্থদ্বারা আমার মঙ্গল বই অমঙ্গল হবার কোনই সম্ভাবনা নেই। একজনের পরমার্থ সম্পদে জগৎ উপকৃত হয়।

৩১৬। যার সঙ্গে তোমার মতবিরোধ, যার চেহারাটা পর্যন্ত তুমি দেখতে চাও না, তার কথাও তুমি মনে মনে ভাব। বিরোধ যত গভীর তার সম্পর্কে তোমার ভাবনাও তত গভীর। অর্থাৎ তার প্রতি তোমার ধ্যান তত বেশী। তার দোষ দুর্বলতা খুঁজতে যতবেশী ভাবছ ততই শত্রুভাবাপন্ন হয়ে পড়ছ। ততই তোমার নিজের দোষগুলি ভিতর থেকে মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে ঐ সময়টুকুতে যদি তার গুণের চিন্তা করতে, অনন্তঃ যে গুণটি তার মধ্যে আছে তোমার মধ্যে নেই, তবে তোমার একই ভাবনা শত্রুতা বৃদ্ধি না করে মিত্রতার জাল বুনতে থাকত। ফলে তোমার নিজের সৎগুণের বিকাশ ঘটত।

৩১৭। পরম্পরাগত শৃঙ্খল রক্ষা হলেই শৃঙ্খলা থাকে। আর তা নষ্ট হলেই উচ্ছৃঙ্খলতা আসে। নীতির অধীনতা স্বীকার না করাই উচ্ছৃঙ্খলতা। তুমি সমাজ-সংসারের নিয়ম-শৃঙ্খল ভঙ্গ করলে তোমার নিয়মনীতিও সংসারে কেউ মানবে না।

৩১৮। সত্য কভু বিকৃত হয় না, বিক্রীতও হয় না। সত্যের যেমন বিকার নেই, তেমনি তা বিক্রয়যোগ্য বস্তুও নয়। সত্য দান করে কেউ সত্যশূন্য হয় না। এ ধন যতই বিতরিবে ততই বেড়ে যাবে।

৩১৯। ভগবানের ভালবাসা বা কৃপা চাইবার আগে একবার

তোমার নিজের ভালবাসার হিসেব নেওয়া আবশ্যক। জীবনে কাউকে সত্যি সত্যি ভালবেসেছ কিনা তা দেখা দরকার। মাতাপিতা ভাইবন্ধু পুত্রকন্যা আত্মীয় কুটুম্ব কাউকেই কি কখনো প্রাণদিয়ে ভালবেসেছ? তা হলে অন্ততঃ বুঝতে পারবে তোমার ভিতর ভালবাসা আছে কি না! যদি তোমার ভিতর ভাল-বাসা থাকে তবেই ভগবানের ভালবাসা তোমার ভিতরে ঠাঁই পেতে পারে। অন্যথায় তুমি তাঁর ভালবাসার অধিকারী নও।

৩২০। যোগতপস্যার শক্তি-ক্ষমতাই বল, বা যে কোন প্রকারের বিভূতিই বল, সবই ঐশ্বর্যের পর্যায় পড়ে। ঐশ্বর্যের সঙ্গে প্রেমের সতত দ্বন্দ্ব, যেমন লক্ষ্মীর সঙ্গে সরস্বতীর দ্বন্দ্ব। যেখানে কৃষ্ণপ্রেম সেখানে কোনরূপ ঐশ্বর্যের গন্ধ নেই। প্রেম সব ঐশ্বর্যকে পুড়িয়ে ছাই করে দেয়। এমন চাঁদের কণার মত ব্রজগোপীরা কৃষ্ণবিরহ-তাপে পুড়ে কাল হয়ে গিয়ে ছিল। জ্ঞানাগ্নি যেমন কর্মসংস্কার-রূপ অজ্ঞানাদি পুড়িয়ে দেয়, প্রেমাগ্নিও তেমনি সর্ব প্রকার ঐশ্বর্য মায় দেহের রূপটি পর্যন্ত পুড়িয়ে দেয়। গর্বখর্বকারী হরি ঐশ্বর্যের গর্ব রূপের গর্ব কোনটাই রাখেন না।

৩২১। আপন অর্থ অপরের ব্যাঙ্কে রাখলে যে অবস্থা হয়, মৃত্যুর পর অঙ্গে রামনাম লিখে গায়ে নামাবলী জড়িয়ে দিলেও সেই অবস্থা হয়। যতক্ষণ তোমার দেহ ছিল ততক্ষণ মুখে রামনাম লও নাই, অঙ্গে রামনাম লিখ নাই। নামাবলী স্পর্শও কর নাই। যখন তোমার দেহ তাঁর দখলে গেল, অপরের অধিকারে গেল তখন তাতে রামনাম লিখলে তোমার কি এসেযায়!

৩২২। পিতা যে পুত্রকে পরম স্নেহ করেন তার প্রধান কারণ, পিতা পুত্রের ভিতর বেঁচে থাকতে চান। পুত্রের ভিতর দিয়ে অমরত্ব লাভ করতে চান। বিশ্বপিতাও তেমনি আমাদের ভিতর

দিয়ে প্রতিষ্ঠা পেতে চান। পুত্র পিতাকে ভুলে গেলে, তাঁর অবাধ্য হলে তিনি যেমন ব্যথা পান, আমরা ভগবানের স্মরণ মনন না করলে বিশ্বপিতাও তেমনি ব্যথা পান।

৩২৩। আজ এ কাজ করব, কাল ও কাজ করব, পরশু ঐ কাজ করব—এভাবে আমাদের দিনগুলি চলে যায়। কিন্তু আমরা কখনই কি কোন একটা দিন নির্দিষ্ট করে রাখি যে দিন ভগবানের ভজন ছাড়া অন্য কোন কাজ করব না! আমাদের লক্ষ্য স্থির হয় নি বলেই ভজনেও স্থিরতা নেই। আর তার জন্যই আমরা স্থিতধীঃ বা স্থিতপ্রজ্ঞ হতে পারছি না।

৩২৪। গুরু নানকজীর একটি দোঁহা শোন—

যো মালা জপে সো শালা,
যো কর জপে সো ভাই,
যো মন্ মন্ জপে ওস্‌কো বলিহারি যাই।

জপকে একেবারে অন্তরের সন্তঃস্থলে নিয়ে বসাবে। এই ধ্যান রাখবে—ইষ্টদেব আত্মারূপে বিরাজ করছেন তোমার কল্পিত বিগ্রহাকারে, তুমি ধ্যাননেত্রে ঐ রূপ দর্শন করতে করতে মনমন্দিরে বসে অবিরাম জপ করে চলছ। উপাস্য আর উপাসক ছাড়া সে জগতে তৃতীয় কোন বস্তু নেই। ইহাই জপারূঢ় অবস্থা।

৩২৫। প্রকৃতই যদি সাধন চাও তবে আপনা প্রকৃতি পরিত্যাগ করে পরা প্রকৃতির আশ্রয় নাও।

৩২৬। মানুষের চেহারাটা তার বাইরের প্রকৃতি, আর প্রবৃত্তিটা তার ভিতরের প্রকৃতি। এ দুটোর মধ্যে একটা অলিখিত মিল আছে। একজনের বাইরের প্রকৃতি দেখে তার ভিতরের প্রবৃত্তি বুঝতে চেষ্টা করবে।

৩২৭। একটা কিছু ঘটলেই তোমরা চক্রান্তের গন্ধ পাও। কথাটা ঠিকই বুঝেছ যে তোমরা চক্রের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছ। তবে চক্রের অন্ত মানে শেষভাগটা না বুঝে যদি চক্রের কেন্দ্রবিন্দু-টি বুঝতে তা হলে এতদিনে সব চক্রান্তের শেষ হয়ে যেত। চক্রধারী কৃষ্ণের হাতে মায়াচক্র সর্বদাই ঘূর্ণায়মান। এ চক্রান্তের গন্ধ পাওয়াও শুভ লক্ষণ। চক্রান্ত বুঝতে পারলে অবশ্যই একদিন সংসারচক্র থেকে রেহাই পাবে।

৩২৮। প্রেমের রূপ কি? রূপ বলতেই একটা বহিরঙ্গ আকার আকৃতির কথা মনে জাগে। প্রেমের রূপ যে কাম তা আমরা অতি পরিস্কারভাবে জানতে পারি একদা গণিকা লক্ষহীরা এবং নামাচার্য হরিদাস ঠাকুরের কাহিনী হতে। লক্ষহীরা হরিদাস ঠাকুরের কাছে গেল আপন কামক্ষুধা চরিতার্থ করে ঠাকুরকে পতিত করতে। অথচ সে জানে না যে তার কামক্ষুধার আসল রূপ প্রেমক্ষুধা। ঠাকুর জানেন লক্ষহীরার ক্ষুধার আসল রূপ। এ বস্তু জানা একমাত্র ব্রহ্মজ্ঞের পক্ষেই সম্ভব। তিনি জানেন, কামে লক্ষহীরার ক্ষুধার নিবৃত্তি নেই, পূর্ণ পরিতৃপ্তি নেই। কোন সাধারণ ব্যক্তিই কাম দিতে পারে লক্ষহীরাকে। কিন্তু তিনি বিজ্ঞ হয়ে কভু অজ্ঞের আচরণ করতে পারেন না। রোগী কুপথ্য চাইলে যোগী সে আবদার শুনবেন কেন! লক্ষহীরা চাইল ক্ষণিকের সুখ, ঠাকুর দিলেন তাকে অনন্ত সুখ। লক্ষহীরা চাইল কাম, ঠাকুর দিলেন প্রেম। 'ভাগবত' যে বলেছেন— কামে কৃষ্ণ-ধন পাওয়া যায়, এটি তার এক জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। আবার সৎসঙ্গের উজ্জ্বল দৃষ্টান্তও বটে।

৩২৯। সজ্জনের সহবাসে ভিক্ষাবৃত্তিতে রাজি হবে, তবু অসতের রাজ্যভোগে ভাগী হবে না।

৩৩০। ঝড় হলে গাছের পাকা আম আগে পড়ে। দুর্দিন এলে পুণ্যাত্মারূপ পাকা আমিরা আগে চলেযান।

৩৩১। জলে আঘাত কর, জল ছিটে এসে তোমাকে আঘাত করবে। জোরে চিৎকার কর, দিগন্ত প্রতিধ্বনিরূপে তা ফিরিয়ে দিবে। ঠাকুরকে মিষ্টিফল নিবেদন কর তুমিও মিষ্টি ফলপ্রসাদ পাবে। তুমি তাঁকে প্রেম নিবেদন কর, সেই প্রেম দৈবশক্তিযুক্ত হয়ে তোমার বুকেই ফিরে আসবে। তুমি যেমনটি করবে, ঠিক তেমনটি পাবে।

৩৩২। যে মকরধ্বজ ঔষধ জীবন দান করে, তা কি মৃত্যুর মুহূর্তে খেলে জীবন ফিরে পাবে! তোমার মধ্যে জীবনীশক্তি থাকলে তবেই সে ঔষধ তোমাকে জীবন দান করবে। দুধ অমৃততুল্য। তাই বলে তোমার পেটে অসুখ থাকলে কি দুধ অমৃতসমান কাজ দেবে?

৩৩৩। শুধু উট কাঁটাঘাস খেয়ে মুখে রক্ত ঝরায় না, আমাদের ভিতরও অনেক আছে যারা সুখময় কৃষ্ণভজন ছেড়ে সংসার-দুঃখের কাঁটাঘাস স্বেচ্ছায় চিবাতে গিয়ে নাকের জলে চোখের জলে এক হয়। তবু মুখের ঘাস ফেলে দিতে রাজি নয়।

৩৩৪। যে আগুনের যত কাছে তার তত বেশী পোড়ে। যে সূর্যের যত কাছে তার তত বেশী জ্বলে। যে ভগবানের যত কাছে তার তত বেশী দহে।

৩৩৫। তোমার যখন অসৎ চিন্তা অসৎ কাজ করার সময় ও শক্তি আছে, তখন নিশ্চয়ই তুমি সৎ চিন্তা এবং সৎ কাজও করতে পার। এর পরেও যদি বল, তোমার ভজনের ক্ষমতা নেই; তার অর্থ হবে—তুমি ভজন চাও না।

৩৩৬। সমস্ত সুখ দুঃখ ভয় ভাবনা ভগবৎপদে নিবেদন করাই শ্রেষ্ঠতম সুখ।

৩৩৭। মৃত্যুর চেয়েও ভয়ঙ্কর হল অসৎসঙ্গ।

৩৩৮। যাঁর দুঃখ-বিরহ কেউ-ই ঘোচাতে পারে না, তিনিই শ্রীরাধা।

৩৩৯। শ্রীজগন্নাথধামে ব্রহ্মতত্ত্ব। ভক্তের একান্ত আগ্রহে এখানে ব্রহ্ম বিগ্রহরূপ ধারণ করেছেন। নিরাকারতত্ত্ব সাকারতত্ত্বে ধরা দিয়েছেন। জয়দেব-কেন্দুবিল্বে ভক্তিতত্ত্ব। এখানে ভক্তের স্বরূপ প্রকাশিত, ভক্তিকুসুম পূর্ণ প্রস্ফুটিত। সে সৌরভে জগবন্ধু শৌরি পুলকিত। তাই তো তিনি নিজ দাসীকে জয়দেবকে দান করে ভক্তির মর্যাদা পুনঃ প্রচার করলেন। আর শ্রীধাম মায়াপুরে প্রেমতত্ত্ব। মায়াতীত মায়াপুরকে যেন প্রেমযমুনা দুবাহু দিয়ে বক্ষে আঁকড়ে ধরে আছেন। এখানে আকাশে বাতাসে প্রতি ধূলী-কণায় প্রেমের মাখামাখি। জাহ্নবীর সুশীতল জলে পূত-স্নিগ্ধ হয়ে একটিবার মায়াপুরের রজঃ স্পর্শ কর, একবার ঐ উদাস হাওয়া নাকে টান, প্রেমে মাতোয়ারা হয়ে যাবে। এ প্রেম শাশ্বত, কোন সাধনের অপেক্ষা রাখে না। এ প্রেম নিরপেক্ষ, অন্যকোন রূপ-লীলা দর্শনের অপেক্ষা রাখে না। এ প্রেম জগন্নাথের হ্লাদিনী শক্তি, তাই পুনঃ জগন্নাথদেহেতে লীন।

৩৪০। শ্রীশ্রীবাসন্তী নবমীতে ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের শুভ জন্মোৎসব। শুদ্ধা নববিধা ভক্তি পুনঃ প্রকাশার্থে শুদ্ধব্রহ্ম পরাৎপর রাম শুভ নবমীতিথিকে বেছে নিয়েছেন গোলোক হতে ভূলোকে অবতরণের লগ্ন হিসেবে। ঋতুরাজ বসন্ত শুদ্ধানন্দের প্রতীক। ভাদ্রা কৃষ্ণাষ্টমীকে বেছে নিয়েছেন পূর্ণতম ব্রহ্ম কৃষ্ণচন্দ্র ধরায় আবির্ভাবের জন্য। অসুরের অত্যাচারে, রাজশক্তির অনাচারে,

ভাদ্রমাসের ভরানদীর মত পৃথিবী পাপে টৈটুম্বুর। কৃষ্ণ-পক্ষের গাঢ় অন্ধকারের মত গভীর অজ্ঞানান্ধকারে জনচিত্ত নিমজ্জিত। অষ্টপাশরূপ অষ্টবিধ অসুর বিনাশ করে ঘোর কৃষ্ণাষ্টমীরূপ ইষ্ট-কষ্ট বিদূরিত করত অষ্টপ্রকার যোগমার্গ সংস্থাপিত করলেন। আর শ্রীগৌরচন্দ্র এলেন ফাগুনের পূর্ণিমাতে প্রেম-ফাগ উড়িয়ে, জনমনে হোলীর আগুন জ্বেলে। এলেন নবদ্বীপে নবপ্রেমের প্রদীপ হাতে জগজনকে আলো দেখাতে, প্রেমে পূর্ণ করতে।

৩৪১। সূর্যের প্রয়োজনীয়তা দুভাবেই অনুভব করা যায়—দিবাভাগে সূর্যের আলো তাপ থেকে এবং রাত্রিতে সূর্যালোক বিহনে বহুবিধ অসুবিধার সম্মুখীন হলে। ভগবৎ কৃপার আবশ্যকতাও অনুভব করাযায়—সুখে এবং দুঃখে।

৩৪২। লীলার ভিতর লৌল্যভাব বা লোলতা আছে। ভগবানের একটা লোভ আছে। এই সৃষ্টি-প্রপঞ্চই ভগবানের প্রধানতম লীলা। এই প্রপঞ্চে যখন প্রপঞ্চাতীতের লোভ জন্মে তখনই তিনি মায়াকে আশ্রয় করে ধরায় আসেন রসলীলা করতে। লীলার ভিতর আর এক লীলা। বিশ্বলীলার মধ্যে রসলীলা। চির আনন্দময়ের হাসিকান্নার লীলা। লৌল্যই রাসলীলার মূল উৎস।

৩৪৩। তুমি যেমন সাধু দর্শন করতে পাহাড়পর্বতে যাও, সাধুরাও তেমনি তোমাদের দর্শন করতে পাহাড় ছেড়ে লোকালয় আসেন। কুম্ভমেলায় তোমরা যাও সাধুসঙ্গ করতে, আর সাধুসমাজ সেখানে জড় হন গৃহীর সঙ্গ করতে। তোমরা ধর্ম বা ভগবান খোঁজ সাধুর মধ্যে, সাধুরাও ঈশ্বরকে খোঁজেন তোমাদের মধ্যে। গৃহীর ভিতর এমন সাধুও আছেন যে মহাসন্ন্যাসীও তাঁকে পেতে লোভ করেন। ঠাকুর রামকৃষ্ণ সারাদেশ খুঁজে আবিষ্কার করেছিলেন যুবক ছাত্র নরেন্দ্রকে। এই খোঁজাখুঁজি নিয়েই পূর্ণতা, ভগবৎ লীলা।

৩৪৪। ঘৃণা-অনাদরে প্রেম শুকিয়ে যায়।

৩৪৫। ঘরের চাল যতই সুন্দর ও মজবুত কর, খুঁটি শক্ত-মজবুত না হলে সে ঘরের আয়ু কতক্ষণ! আর্যসভ্যতা বা ভারতীয় সমাজ দাঁড়িয়ে আছে সাধু-সন্ন্যাসীরূপ খুঁটির উপর। আত্মা বিহনে যেমন দেহ অচল, অধ্যাত্মবাদ বাদ দিলে ভারতীয় সভ্যতাও অচল। সাধুরা সত্যদ্রষ্টা না হলে সমাজের জ্ঞানচক্ষু খুলবে না। একা শ্রীরামের দ্বারা যে রামরাজ্য স্থাপিত হয়েছিল, হাজারো রাজ-নীতিজ্ঞের চেষ্টায় তা সম্ভব নয়। সহস্র সহস্র লোকের চেষ্টায় যা না হয়, একজন সাধু-মহাত্মার ইচ্ছাতেই তা পূরণ হয়। যুগযুগ ধরে ভারতবাসী সাধুসন্তের মহিমা প্রত্যক্ষ করে আসছে। শাস্ত্র-পুরাণে এর অসংখ্য উদাহরণ লেখা আছে। ভারতের নিজস্ব ভাবনা বাদ দিয়ে, আর্যসভ্যতার স্বকীয়ত্ব ভুলে পরচর্চারূপ পরদেশীভাব অনুকরণ করতে গিয়ে আমাদের এই বর্তমান সংকট। দেশের সর্ববিধ দুর্নীতি বন্ধ করতে হলে কড়া নীতিজ্ঞের আবশ্যকতা স্বীকার করতেই হবে। আর সেইরকম নীতিজ্ঞানের ধারক-বাহক একমাত্র সাধুরাই হতে পারেন। সাধুরাই ভগবানের প্রতিভূ, তাঁর 'স্থিতি'-লীলার সহায়ক, ভগবদিচ্ছা প্রকাশের মুখপাত্র। সুতরাং সাধারণের চাইতে সাধুর দায়িত্ব অনেক অনেকগুণে বেশী। সাধু-সন্ন্যাসীর জীবন আত্মোৎসর্গের জীবন। তাঁদের নিজের জন্য চাইবার পাইবার কিছুই নেই। ভগবদ্দর্শন পেয়ে তাঁদের সকল অভাব ঘুচে গেছে।

এইরূপ চরম ত্যাগব্রতী হলেই কেবল তাঁর মুখের কথা শুনে লোক অসৎ পথ পরিত্যাগ করবে। আইনের কঠিন বিধান-বাঁধনেও যা অসম্ভব, মহাত্মার এক অঙ্গুলিহেলনে তা সম্ভব। সাধুর মহিমা অপার। সাধুরাজ্যে যারাই বিচরণ করে তারাই জানে—পাহাড়পর্বতে মঠেগুহায় বহু বহু বৎসর লোকচক্ষুর অন্তরালে থেকে

সাধনে সিদ্ধিলাভ করে সাধুরা দৈবনির্দেশে লোকালয় আসেন আমাদের মঙ্গলবিধানের জন্য। তখন তাঁদের নিজস্ব কোন কর্ম নাই, ভগবদিচ্ছা পূরণই তাঁদের একমাত্র কাজ।

ইতি উপদেশামৃতের প্রথম খণ্ড সমাপ্ত ॥

সর্ববিধ ভুল-ভ্রান্তির জন্য ক্ষমাপ্রার্থনান্তে—

যা দেবী সর্বভূতেষু ভ্রান্তিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ॥

"গুরোর্মধ্যে স্থিতা মাতা
মাতৃমধ্যে স্থিতো গুরুঃ।
গুরুর্মাতা নমোঽস্তু
মাতৃগুরুং নমাম্যহম্ ॥"

জয় গুরু জয় গুরু শ্রীগুরু জয়
জয় গুরু শ্রীগুরু শ্রীমা জয়।
জয় মা শ্রীমা শ্রীগুরু জয়,
শ্রীগুরু শ্রীমা জয় মা জয় ॥

সর্বে অত্র সুখিনঃ সন্তু সর্বে সন্তু নিরাময়াঃ।
সর্বে ভদ্রানি পশ্যন্তু মা কশ্চিৎ দুঃখমাপ্নুয়াৎ ॥

প্রার্থনা

যুজে বাং ব্রহ্ম পূর্ব্যং নমোভিঃ
বিশ্লোক এতু পথ্যেব সূরেঃ।
শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রা
আ যে ধামানি দিব্যানি তস্থুঃ।।

—শ্বেতাশ্বতর উপনিষৎ ২।৫

অর্থ—হে ইন্দ্রিয় ও তদধিষ্ঠিত দেবতাগণ, তোমাদিগকে আমি নমস্কার করতেছি, অর্থাৎ চিত্ত-প্রণিধানাদি দ্বারা সনাতন ব্রহ্মে সমাহিত হতেছি। আমার এই স্তুতিগান সাধুলোকদের পথে বিবিধভাবে বিস্তারলাভ করুক। হিরণ্যগর্ভের যে সকল সন্তান দিব্যধামে অবস্থিত আছেন, তাঁরা ইহা শ্রবণ করুন।

শান্তিপাঠ

ওঁ ভদ্রং কর্ণেভিঃ শৃণুয়াম দেবাঃ
ভদ্রং পশ্যেমাক্ষভির্যজত্রাঃ।
স্থিরৈরঙ্গৈস্তুষ্টুবাংসস্তনূভিঃ
ব্যশেম দেবহিতং যদায়ুঃ।।
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।। (অথর্ববেদ)

অর্থ—হে দেবগণ, আমরা কর্ণদ্বারা যেন কল্যাণপ্রদ বাক্যসমূহই শ্রবণ করি। হে যজনীয় দেবগণ, আমরা চক্ষুদ্বারা যেন মঙ্গলকর বিষয়সকল দর্শন করি। স্থির দৃঢ় শরীর এবং অবয়বের দ্বারা তোমাদের স্তুতি করে যেন দেবগণের বিহিত আয়ু প্রাপ্ত হই। আমাদের ত্রিবিধ বিঘ্নের শান্তি হউক।।